পরিবেশবিজ্ঞান

ডালজাতীয় ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

মোঃ সদরুল আমিন

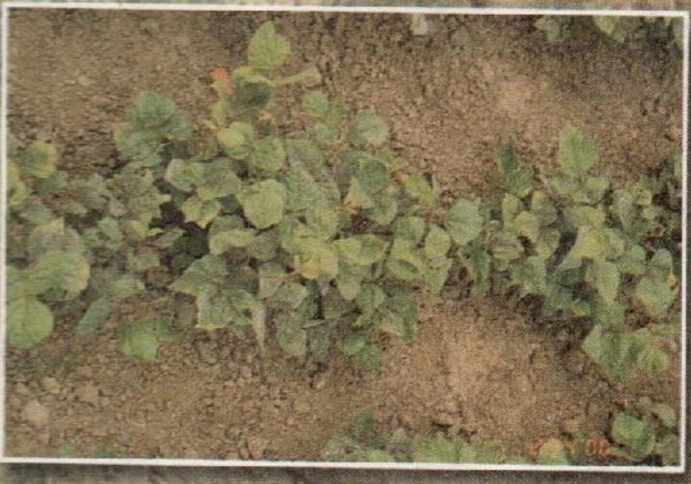

Web.

পরিবেশ বিজ্ঞান

ডালজাতীয় ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

BAMSDOC Library
Dhaka

ড. মোঃ সদরুল আমিন
অধ্যক্ষ
হ মোহম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library
Accession No 17806
Date 10.6.04

পরিবেশ বিজ্ঞান : ডালজাতীয় ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

(ডাল ফসল চাষ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তিবিষয়ক বর্ণনা)

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪০৯ / অক্টোবর ২০০২

বাএ ৪১২২
(২০০২-২০০৩ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ২)
মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ
জীকৃচি ২৯১

প্রকাশক
সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
শা. র. শামীম

মূল্য
তিনশত নব্বই টাকা মাত্র

PARIBESH BIJNAN: DALJATIYA FASAL CHASHER ADHUNIK PROJUKTI (Environmental Science : Modern Technologies for Dal Crop Cultivation) by Dr. Md. Sadrul Amin. Published by Subrata Bikash Barua. Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : October 2002. Price : Tk. 390.00

ISBN 984-07-4265-5

উৎসর্গ

যা'কে

Dhaka

BANSDOC Library Dhaka

ভূমিকা

কৃষিভিত্তিক দেশ বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল হিসেবে ডাল ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রায় ৫ থেকে ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ডাল ফসলের চাষ হয়ে থাকে। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ টন। বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির প্রায় ৫ থেকে ৬ শতাংশ ডাল চাষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে মোট ফসলী জমির (Total Cropped area) হিসেবে ডাল ফসলের জমির পরিমাণ ২ থেকে ৩ শতাংশ। বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ডালের গুরুত্ব ব্যাপক। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের ধারণা – ডালে প্রায় ৮০ শতাংশ উদ্ভিজ্জ আমিষ রয়েছে। শুধু পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবেই নয়, সুস্বাদু খাদ্য হিসেবেও ডালের সমধিক গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে ডালের পুষ্টি এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব কৃষিবিজ্ঞানীদেরও যথেষ্ট উৎসাহিত করেছে। এ পর্যন্ত দেশে ডালের ২৪টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। এসব উন্নত জাতের ফলন স্থানীয় জাতের প্রায় দ্বিগুণ।

বর্তমান গ্রন্থের আঠারটি অধ্যায়ে বাংলাদেশে ডাল ফসল চাষ, ছোলা চাষ, খেশারি চাষ, মশুর চাষ, মুগকলাই চাষ, মাশকলাই চাষ, অড়হর চাষ, মটর চাষ, সয়াবিন চাষ, ফেলন চাষ, মাঠ ও গুদাম পর্যায়ে ডাল ফসলের সমন্বিত বালাই দমন, ডাল ফসল ও সবুজ সার ফসল, ডালভিত্তিক ফসল বিন্যাস পদ্ধতি, ডালভিত্তিক ফসল বিন্যাসের জন্য সার প্রয়োগ, পশুখাদ্য হিসেবে ডাল ও মিশ্র ঘাস ফসলের চাষ, ডাল ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, ডাল ফসলের আয়-ব্যয়, ডালজাতীয় ফসলের আন্তঃফসল সম্পর্কে বিস্তারিত ও গবেষণাধর্মী আলোচনা ছাত্র-শিক্ষক-গবেষক সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি আশা করি।

গ্রন্থটি স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কৃষিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকারে আসবে বলে ধারণা করা যায়। এছাড়াও এই গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকদেরও যথেষ্ট কাজে আসবে বলে আমি আশা করি। এ বিষয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও গবেষকগণও এই গ্রন্থের মাধ্যমে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে ধারণা করি।

গ্রন্থটি প্রণয়নের সময় সংসারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমার নানা অবহেলা অক্লেশে স্বীকার করে নিয়ে আমাকে অশেষ ঋণে আবদ্ধ করেছে আমার সংসারের সবাই। এঁদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কোনো প্রতিদান দেওয়া হয়তো আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। গ্রন্থটি যাদের জন্য প্রণীত হয়েছে, তাদের প্রয়োজনে এলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। গ্রন্থটির মানোন্নয়নের জন্য যে কোনো পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে।

পরিশেষে গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলা একাডেমী আমাকে অশেষ ঋণী করেছে। এই ঋণ অপরিশোধ্য।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

ড. মোঃ সদরুল আমিন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বাংলাদেশে ডাল ফসলের চাষ	১
দ্বিতীয় অধ্যায় : ছোলা চাষ	৯
তৃতীয় অধ্যায় : খেসারি চাষ	৩৪
চতুর্থ অধ্যায় : মশুর চাষ	৪৪
পঞ্চম অধ্যায় : মুগকলাই চাষ	৭২
ষষ্ঠ অধ্যায় : মাশকলাই চাষ	৯৯
সপ্তম অধ্যায় : অড়হর চাষ	১১৮
অষ্টম অধ্যায় : মটর চাষ	১২৪
নবম অধ্যায় : সয়াবিন চাষ	১৩০
দশম অধ্যায় : ফেলন চাষ	১৪৪
একাদশ অধ্যায় : মাঠ ও গুদাম পর্যায়ে ডালের সমন্বিত বালাই দমন	১৪৭
দ্বাদশ অধ্যায় : ডাল ফসল ও সবুজ সার ফসল	১৬১
ত্রয়োদশ অধ্যায় : ডালভিত্তিক ফসল বিন্যাস পদ্ধতি	১৬৯
চতুর্দশ অধ্যায় : ডালভিত্তিক ফসল বিন্যাসের জন্য সার প্রয়োগ	১৮৮
পঞ্চদশ অধ্যায় : পশুখাদ্য হিসেবে ডাল ও মিশ্র ঘাস ফসলের চাষ	২১০
ষোড়শ অধ্যায় : ডাল ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ	২৩১
সপ্তদশ অধ্যায় : ডাল ফসলের আয়-ব্যয়	২৩৫
অষ্টাদশ অধ্যায় : ডালজাতীয় ফসলের আন্তঃফসল	২৪৮
পরিশিষ্ট ১	২৫৫
পরিশিষ্ট ২	২৬১
পরিশিষ্ট ৩	২৭০
তথ্যপঞ্জি	২৭১

BANSDOC Library ★ Dhaka ★

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে ডাল ফসল চাষ

১. ভূমিকা

ক. **আমিষের উৎস :** আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে ডাল ফসলের গুরুত্ব রয়েছে ডালে প্রায় ৮০ শতাংশ উদ্ভিজ্জ আমিষ রয়েছে। এটি যথেষ্ট সুখাদ্যও বটে।

খ. **পশুখাদ্য :** ডাল ফসলের কেবল শিম অংশই মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বাকি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়। এছাড়া সাথী ফসল হিসেবে অন্যান্য উদ্ভিদ চাষাবাদ করা যায়।

গ. **জাতের ব্যাপকতা :** বাংলাদেশে ডাল ফসল প্রজাতির ব্যাপকতা রয়েছে। যা থেকে খুব সহজেই কাঙ্ক্ষিত জাতসমূহ চাষের জন্য নির্বাচন করা যায়।

ঘ. **চাষাবাদ পদ্ধতি :** ডালজাতীয় বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি দেশীয় বিজ্ঞানী ও কৃষিজীবীদের জানা আছে।

ঙ. **ফলন বৃদ্ধির সুযোগ :** চাষাবাদের জমি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ডাল চাষাবাদের এলাকা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

চ. **বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় :** ডাল খাদ্যের চাহিদা বাংলাদেশে ব্যাপক, তাই প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে ডাল আমদানি করতে হয়। প্রায় ৬৫% ডাল বাইরে থেকে আসে।

ছ. **মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি :** নাইট্রোজেন সংবন্ধনের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির কাজেও ডালজাতীয় ফসলের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে।

জ. **সবুজ সবজি :** সবুজ সার উৎপাদনের মাধ্যমে সবুজ সবজি হিসেবে ডাল ফসলের গুরুত্বও কম নয়।

ঝ. **জীববৈচিত্র্য রক্ষা :** জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডালের প্রজাতি রক্ষা করা প্রয়োজন।

ঞ. **জনপ্রিয় খাদ্য :** ডাল নিরাপদ জনপ্রিয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য।

বাংলাদেশে ডাল ফসলের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে ডাল ফসলের প্রধান প্রধান গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো–

ক. বাংলাদেশে প্রায় ৫ থেকে ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ডাল ফসলের চাষ হয়ে থাকে। বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ টন। ডাল চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৫% থেকে ৬%।

খ. মোট ফসলী জমির (Total cropped area) হিসেবে ডাল ফসলের জমির পরিমাণ ২ % থেকে ৩%।

গ. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১২.৯২ কোটি। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ১৪০ লক্ষ হেক্টর।

ঘ. ডাল উদ্ভিদ উৎস হতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ আমিষসমৃদ্ধ খাদ্য উপাদান।

ঙ. স্বল্প পরিচর্যা ও বৃষ্টিনির্ভর ফসল হিসেবে এদেশে ডাল চাষ হয়ে থাকে।

চ. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি স্বল্পতা দূর করতেও মাটির হারানো উর্বরা শক্তি বাড়াতে ডালের আবাদ বৃদ্ধি এ সময়ের তাৎপর্যপূর্ণ কাজ।

ছ. দেশে উৎপাদিত ডাল থেকে জন প্রতি প্রতিদিন মাত্র ১২ গ্রাম ডালের সংস্থান হয়। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০২ সালে ১৩.৭ কোটি এবং ২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.৩ কোটি হবে।

জ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী সুষম খাদ্য তালিকায় একজন মানুষের জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ৪৫ গ্রাম ডালের প্রয়োজন। এ হিসাব অনুযায়ী ২০০২ সাল নাগাদ দেশের জনগোষ্ঠীর মোট ডালের চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ২২.৫০ লক্ষ টন এবং ২০১০ সাল নাগাদ একই হারে মোট ডালের চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে ২৫.১৩ লক্ষ টন। বর্তমানে দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৬৫% ডাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে।

ঝ. বাংলাদেশের জনগণের পুষ্টি স্বল্পতা পূরণের জন্য প্রোটিনসমৃদ্ধ মাশকলাই, মুগ ডাল, মশুর ও ছোলা ডালের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। সুস্বাদু ও সুপাচ্য হওয়ায় দেশের প্রায় সর্বত্রই এসব ডালের চাষাবাদ হয়ে থাকে।

ঞ. বাংলাদেশে কৃষিজ উৎপাদনে চাহিদার তুলনায় আবাদী জমির পরিমাণ খুবই কম। তাছাড়া বেশিরভাগ জমিই প্রধান প্রধান ফসল চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই অতিরিক্ত জমি বরাদ্দ করে দেশে ডালের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একক জমিতে ফলন বাড়িয়ে ডালের চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে। দেশে এ পর্যন্ত ডালের ২৪টি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব উন্নত জাতের ফলন স্থানীয় জাতের প্রায় দ্বিগুণ। অতএব শুধু উন্নত জাতের চাষাবাদের মাধ্যমেই ডালের উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব।

২. বাংলাদেশে ডাল ফসল উৎপাদনের প্রধান প্রধানএলাকা

বাংলাদেশে ডাল ফসলের চাষ এলাকার মধ্যে মৃত্তিকার গুণাবলী ও বৃষ্টিপাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ অধ্যায়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের ভিত্তিতে দেশে বিভিন্ন ডাল ফসলের এলাকা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ক. ছোলা ও মশুর : বৃহত্তর ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও রাজশাহী। মোট এলাকার প্রায় ৮৫%। এটি গঙ্গা প্লাবনভূমি।

খ. মাশকলাই : নবাবগঞ্জ, পাবনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও ঠাকুরগাঁও। মোট এলাকার প্রায় ৮০%। এটি গঙ্গা, যমুনা ও তিস্তা প্লাবনভূমি।

গ. মুগকলাই : বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী। মোট এলাকার প্রায় ৬০%। এটি মেঘনা প্লাবনভূমি।

ঘ. খেসারি : রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, নেত্রকোণা। এটি গঙ্গা প্লাবনভূমি।

ঙ. গোমটর : চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, ফেনী, নোয়াখালী, ভোলা, বান্দরবান। এটি পাহাড়ী এলাকা ও পাদভূমি।

চ. অড়হর : যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম। এটি গঙ্গা প্লাবনভূমি ও পাহাড়ী পাদভূমি।

এছাড়া প্রতিটি ডাল ফসলের উৎপাদন এলাকা ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট অধ্যায়েও আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের আবহাওয়া বিচারে ডাল ফসলের উৎপাদন মৌসুমকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বর্ষা শেষে শীতকালীন শুষ্ক মৌসুমে উৎপাদিত ফসলকে রবি, প্রাক বর্ষা মৌসুমে শুরু করে বর্ষাকালের প্রারম্ভে কর্তনযোগ্য ফসলকে খরিফ-১ এবং ভরা বর্ষাকালে শুরু করে বর্ষা শেষে কর্তনযোগ্য ডাল ফসলকে খরিফ-২ ডাল ফসল হিসেবে অভিহিত করা হয়।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় আমন ধান কাটার পর নাবী রবি মৌসুমে মাশকলাইয়ের চাষ করা যেতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে (যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর) সরিষা বা অন্যান্য রবি শস্য কাটার পর বপনপূর্ব সময়ে হালকা সেচ দিয়ে ব্যাপকভাবে উচ্চ ফলনশীল মুগ চাষ হয়ে থাকে।

দেশের প্রায় সর্বত্রই খরিফ-২ মৌসুমেও ডাল ফসলের চাষ হয়ে থাকে। ডাল ফসলকে সহজেই ফসল বিন্যাসে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। সময়মতো বপন করতে পারলে রোগ-বালাই ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণও অনেক কম হয়। সার্বিকভাবে পুষ্টি ঘাটতি পূরণে ডাল ফসল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

ডাল ফসল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ : বাংলাদেশে ডাল ফসল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান প্রধান উপাদানসমূহ এখানে বর্ণনা করা হলো। এসব স্বব্যাখ্যাত চিত্র পরীক্ষা করে ডাল ফসল চাষের এলাকা ও উৎপাদন নির্ধারণ করা সম্ভব। উপাদানসমূহ হলো–

ক. **মৃত্তিকা উপাদান :** প্রশম মাটি (Ca/Mg চাহিদা বেশি) উপযুক্ত। মাটিতে উদ্ভিদ পুষ্টির প্রাপ্যতা, বিশেষ করে ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, দস্তা ও বোরন। অতিরিক্ত লবণাক্ততায় ডাল ফসল ভাল হয় না।

খ. **ভূমি ব্যবহার বা ফসল বিন্যাস :** বাংলাদেশের নিচু বোনা আমন ধানের জমিতে ব্যাপকভাবে খেশারি ডালের চাষ করা হয়। এসব এলাকায় অনুফসল (Relay corpping) হিসেবে ডাল ফসল চাষ সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

গ. **ভূমির নিষ্কাশন ব্যবস্থা :** অধিকাংশ ডাল ফসল সুনিকাশযুক্ত উঁচু জমিতে ভাল হয়। এজন্য দেশের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার উঁচু প্লাবনভূমিতে ডালের ফসল চাষ করা প্রয়োজন।

ঘ. **খরা :** মৌসুমী খরা ডাল চাষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এজন্য রবি ও আগাম-খরিফ মৌসুমে খরাপ্রবণ এলাকায় ডালের ফলন অনিশ্চিত থাকে।

ঙ. **আবহাওয়া :** আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত উপাদানের মধ্যে বৃষ্টিপাত ও তাপ ডাল চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চ. **কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (AEZ) :** সার্বিকভাবে কৃষি পরিবেশ অঞ্চলসমূহের জলবায়ু ও মৃত্তিকাভেদে ডাল ফসল চাষের এলাকা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩. বাংলাদেশে ডাল ফসলের পরিচিতি

বাংলাদেশে চাষকৃত বিভিন্ন ডাল ফসলের পরিচিতি ছকের আকারে নিচে উল্লেখ করা হলো–

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	মৌসুম অনুযায়ী উৎপাদন হার
খেশারি	Grass pea	মোট আবাদের প্রায় ৮২% রবি মৌসুমে চাষ হয়।
মশুর	Lentil	
ছোলা	Chick pea	
গোমটর	Cow pea	
মটরশুঁটি	Field pea	
মাশকলাই	Black gram	
মুগকলাই	Mungbean	মোট আবাদের প্রায় ১৮% গ্রীষ্ম/বারমাসী হিসেবে চাষ হয়।
অড়হর	Pegion pea	

বাংলাদেশে ডাল ফসলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন (১৯৯০-২০০০ এর প্রায়)

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)	গড় ফলন (কেজি/হেক্টর)
খেশারি	২৪০	৭৬০
মশুর	২০৮	৭৯০
ছোলা	৬৮	৭৮০
মাশকলাই	৪৫	৭৩০
মুগডাল	৪৪	৫৮০
মটরশুঁটি	১৯	৫৮০
অড়হর	৬	৪৯০
গোমটর	৫	৬৩০
গরীকলাই	৪	৬২০
অন্যান্য	২	৫৯০
মোট	৬৪০	৬৫৫

বাংলাদেশে ডাল ফসলের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৭০০ কেজির কম। অনুন্নত, পুরানো জাত ও গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির কারণে ফলন কম। রাশিয়া ও চীনে ডাল ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন ১৪০০ থেকে ১৭০০ কেজি। উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ডাল ফসলের ফলন বর্তমান অবস্থায়ই ৫০% পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

বাংলাদেশে বিগত দশক থেকে ডাল চাষ এলাকায়ও এর উৎপাদন ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে, তবে বৃদ্ধি হার খুব কম। ডাল উৎপাদন এলাকা হ্রাস-বৃদ্ধির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো ; যেমন-

ক. খেশারি ডালের জমির পরিমাণ কমছে

খ. মুগ ডালের পরিমাণ সামান্য বাড়ছে।

গ. আন্তঃফসল ও মিশ্র ফসল হিসেবে ডাল ফসলের এলাকা বাড়ছে।
ঘ. ডাল ফসলে অণুজীব সারের ব্যবহার বাড়ছে।
ঙ. ডাল ফসলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ছে।
চ. অনেক ডাল ফসলে ১-২টি সেচ প্রদান শুরু হয়েছে।
ছ. রোগ ও পোকা দমন শুরু হয়েছে।
জ. উন্নত জাতের চাষাধীন এলাকা বাড়ছে।
ঝ. গ্রীষ্মকালীন ডাল চাষ বাড়ছে।

৪. ডাল আমিষের গুরুত্ব ও পুষ্টিমান

ডালে মাংশের মতো বেশি পরিমাণ আমিষ থাকে। অথচ মাংশ অপেক্ষা ডালের দাম কম। ভাতের সাথে মিশিয়ে ডাল খেলে উভয়ের আমিষের হজম বৃদ্ধি পায়। ডালের দাম এখনও মাছ, মাংশ অপেক্ষা কম রয়েছে। বাংলাদেশে ডালকে গরীবের মাংশ বলা হয়ে থাকে। অধিক পরিমাণ ডাল ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের পুষ্টি সমস্যা দূরীভূত করা যেতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর ডাল আমদানি করতে হয়। ডালের মাথাপিছু দৈনিক প্রাপ্যতা হচ্ছে মাত্র ১২ গ্রাম, অথচ চাহিদা প্রায় ৪৫ গ্রাম।

নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশের জন্য ডাল ফসল তথা ডালের আমিষের গুরুত্ব খুবই বেশি।

ক. বাংলাদেশে মাংশ ব্যয়সাপেক্ষ খাদ্য।
খ. ডাল চাষ পদ্ধতি বাংলাদেশে পরিচিত।
গ. ভূমির উর্বরতা রক্ষায় ডাল ফসলের অবদান রয়েছে।
ঘ. ডাল সুস্বাদু, প্রায় সবাই খায়।
ঙ. ডাল রান্না সহজ।
চ. বয়স্কদের আমিষের চাহিদা পূরণে ডালের গুরুত্ব বেশি।
ছ. ডাল পশু-পাখির উত্তম খাদ্য।
জ. ডাল সহজে হজম হয়।
ঝ. বাংলাদেশের জমি ডাল চাষের উপযোগী।
ঞ. অন্যান্য দানা ফসলের চেয়ে ডালের বাজার মূল্য বেশি।
ট. ডাল চাষে আয় বেশি।
ঠ. ডাল গাছ ও দানার সকল অংশ ব্যবহারযোগ্য।
ড. সারা বছর ডাল চাষ করা যায়।
ঢ. পারিবারিক পর্যায়ে ডাল সংরক্ষণ করা যায়।
ণ. পারিবারিক পর্যায়ে ডাল প্রক্রিয়াকরণ করা যায়।
ত. ডাল অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে মিশিয়েও ব্যবহার করা যায়।

ডালের পুষ্টিমান : খাদ্য ফসল হিসেবে ডালের পুষ্টিমান খুব গুরুত্বপূর্ণ। ডালের পুষ্টির প্রধান প্রধান বিষয় উল্লেখ করা হলো–

ক. ডালে আমিষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (২৮%)।

খ. ডালে চর্বিদ্রব্য বেশি (৫-৬%)।

গ. ডালে ক্যালসিয়ামের পরিমান বেশি (৮০-২০০ মিলিগ্রাম)।

ঘ. ডালে ফসফরাসের পরিমাণ বেশি (৩৮৫-৪২০ মিলিগ্রাম)

ঙ. রান্না করার চেয়ে খোসাসহ ডালে আঁশের পরিমাণ বেশি।

চ. ডালে খনিজ পদার্থ বেশি (প্রায় ২-৩.৫%)।

ডালের প্রধান রাসায়নিক বস্তু

ডালের নাম	প্রোটিন(%)	চর্বি (%)	খনিজ পদার্থ (%)	আঁশ (%)	ক্যালসিয়াম (মিঃ গ্রাম)	ফসফরাস (মিঃ গ্রাম)
ছোলা (খোসাসহ)	১৭.১	৫.৩	৩.০	৩.৯	২০২	৩১২
ছোলা (ডাল)	২০.৮	৫.৬	২.৭	১.২	৫৬	৩৩১
ছোলা (ভাজা)	২২.৫	৫.২	২.৫	১.০	৫৮	৩৪০
মাশকলাই (ডাল)	২৪.০	১.৪	৩.২	০.৯	১৫৪	৩৮৫
বরবটি	২৪.২	১.০	৩.২	৩.৮	৯৭	৪১৪
মুগ (খোসাসহ)	২৪.০	১.৩	৩.৫	৪.১	১২৪	৩২৬
মুগ (ডাল)	২৪.৫	১.২	৩.৫	০.৮	৭৫	৪৫
খেশারি	২৮.৩	০.৬	২.৩	২.৩	৯০	৩১৭
মসুর	২৫.১	০.৫	২.১	০.৭	৬৯	২৯৩
মটর (শুকনো)	১৯.৭	১.১	২.২	৪.৫	৭৫	২৯৮
মটর (ভাজা)	২২.৩	১.৭	৩.৫	১.৫	৮১	৩৪৫

ডাল বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিজ্জ আমিষ খাদ্য স্মরণাতীত কাল থেকে এ দেশে ডাল ফসলের চাষবাদ হয়ে আসছে। স্বল্প পরিচর্যা ও বৃষ্টিনির্ভর ফসল হিসেবে কম উর্বর জমিতে ডাল চাষ করা যায়। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পুষ্টি স্বল্পতা দূর করতে, মাটির উর্বরা শক্তি ও মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে ডালের আবাদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫. বিশ্বের ডাল ফসল উৎপাদন তথ্য

সারা বিশ্বের ডাল ফসল উৎপাদন তথ্যাবলি (১৯৯৮) সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

ডাল ফসল উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

ক. বিশ্ব জমি : ৬.৮ কোটি হেক্টর।

খ. বিশ্ব উৎপাদন : ৫.৭ কোটি টন।

গ. মহাদেশ হিসেবে বেশি জমি : আফ্রিকা ১.৪ কোটি হেক্টর। কম জমি ওসেনিয়া ২১ লক্ষ হেক্টর

ঘ. ফলন বেশি : ইউরোপ ২,০৭৯ কেজি/হেক্টর।
উত্তর আমেরিকায় ১২৯৫ কেজি/হেক্টর।

ঙ. বিশ্ব গড় উৎপাদন : ১০৭৪ কেজি/হেক্টর।

BEDOC

চ. বাংলাদেশে গড় উৎপাদন : ৬৫৫ কেজি/হেক্টর।

ছ. দেশ হিসেবে জমি বেশি ভারতে : ২.৪ কোটি হেক্টর।

ব্রাজিল : ৪৯ লক্ষ হেক্টর।

জ. মহাদেশ হিসেবে ফলন বেশি ফ্রান্সে ৫২৮৬ কেজি/হেক্টর।

ঝ. ডেনমার্ক : ৪০০০ কেজি/হেক্টর।

ঞ. ফলন কম : ভারত, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল : ৫০০-৬০০ কেজি/হেক্টর।

ট. ডালের মোট উৎপাদন বেশি : ভারতে ১.৪ কোটি টন।

চীনে ৪৭ লক্ষ টন

মহাদেশীয় ডাল ফসল উৎপাদন তথ্য : জমির পরিমাণ (হাজার/হেক্টর)

মহাদেশ	সাল			
	১৯৮৯-৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
আফ্রিকা	১১৮৮৪	১৪১৫৯	১৪১৪৮	১৪২৫২
উত্তর আমেরিকা	৪০৬৭	৪৭৪১	৪৭২৫	৫৪৪৮
দক্ষিণ আমেরিকা	৬১৮৬	৫৯৭০	৫৮২৫	৪৩৩৩
এশিয়া	৩৬০৩৭	৩৭০৯৯	৩৬৯৪১	৩৭২০০
ইউরোপ	৩০৭৫	৫২০৩	৪৮৯৮	৪৭৮১
ওশেনিয়া	১৫১৬	২০৮২	২১০০	২০৮৭
বিশ্ব	৬৮২৪৯	৬৯২৫৪	৬৮৩৩৬	৬৮০৯৯

ফলন (কেজি/হেক্টর)

আফ্রিকা	৫৬৪	৫২৭	৫১৮	৫২৭
উত্তর আমেরিকা	১০১৫	১১১৭	১২২১	১২৯৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৫৩৪	৬২৬	৬৬৯	৭২০
এশিয়া	৬৯২	৬৯৫	৭০৪	৭২৮
ইউরোপ	২৪৫১	১৭৭০	২০৮১	২০৭৯
ওশেনিয়া	১০৫০	১২৩১	১০৩৯	১০৯৭
বিশ্ব	৮১৮	৭৮০	৮০৭	১০৭৪

৭. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১৯৯৮ সালে ডাল ফসল উৎপাদন

দেশ	জমি (হাজার/হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার/টন)
ভারত	২৪৩৮০	৫৮৪	১৪২৩৭
চীন	৩০৯৯	১৫২১	৪৭১৩
বাংলাদেশ	৬৭১	৭৫৭	৫০৪
নাইজেরিয়া	৩২২০	৪৯৭	১৬০০
নাইজার	২৬৩৫	১৭৪	.৪৫৮
তুরস্ক	৪৯২৮	৬১১	৩০১২

অস্ট্রেলিয়া	২০৬১	১০৮১	২২২৪
পাকিস্তান	১৭৩৪	৬৯৫	১২০০
তুরস্ক	১৭৩৪	১০০১	১৩৪৯
কোস্টারিকা	১৫৬৩	১৯২৮	৩০১৩
যুক্তরাষ্ট্র	১৮৩৯	১৮৪৯	১৭৯৪
ত্রিনিদাদ	২	২৫৬৬	৫
মিশর	১৯৩	৩০৫৯	৫৮৯
নেদারল্যান্ড	৫	৩১১১	১৪
আর্মেনিয়া	৩	২০১২	৬
নিউজিল্যান্ড	১৮	৩০৭৭	৫৬
ইন্দোনেশিয়া	৫৪৩	১৬০৫	৮৭২
জাপান	৭২	১৮৩৩	১৩৩
যুক্তরাজ্য	১৭৭	৩৮০১	৬৭৪
মঙ্গোলিয়া	২০	২০৬০	৪১
সুইজারল্যান্ড	৪	৩৯৪৩	১৪
শ্রীলংকা	৪	১৮৫৯	৮
অস্ট্রিয়া	২৭	৩১১৭	৮৪
ডেনমার্ক	৯৮	৩৯৫৭	৩৮৭
বেল-লাক্স	৪	৩৮৮১	১৬
ফ্রান্স	৬৪০	৫২৮৬	৩৩৮৩
ইটালি	৪	৪৫২৪	১৯
বিশ্ব	৬৮০৯৯	৮৩৭	৫৬৯৮৭

উপরিলিখিত বর্ণনায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডাল ফসলের জন্য ব্যবহৃত জমি, ফলন ও উৎপাদন বিষয়ক তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ থেকে ডাল ফসলের সঠিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত হওয়া সম্ভব।

BAMSDOC Library
Dhaka

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছোলা চাষ

১. ভূমিকা

ছোলা বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ডাল ফসল। ছোলার ডাল অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার। এতে আমিষের পরিমাণ প্রায় ২১% ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ প্রায় ২.৭%। ছোলার ভুষি ও শুকনো গাছও পুষ্টিকর এবং তা গরুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ব ছোলার উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য (১৯৯৮)

ক. বিশ্বে ছোলা চাষের জমির পরিমাণ ১.১ কোটি হেক্টর।

খ. এশিয়ায় ছোলা চাষের জমি বেশি, ১.০ কোটি হেক্টর।

গ. এশিয়া ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশে ছোলার চাষ কম।

ঘ. বিশ্বে ছোলার উৎপাদন ৮৬ লক্ষ টন।

ঙ. উত্তর আমেরিকায় ছোলার ফলন বেশি ১৩৮০ কেজি/হেক্টর। দ্বিতীয়, দক্ষিণ আমেরিকা ১০৭০ কেজি/হেক্টর।

চ. ইউরোপে ছোলার ফলন কম ৫৮৮ কেজি/হেক্টর।

ছ. ছোলায় জমির পরিমাণ প্রায় স্থবির আছে।

জ. দেশ হিসেবে ভারতে ছোলার জমি বেশি ৭৩ লক্ষ হেক্টর। দ্বিতীয়, ইরাকে, ৭ লক্ষ হেক্টর।

ঝ. ফলন বেশি চীনে, ৩.৩ টন/হেক্টর। দ্বিতীয় লেবানন ২.৩ টন/হেক্টর। তৃতীয়, মিশর ১.৮ টন/হেক্টর।

ঞ. বাংলাদেশে ছোলার ফলন ৭ টন/হেক্টর।

ট. ছোলা উৎপাদনে বিশ্ব গড় ৭৬৭ কেজি/হেক্টর।

ঠ. ছোলার মোট উৎপাদন বেশি ভারত ৫৮ লক্ষ/টন।

বাংলাদেশের চরাভূমি

বিশ্বের অনুর্বর ভূমি, চরা ভূমি ও উন্নয়ন, পশুখাদ্য উৎপাদন, সবুজ সারকরণ, ইত্যাদির জন্য শিকড়ে নডিউল উৎপাদনকারী লিগিউম ডাল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছোলা চাষ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্য মহাদেশীয় ও দেশীয়ভাবে ছোলার উৎপাদন সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। নিচে এ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হলো।

১.১. মহাদেশীয় ছোলা ফসল তথ্য জমির পরিমাণ (হাজার/হেক্টর)

মহাদেশ	সাল			
	১৯৮৯-৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
আফ্রিকা	৪৫২	৪৮৬	৪৬৪	৪৭৭
উত্তর আমেরিকা	১১৭	১৩৮	১৩৮	১৩৮
দক্ষিণ আমেরিকা	৩৯	১৩	১২	৯
এশিয়া	৯৫৫৩	১০৪০৪	১০১৪০	১০১৫৯
ইউরোপ	৯৭	১৭১	১৪৭	১৪৬
ওসেনিয়া	১৭৩	২৫৬	২০৫	২৬৫
বিশ্ব	১০৪৩১	১১৪৬৮	১১১২	১১১৯৪

১.২. ফলন (কেজি/হেক্টর)

আফ্রিক	৬০৫	৫৮৭	৫৮৭	৬৬৩
উত্তর আমেরিকা	১৩৮৮	১৬১৩	১৪৫৭	১৩৭৯
দক্ষিণ আমেরিকা	৫৭৯	১০৮৩	৮৪৬	১০৭০
এশিয়া	৬৯৫	৬৭৮	৭৫২	৭৬২
ইউরোপ	৭৪৬	৬৪০	৫৭৫	৫৮৮
ওসেনিয়া	১০৪৫	১০৮৬	৯৩২	৯৩৯
বিশ্ব	৭০৪	৬৯৪	৭৫৫	৭৬৭

১.৩. বিভিন্ন দেশের ছোলা উৎপাদন তথ্য (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
ভারত	৭৩০০	৭৮৮	৫৭৫৪
ইরান	৭০০	৪০০	২৮০
বাংলাদেশ	৮৪	৭১৩	৬০
তুরস্ক	৬৩০	৯৫২	৬০০
অস্ট্রেলিয়া	২৬৫	৯০৯	২৪১
ইথিওপিয়া	১৮৫	৬৯২	১২৮
মিশর	৩১	১৭৯০	১১
তাঞ্জানিয়া	৬	১৫০০	৯
তিউনিসিয়া	১৫	১৮৬৮	২৮
পেরু	২	১৬৯৬	৩
চীন	২	৩৩৩৩	৬
লেবানন	৫	২৩১০	১১

জর্ডান	৫	১৪৯০	৭
মেক্সিকো	১৩৮	১০৭৯	১৯০
গ্রিস	২	১০১৬	২
ইটালি	৩	১২১৭	৪
বিশ্ব	১১১৯৪	৭৬৭	৮৫৮৭

১.৪. বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক ছোলা উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
এলাকা	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন
বান্দরবান	২৫	১০	২২	৮	২৪	৯
চট্টগ্রাম	২৫০	১০০	২২৫	১০০	২৬০	১০৫
কুমিল্লা	৩০০	৬৬	২৬৫	৬০	২৭৫	৬০
খাগড়াছড়ি	২০	৮	১৮	৭	২১	১০
নোয়াখালী	৩৭৫	৯০	৩৮০	৯০	৩৮৫	৯৫
রাঙামাটি	২৫	১০	১৭	১০	৩০	১২
সিলেট	৭০	৩০	৭৬	৩২	৮০	৩৭
ঢাকা	২৯৩০	১০১০	২৯৬০	১০২৫	২৮২৫	-৭৫
ফরিদপুর	৫৮৫৬৫	১৪৪৬৫	৫৮৮৬০	১৩৪২০	৫৮৭১০	১৩২৭০
জামালপুর	৮৩৫	২৮০	৮৩৫	২৬০	৮৬০	২৬০
কিশোরগঞ্জ	১৮৬০	৬১০	১৮৬৫	৬১০	১৭২০	৫৮০
ময়মনসিংহ	৩৫৭০	১০৮৫	৩৫৯০	১১০৫	৩৬৮৫	১১৫০
টাঙ্গাইল	১০৪০	৩৫০	১০৭০	৩৪০	১০১০	৩২০
বরিশাল	৯৬৫০	১৮৯০	৯৮০০	২০৭০	৯২৯৫	২২৮৫
যশোর	৬৫৫৮০	১৯৪৭৫	৬৪৯৪০	২০০৬৫	৬৫২৩০	১৯৪৪০
খুলনা	৮৫২০	২৯৫০	৮২৯০	২৯২৫	৮৩৫০	৩০৯০
কুষ্টিয়া	১৯৫৮০	৯৩৪০	১৯২৯০	৯৫৭৫	১৮৯৩০	৮৭১০
পটুয়াখালি	৩৩৯০	৭৫৫	৩৩২০	৭৭০	৩৪৬৫	৮৮৫
বগুড়া	১৫৯০	৫৮০	১৬৬০	৬০৫	১৬২০	৫৯০
দিনাজপুর	৮৩২০	২৩৬৫	৮২৮৫	২৩৪৫	৮০৮৫	২৩৫০
পাবনা	৬৩৯৫	১১৭৫	৬১৮৫	১১৪৫	৫৯৬৫	১১৩৫
রাজশাহী	১৫২৬৫	৪৪৫৫	১৫০৮০	৪২৮৫	১৫০৪০	৪২৪০
রংপুর	১৪৭০	৪৪০	১৩৫৫	৩৯০	১৩১৫	৩৮০
বাংলাদেশ	২০৯৭৮৫	৬১৪৮০	২০৮৫৫৫	৬১৪৮৫	২০৭৬২৫	৫৯৯০০

২. ছোলা গাছের বৈশিষ্ট্য

ছোলা Leguminosae গোত্রের উদ্ভিদ। উপগোত্র Papillionaceae। ছোলার বৈজ্ঞানিক নাম *Cicer arietinum*।

পাতা : যৌগিক উপপত্র শীর্ষ সরু। বর্ণ হালকা সবুজ থেকে সবুজ।

কাণ্ড : কাণ্ড নরম, গোড়া থেকে প্রশাখা হয়। কাণ্ডে পিগমেন্ট থাকতে পারে।

ফুল : প্রতি বোঁটায় ফুলের সংখ্যা ১ থেকে ২টি। ফুলের বর্ণ সাদা থেকে গোলাপি-লাল হতে পারে।

শিকড় : ছোলার শিকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে। এঁটেল মাটিতে এই শিকড় ১২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত নিচে চলে যায়। বীজ গজানোর পর এর বীজ পাতা নিচে থেকে যায়।

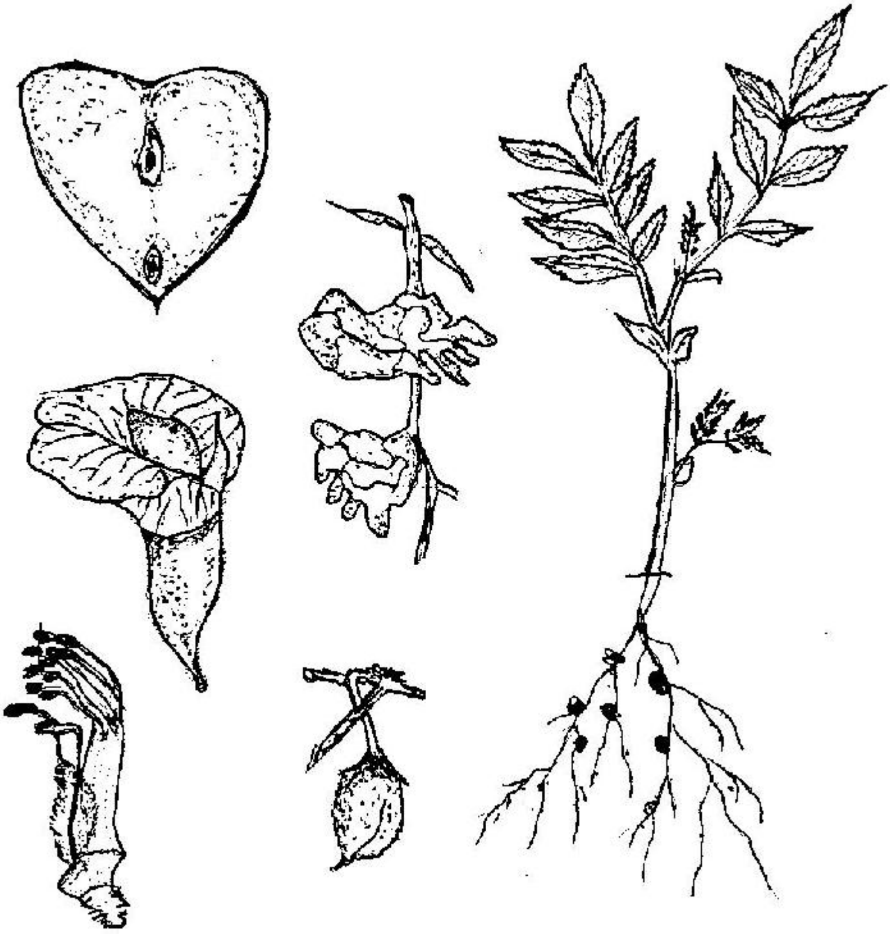

চিত্র ১ : ছোলা গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

৩. ছোলা উৎপাদন পরিবেশগত চাহিদা

(১) ছোলা গাছের বৃদ্ধি ও ফুল আসার সময় দিনের দীর্ঘতা ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

(২) গরম আবহাওয়া ও বড় দিনের পরিবেশে গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। ফুলও তাড়াতাড়ি আসে।

(৩) অনুকূল পরিবেশে ৯০ থেকে ১১০ দিনের মধ্যে ফসল পাকে।

(৪) বড় দিনের পরিবেশে ফুল বেশ তাড়াতাড়ি ফোটে

(৫) প্রথম ফুল আসার ২০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সব ফুল ফুটে যায়।

৪. ছোলার প্রকার

দানার আকৃতি ও বর্ণ অনুসারে ছোলা প্রধানত দু'প্রকার যথা–

(১) দেশী ছোলা : বাদামি বা হলদে বাদামি, দানা ছোট।

(২) কাবুলী ছোলা : সাদা, দানা বড়।

ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমার, ইথিওপিয়া ও স্পেনে দেশী ছোলা বা বাদামি ছোলা বেশি পাওয়া যায়। আফগানিস্তান ও ইরানে কাবুলী সাদা ছোলা বেশি জন্মে।

বাংলাদেশে দেশী জাতের ছোলা চাষ হয়ে থাকে। এ ছোলার বর্তমানে অনেক স্থানীয় জাত ও আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত রয়েছে।

ছোলার উৎস : ছোলার উৎস সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মতে, ছোলার উৎস কমপক্ষে ৩টি। যথা– পশ্চিম এশিয়া, ভারত ও ইথিওপিয়া।

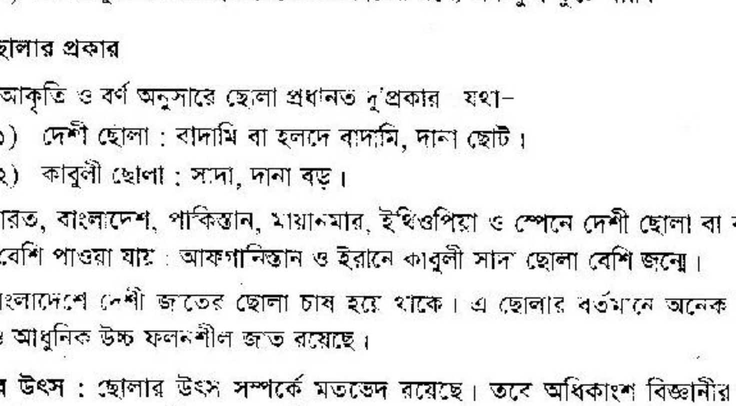

৫. ছোলার জাত

এ উপমহাদেশে ছোলার অনেক জাত রয়েছে। ছোলা গাছের পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফলের আকৃতি এবং বর্ণ পরিবেশগত চাহিদার ভিত্তিতে এসব জাত স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে অন্তত চার ধরনের ছোলার জাত রয়েছে। যথা–

১. স্থানীয় পুরানো জাত : যেমন পাবনাই জাত, রাজশাই জাত।

২. বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জাত : কাবুলী ছোলা, মিশরী ছোলা

৩. বারি ছোলা জাত : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বা অনুমোদিত বারি ছোলা ১ থেকে বারি ছোলা ৬

৪. অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভাবিত বা অনুমোদিত ছোলা জাত। যেমন– বিনা ছোলা, বাউ ছোলা।

নিচে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন জাতের ছোলার বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. বারি ছোলার বৈশিষ্ট্য : বারি ছোলা জাতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	গাছের উচ্চতা (সেন্টিমিটার)	জীবনকাল (দিন)	শত বীজের ওজন (গ্রাম)	বীজের বৈশিষ্ট্য
নবীন	৬০-৭০	১১৫-১২৫	১২-১৩	হলদে বাদামি, গোলাকার
বারি ছোলা-২	৫০-৬০	১২০-১৩০	১৪-১৫	হালকা বাদামি
বারি ছোলা-৩	৫৫-৬৫	১১৫-১২৫	১৮-২০	হালকা বাদামি
বারি ছোলা-৪	৬০-৭০	১২০-১৩০	১৩-১৪	হালকা বাদামি
বারি ছোলা-৫	৫০ ৬০	১২৫-১৩৫	১১-১২	ধূসর বাদামি হিলাম স্পষ্ট
বারি ছোলা-৬	৫৫-৬৫	১২০-১৩০	১৫-১৬	বাদামি হলদে

খ. বিনা ছোলার বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশে আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA) কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলা জাতের বিবরণ নিচে দেওয়া হলো

হাইপ্রোছোলা (High Protein Chola) : হাইপ্রোছোলা একটি উচ্চ আমিষযুক্ত নতুন জাতের ছোলা। গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশী ছোলার জাত "ফরিদপুর-১" এ পরিবর্তন ঘটিয়ে এ জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে এ জাতটি অনুমোদিত হয়।

বিনাছোলা-২ : জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৪ সালে 'বিনাছোলা-২' নামে সারাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়

বিনাইএনএ কর্তৃক উদ্ভাবিত ছোলার জাত দুটির তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	হাইপ্রোছোলা	বিনাছোলা ২
হেক্টর প্রতি ফলন (কেজি)	১৪০০ থেকে ১৫০০	১৫০০ থেকে ১৭০০
গাছের উচ্চতা (সেন্টিমিটার)	৩০ থেকে ৩৫	৪০ থেকে ৪৫
প্রতি গাছের ফলের সংখ্যা	৬০ থেকে ৬৫	৬৫ থেকে ৭০
হাজার বীজের ওজন (গ্রাম)	১৫০ থেকে ১৬০	১৭০ থেকে ১৭৫

বিনাছোলা ২-এর বৈশিষ্ট্য

(১) কাণ্ড শক্ত

(২) গাছ খাড়া।

(৩) গাছের উচ্চতা ৫০-৭০ সেন্টিমিটার।

(৪) বীজের আকার বড়।

(৫) বীজের বর্ণ গাঢ় হলুদ।

(৬) বীজে আমিষের পরিমাণ ২৩-২৪%

(৭) জীবনকাল ১২০-১৩৫ দিন।

(৮) গোড়া পঁচা, ব্লাইট ও গ্রে-মোল্ড (Grey mold) রোগ সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন।

(৯) হেক্টর প্রতি ফলন ১৫০০-১৮০০ কেজি।

গ. **দেশি জাত বা স্থানীয় জাত :** বাংলাদেশে ছোলার বেশ কিছু স্থানীয় জাতের চাষ হয়ে থাকে। তবে এগুলোর বেশিরভাগই কম ফলনশীল এবং রোগ-পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। এসব জাতের মধ্যে ফরিদপুর-১, বাঘারপাড়া-৪৫ ও সবুর-৪ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত এসব জাত চাষের জন্য ১২০ থেকে ১২৫ দিন সময় লাগে। প্রতি হেক্টরে ৭০০ থেকে ৮০০ কেজি ফলন হয়।

দেশি জাতের বৈশিষ্ট্য

(১) ফলন কম।

(২) দানার আকার ছোট।

(৩) সার দিলে গাছ লম্বাটে হয়ে যায়।

(৪) বেশি ফলনের জন্যে আগাম বুনে লাভ হয় না।

(৫) রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

(৬) গাছ বড় না হতেই ফল ধরা শুরু হয়ে যায়।

(৭) ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টি হলে ফুল উৎপাদন বন্ধ হয়ে গাছ সবুজ হয়ে আবার বাড়তে শুরু করে।

(৮) শিকড় ও নডিউল কম।

(৯) দেশী জাতসমূহের মধ্যে সবুর-৪ জাতটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

দেশী জাত

স্থানীয় জাত
পাবনাই
রাজশাহী

স্থানীয় রেকর্ডকৃত জাত
সবুর-৪
ফরিদপুর-১
বাঘারপাড়া-৪৫

৬. ছোলার সাধারণ চাষ প্রযুক্তি

ক. **আবহাওয়া ও পরিবেশ :** ছোলা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ফসল। বাংলাদেশে শীতকালে এর চাষ হয়ে থাকে। ছোলা মেঘলা আবহাওয়া এবং বাতাসে বেশি জলীয় বাষ্প সহ্য করতে পারে না এই অবস্থাতে গাছে ফুল ও ফল ধরতে অসুবিধা হয়। সেই সঙ্গে নানা রোগের উপদ্রব হয়। এই ফসলের খরা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। ছোলার গাছ সবল ও সতেজভাবে বৃদ্ধির জন্য ঠাণ্ডা রাত ও গরম দিনের পরিবেশ ভাল।

খ. **মাটি ও এলাকা :** অনেক ধরনের মাটিতেই ছোলার চাষ হতে পারে। বেলে দোআঁশ, পলিমাটি ও এঁটেল মাটিতে ছোলার চাষ হয়ে থাকে। মাটির অম্লমান (pH) ৬.৫ থেকে ৭.৫।

উৎপাদন এলাকা : যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, রাজশাহী ও পাবনা ছোলা চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য। যেসব থানায় সবচেয়ে বেশি ছোলা চাষ হয় তা হলো–

যশোর : কোতয়ালি, ঝিনাইদহ, ঝিকরগাছা, শ্রীপুর, মাগুরা ও উলাসি।

কুষ্টিয়া : দৌলতপুর, মিরপুর, আলমডাংগা ও চুয়াডাংগা।

ফরিদপুর : বোয়ালমারী, কোতয়ালি ও পাংসা।

রাজশাহী : শিবগঞ্জ ও লালপুর।

পাবনা : উল্লাপাড়া, সাঁথিয়া।

গ. **জমি তৈরি :** বাংলাদেশে কিছুটা উঁচু জমিতে ছোলার চাষ করা হয়ে থাকে। এক থেকে দু'বার লাঙল দিয়ে চাষ করার পর মই দেওয়া হয় অন্য ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনা হলে ছোলা বোনার জন্য পূর্বে সেই ফসলের জমি তৈরিই যথেষ্ট।

ঘ. বীজ বপন হার

সাধারণত দেশী জাতের (ছোট) বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৫০ থেকে ৭৫ কেজি। বড় জাতের বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৭৫ থেকে ১০০ কেজি। নিচে হেক্টর প্রতি বীজ হার উল্লেখ করা হলো।

ছোলার জাত	আগাম		নাবী	
	ছিটিয়ে বোনা	সারিতে বোনা	ছিটিয়ে বোনা	সারিতে বোনা
বড় দানা জাত	৭০-৯০	৬০-৭০	৮০-১০০	৭০-৮০
ছোট দানা জাত	৩৪-৬০	৪০-৫০	৬০-৮০	৫০-৭০

প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা ১৫-২০টি।

বাংলাদেশের আবহাওয়াতে অপেক্ষাকৃত হালকা করে ছোলা বোনা প্রয়োজন। রসালো মাটিতে গাছ বেড়ে খুব ঘন হয়ে গেলে রোগ-পোকার আক্রমণ হতে পারে।

ছোলা বীজের আকার-আকৃতির সমরূপ হলে যন্ত্র দ্বারা বপন করা যায় এবং ফলনও বেশি হয়।

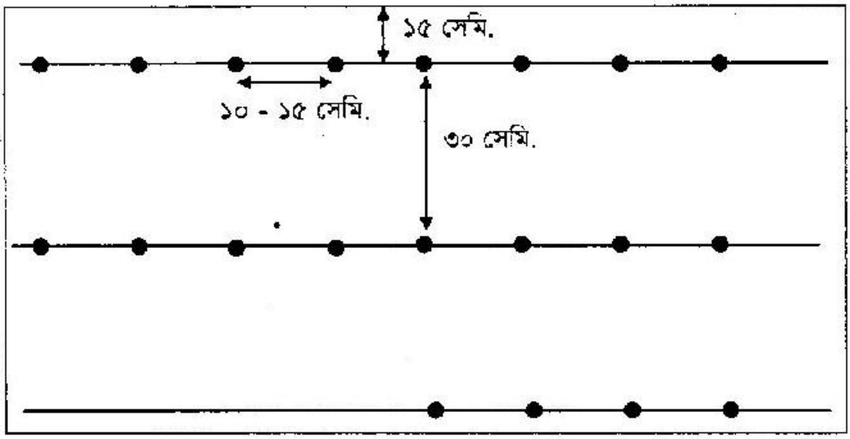

চিত্র ২ : ছোলা বীজ বপন পদ্ধতি

ছোলা চাষে সারি থেকে সারির মাঝে ৩০ সেন্টিমিটার ও গাছ থেকে গাছের মাঝে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্ব হলে নিম্নলিখিতভাবে বীজ হার নির্ণয় করা যায়–

৩০ × ১০ = ৩০০ বর্গ সেন্টিমিটার

প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা = ১০০০০০ / ৩০০ ৩৩.৩৩টি

প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা = ৩৩ × ১০,০০০ = ৩,৩০,০০০টি

হাজার বীজের ওজন = ১৬০ গ্রাম

∴ ৩,৩০,০০০টি বীজের ওজন = (৩ ০ ০ ০ × ১ ৬ ০) / ১০০০ = ৫২.৮০ = ৫৩ কেজি

তত্ত্বীয় বীজ হার = ৫৩ কেজি

মাঠ উপাদান = ২০% অর্থাৎ (৫ ৩ × ২ ০) / ১০০ = ১০.৬০ কেজি

প্রকৃত বীজ হার = ৬৩.৬০ কেজি অর্থাৎ ৬০-৭০ কেজি

ঙ. **বীজ বোনার সময় :** বাংলাদেশে আমন কাটার পর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ছোলার বীজ বোনা হয়। অনেক সময় দেরিতে অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম দিকেও বোনা হয়। অবশ্য এটা অনেকটা আমন ধান কাটার উপর নির্ভর করে। ডিসেম্বর মাসে নাবী বোনার জন্য উচ্চ ফলনশীল ছোলার জাত এখন বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

চ. **বীজ বোনার পদ্ধতি :** জমি তৈরি করার পর ছোলা ছিটিয়ে বোনা হয়। তারপর মই দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। যদি কখনো ধান কাটতে খুব বেশি দেরি হয় তখন চাষীরা ধান

কাটার আগেই সেই জমিতে ছোলার বীজ ছিটিয়ে বুনে। তখন জমিতে কোনো চাষের দরকার হয় না। তবে এতে ফলন কম হয়।

আখের সাথে মিশিয়ে বোনা হলে ছোলা বীজ ছিটিয়ে অথবা দুই সারির মাঝে সারি করে বোনা হয়।

ছ. বীজ বপন গভীরতা : বীজের গভীরতা জমিতে পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার নিচে বীজ বোনা ভাল।

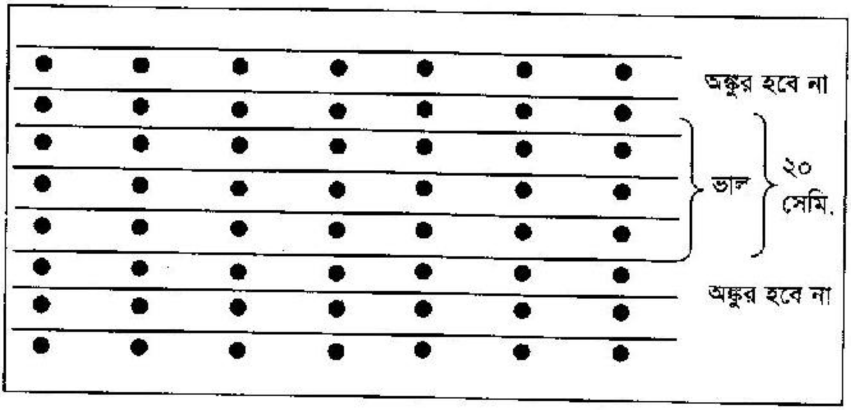

চিত্র ৩ : ছোলা বীজ বপন গভীরতার নকশা

সাধারণ পরিচর্যা : ছোলার সাধারণ পরিচর্যার মধ্যে রয়েছে –

(১) আগাছা দমন ও গাছ পাতলাকরণ
(২) পানি সেচ ও নিকাশ
(৩) সার প্রয়োগ
(৪) রোগ-পোকা দমন
(৫) চাষের শুরুতে খরা দেখা দিলে হাল্কা সেচ;
(৬) অতিবৃষ্টি হলে পানি নিকাশ;
(৭) সারের উপরি প্রয়োগ (সাধারণত করা হয় না);
(৮) গৌণ উপাদান স্প্রে;
(৯) আন্তঃফসল থাকলে তা আগাম সংগ্রহ;
(১০) কীটনাশক প্রয়োগ;
(১১) রোগনাশক প্রয়োগ;
(১২) যথাসময়ে ফসল সংগ্রহ।

ছোলা চাষে উপরে বর্ণিত পরিচর্যা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। এখানে সংক্ষেপে সাধারণ পরিচর্যাসমূহ আলোচনা করা হলো।

ছোলার জমিতে ১-২টি নিড়ানি দিতে হয়। জমি আগাছায় ছেয়ে গেলে ফলন অনেক কম হতে পারে। এমনকি ৩০% থেকে ৫০% ফলন কম হতে পারে।

জমিতে দু'বার নিড়ানি দিতে পারলে সহজে আগাছা দমন করা যায়।

প্রথম নিড়ানি বীজ বোনার ৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় নিড়ানি ৬০ দিন পর দিতে হয়- এতে ছোলার ফলন বাড়ে।

খরায় সেচ প্রদান এবং অতিবৃষ্টি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। জমিতে অনুমোদিত হারে সার ও রোগ-পোকানাশক দ্রব্য প্রয়োগ করতে হয়।

৭. ফসল পদ্ধতি (Cropping system)

ছোলা ফসল চাষের পদ্ধতিসমূহ নিচে সহজভাবে ছকের আকারে উল্লেখ করা হলো-

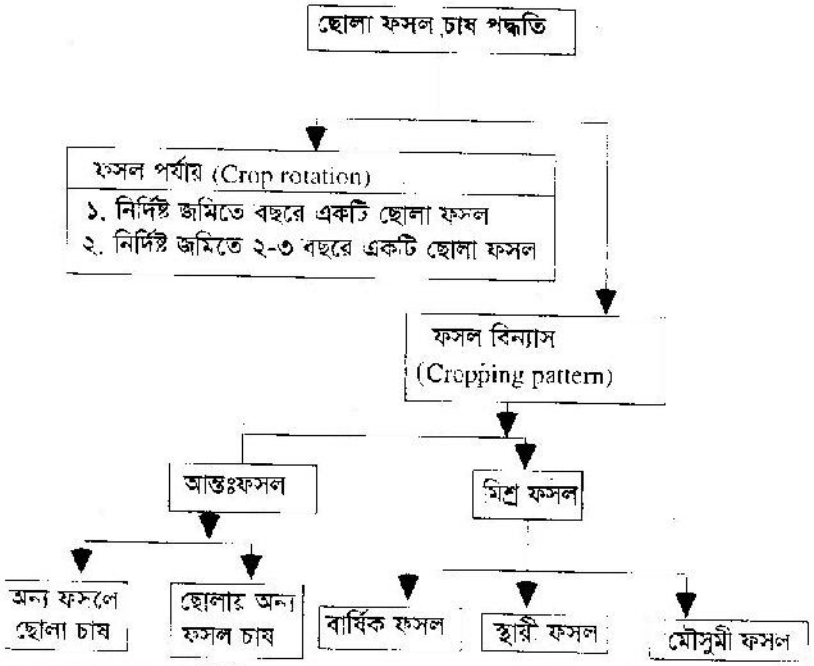

অন্য ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনার জন্য ছোলা একটি উপযোগী ফসল। গম, সরিষা ও খেশারি ফসলের সাথে ছোলা বোনা যায়। ছোলা বীজের পরিমাণ একক ফসল হিসেবে যে পরিমাণ বীজ বোনা হয় তার সমান হওয়া দরকার। তাহলে এ ফসল থেকে লাভজনক ফলন পাওয়া সম্ভব।

ছোলা আখের সাথেও বোনা হয়। বাংলাদেশের আখ চাষের এলাকায় আখের সাথে ছোলা চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কারণ এই ধরনের চাষের সাহায্যে আখের ফলনের কোনো ক্ষতি না করে ছোলার একটা ভাল ফলন পাওয়া যায়।

৮. ছোলাভিত্তিক ফসল বিন্যাস

উঁচু জমিতে *আউশ–, ছোলা-পাট* এবং মাঝারি ও নিচু জমির *বোনা আমন-ছোলা, রোপা আমন-ছোলা* অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ফসল বিন্যাস হিসেবে বিবেচিত।

যেসব জায়গায় গম ও ছোলার চাষ হয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী সেখানে দু'বছর মেয়াদি পর্যায়ক্রমিক চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেমন–

(১) *রোপা আমন-ছোলা-আউশ*
(২) *পাট-ছোলা*
(৩) *রোপা আমন-ছোলা-গ্রীষ্মকালীন-মুগ*
(৪) *রোপাআমন- ছোলা-তিল*

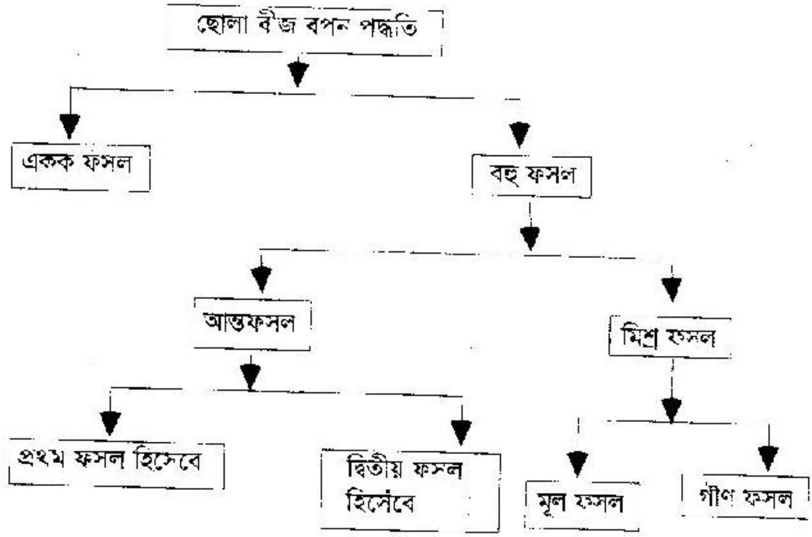

৯. সার প্রয়োগ

ছোলা ফসলে সার প্রয়োগের সাধারণ মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ পদ্ধতি
জৈব সার বা কম্পোস্ট	৫ টন	মূল সার
ইউরিয়া	৪৫-৫০ কেজি	মূল সার
টিএসপি	৬০-৭০ কেজি	মূল সার
এমপি	২০-৪০ কেজি	মূল সার
ডলোচুন	৫০০-৮০০ কেজি	মূল সার
জিপসাম	২০-৩০ কেজি	মূল সার
দস্তা সার	২-৪ কেজি	প্রয়োজনে স্প্রে
বোরন সার	১-২ কেজি	মূল সার

বন্যাপ্লাবিত জমির জন্য উপযুক্ত ও লাভজনক সারের পরিমাণ হলো প্রতি হেক্টরে ৩০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি ও ২০ কেজি এমপি সার। বন্যাপ্লাবিত কিছুটা গাঢ় রঙের জমির জন্য ফসফরাসের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিলেও চলে।

লালমাটি, বরেন্দ্র অঞ্চল ও অন্যান্য অম্লীয় মাটি ডলোচুন দিয়ে শোধন করার পর সুষমভাবে সমন্বিত পুষ্টি সরবরাহ (IPNS) পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হলে ছোলার ফলন অনেক বেড়ে যায়।

ছোলার জমিতে সুনির্দিষ্টভাবে সারের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যে বিএআরসি সার সুপারিশ পদ্ধতি সংকলন করেছে। এখানে তা উল্লেখ করা হলো।

সকল জাতের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলন লক্ষ্যমাত্রা : ১.৮ টন/হেক্টর

ভূমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	B
উত্তম	০-৬	০-৯	০-১৬	০-১০	-	-
মধ্যম	৭-১২	১০-১৮	১৭-৩২	১১-২০	০-.৬	০-.৬
কম	১৩-১৮	১৯-২৭	৩৩-৪৮	২১-৩০	.৭-১.২	.৭-১.২
খুব কম	১৯-২৪	২৮-৩৬	৪৯-৫৫	৩১-৪০	১.৩-২	১.৩-২

মধ্যম ফলন লক্ষ্যমাত্রা

ভূমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	B
উত্তম	০-৪	০-৬	০-১১	০-৭	-	-
মধ্যম	৫-৮	৭-১২	১২-২২	৮-১৪	০-.৬	০-.৬
কম	৯-১২	১৩-১৮	২৩-৩৩	১৫-২১	.৭-১.২	.৭-১.২
খুব কম	১৩-১৬	১৯-২৪	৩৪-৪৪	২২-২৪	১.৩-২	১.৩-২

অম্লীয় মাটিতে ডলোচুন প্রয়োগের মাধ্যমে Ca/Mg দিতে হবে। ভূমির উর্বরতা মানের তথ্য পরিশিষ্টে উপস্থাপিত হয়েছে. অম্লমাটি পরিশোধন করা হলে ফলন বেশি হয়।

ছোলা ফসলে ফসফেট সারের প্রভাব : ছোলায় টিএসপি সার ব্যবহার করে ১৫০% থেকে ১৬০% ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ছোলা ফসলে ফসফেট সার না দিলে গাছে ফুল কম হয়, শিকড় বিস্তার ও নডিউল কম। ছোলার জমিতে অণুজীব ইনোকিউলাম ব্যবহার করলে ১০০ থেকে ১৩৫ কেজি নডিউল-নাইট্রোজেন দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এতে দানার ফলন এবং ভূমির উর্বরতা বাড়ে।

ছোলা ফসলে ফসফেট প্রদানের জন্য টিএসপি, এসএসপি এবং ডিএপি সার প্রয়োগ করা যায়। ডিএপি সার প্রয়োগ করলে তাতে আর ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয় না।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত ছোলা ফসলে ফসফেট সারের প্রভাব নিচে উল্লেখ করা হলো

ফসফেট সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	যশোর	জামালপুর	ফরিদপুর
	১০০	১০০	১০০
	১৫২	১৫১	১৬০

ফলন সূচক ১০০ হিসেবে।

ফসফেট সার ফুল ও ফলের উৎপদান বাড়ায়। মাটিতে ডলোচুন দিলে ফসফেটের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

১০. পানিসেচ ও নিকাশ

ছোলা চাষের জন্য পানি সেচ ও নিকাশ খুবই গুরুত্ব। কারণ পানির ঘটতি হলে যেমন ছোলার ফলন কমে যায়, তেমনি জমিতে আর্দ্রতা বেশি থাকলেও গাছের ফুল ও ফল উৎপাদন কমে যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে বৃষ্টিপাত হলে দানা পরিপক্ব হওয়া পর্যায়ে গাছের পাতা পুনরায় সবুজ হতে শুরু করে। এতে সকল দানা পুষ্ট হতে পারে। ছোলার পানি সেচ-সিডিউল (irrigation schedule) নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) জমি শুকনো থাকলে বীজ বপনের আগে একটি হালকা সেচ দেয়া।

(২) বীজ বপনের সময় মাটি অতিরিক্ত ভেজা থাকলে আরও ১ থেকে ২টি চাষ মই দিয়ে রস কমিয়ে নেওয়া নতুবা বীজ পচে যায়।

(৩) বীজ বপনের পর অতিবৃষ্টি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা।

(৪) জমিতে আগাছা জন্মাতে না দেওয়া।

(৫) সারিতে বীজ বুনলে নালা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া ভাল।

(৬) প্লাবন সেচ দিতে হলে জমি আগে থেকে সমতল ও একদিকে ঢালু করে নিতে হয়।

ছোলার শিকড় মাটির বেশ নিচে যায়। সেজন্য উপরের মাটি শুকিয়ে গেলেও গাছ নিচের মাটি থেকে পানি শুষে নেয়।

বাংলাদেশে ছোলার জমিতে সাধারণত সেচ দেওয়া হয় না। ভেজা মাটিতে ছোলা ভাল ফলন দেয় না। কারণ বেশি রসালো মাটিতে গাছ বড় হয়ে যায়– এতে ফুল ফল কম হয়। এই স্যাঁতস্যাতে পরিবেশ রোগেরও প্রকোপ বাড়ায়।

ছোলার জমিতে সাধারণত ২০% থেকে ২৫% আর্দ্রতা থাকলেই চলে।

মাটিতে রস বেশি থাকলে এবং ফসফেটের ঘাটতি হলে গাছ সবুজ থাকে, তবে ফুল-ফল কম হয়।

১১. ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ছোলা গাছের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো দ্রুত এর ফল পাকতে শুরু করে। তাপমাত্রা বেশি হলে কিংবা জমির মাটিতে পানি কম হলে এই ফল পাকা আরম্ভ হয়। গাছ ও ফলের রঙ হলদে বা বাদামি হলে ফসল কাটার উপযুক্ত হয়।

ছোলা হাত দিয়ে তোলা হয় অথবা কাঁচি দিয়ে গোড়া থেকে কেটে গাছগুলোকে আঁটি বাধা হয়। তারপর ৫ থেকে ৬ দিন রোদে শুকানো হয়। ফল যখন মচমচে হয়ে যায় তখন মাড়িয়ে ছোলার বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজগুলোকে রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

ছোলার বীজ গুদামে পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে ব্রুকিড নামে এক ধরনের পোকা ছোলার জন্য ক্ষতিকর। এজন্য গুদামজাত করার আগে ছোলা বীজ ভালভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয় যাতে করে বীজের আর্দ্রতা ১২% এর উপরে না থাকে। সম্ভব হলে পলিথিন ব্যাগে বীজ রেখে ভালভাবে মুখ বন্ধ করা উচিত। পরিষ্কার মাটির হাঁড়ি বা টিনের কৌটায় বীজ রাখা যেতে পারে। তবে পাত্রের মুখ খুব ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হয়।

১২. ফলন

বর্তমানে বাংলাদেশে ফলন প্রতি হেক্টরে ৬০০ কেজি থেকে ৭০০ কেজি। ফলন বাড়াতে হলে নিম্নরূপ বিষয়ে জোর দিতে হয়। এতে ছোলার ফলন ১.৫ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব।

(১) উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ।
(২) সুষমভাবে সার ব্যবহার (সেকেন্ডারি পুষ্টিসহ)।
(৩) পোকা ও রোগ দমন।
(৪) আগাছা দমন।
(৫) পানি সেচ ও নিকাশ।

১৩. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

ছোলা মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। ছোলার ফসলে প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি থেকে ১০৫ কেজি নাইট্রোজেন সংবন্ধনকৃত হতে পারে।

কোনো জমিতে পূর্বে ছোলার চাষাবাদ না হয়ে থাকলে সেখানে নডিউল উৎপাদন কম হয়। এজন্য প্রথমবারের মতো সে জমিতে অণুজীব ইনোকিউলাম ব্যবহার করতে হয়।

মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণ ইউরিয়া ব্যবহার করলে গাছে নডিউল উৎপাদন কমে যায়।

ছোলা গাছের নডিউলের আকার বেশ বড়। আকার-আকৃতি অনিয়মিত। অন্যান্য ডাল ফসলের সাথে ছোলার নডিউলের সচিত্র তুলনা উপস্থাপন করা হলো।

জীবাণু সার ব্যবহারে বিভিন্ন শস্যের ফলন বৃদ্ধি

ফসলের নাম	ফলন বৃদ্ধির হার (%)
মশুর	৩৩-৮১
ছোলা	২৮-৭৫
মুগ	২১-৩৭
বরবটি	২৫-৪৫
খেশারি	২০-৩০
চীনাবাদাম	৩০-৫১
সয়াবিন	৭১-৩৫২

উৎস : বিনা রিপোর্ট

জীবাণু সারের উপকারিতা : জীবাণু সারের উপকারিতা নিচে উল্লেখ করা হলো–

(১) শস্যের ফলন বৃদ্ধি করে
(২) শস্যের আমিষ বৃদ্ধি করে
(৩) উন্নত পশু খাদ্য তৈরি করে
(৪) শস্যের রোগ বিস্তার কমিয়ে দেয়
(৫) মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে
(৬) পরবর্তী ফসলে নাইট্রোজিন সার কম লাগে।

জীবাণু সার উৎপাদন : মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ; বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BINA) জীবাণু সার বা ইনোকুলাম উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে।

জীবাণু সার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি : এ সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো–

(১) সংগ্রহের সময় অবশ্যই প্যাকেটের গায়ে লেখা ফসলের নাম দেখে নিতে হবে।
(২) এক ফসলের জন্য নির্দিষ্ট জীবাণু সার অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাবে না।
(৩) প্যাকেটের গায়ে লেখা ব্যবহারের শেষ তারিখটি অবশ্যই দেখে নিতে হবে।
(৪) ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় জীবাণু সার সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. পোকা দমন

ছোলার প্রধান ক্ষতিকর পোকা হলো ছোলার ফলছেদক পোকা, জাবপোকা ও কাটুই পোকা। পড বোরার পোকার আক্রমণ হলে আধা মিলিলিটার ডাইমেক্রন ১০০ ও কার্বিক্রন ১০০ ওষুধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে দু'বার ছিটিয়ে দিতে হয়।

১৫. রোগ দমন

(১) ছোলার ব্লাইট রোগ প্রতিরোধের জন্য কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ৪.৫ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে ২ থেকে ৩ বার ছিটিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়।

(২) এ ছাড়া বেনোমিল প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম, ব্যাভিস্টিন-থিরাম (১ঃ৩) অনুপাতে মিশিয়ে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম প্রয়োগ করে শোধন করতে হয়।

১৬. বিনা ছোলা চাষের বৈশিষ্ট্য

এ অধ্যায়ে প্রথম পর্যায়ে ছোলার একটি সাধারণ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ছোলার জাতভেদে এর চাষ পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে। এজন্য এখানে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture বা BINA) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research Institute বা BARI) উদ্ভাবিত ছোলা জাতসমূহের চাষ পদ্ধতির প্রধান প্রধান বিষয় উল্লেখ করা হলো।

(১) বিনা ছোলা চাষ বৈশিষ্ট্য- ২টি জাত।
(২) বারি ছোলার চাষ বৈশিষ্ট্য- ৬টি জাত।

ক. হাইপ্রোছোলা ও বিনাছোলা ২ চাষ পদ্ধতি : বেলে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি বিনা ছোলা চাষের জন্য উপযোগী। তবে অন্য মাটিতেও চাষ করা যেতে পারে। বিনাছোলা ২ জাতটি শুষ্ক এলাকা যেমন বরেন্দ্র এলাকার জন্য বিশেষ উপযোগী।

বীজ বপন : ১৫ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর বীজ বপনের উপযুক্ত

জমি তৈরি : জমির প্রকারভেদে ৪ হতে ৫টি চাষ মই এর প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ : ছোলার জন্য সুষম সার প্রয়োগের দরকার হয়। জমিতে হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া ৮০ কেজি টিএসপি এবং ৫০ কেজি এমপি শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।

বেলে মাটি হলে বীজ বোনার ১ মাস পরে ফসলের অবস্থা অনুযায়ী প্রতি হেক্টরে ১৫ থেকে ২৫ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হয়।

ইউরিয়ার পরিবর্তে জীবাণু সার ব্যবহার করা যায়। প্রতি কেজি বীজে ৩০ গ্রাম জীবাণু সার মেশাতে হয়।

খ. **বীজ বপন** : বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা। সারিতে বুনতে হলে সারি হতে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার ও বীজ হতে বীজের দূরত্ব ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। বীজ জমিতে ছিটানোর পর হাল্কা চাষ ও মই দিতে হয়। সারিতে বুনলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

বীজের হার

হাইপ্রোছোলা : সারিতে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি।

বিনাছোলা ২ : সারিতে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি এবং ছিটিয়ে বপন করলে ৬০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

গ. **পানি সেচ ও নিকাশ** : বৃষ্টি না হলে উঁচু জমিতে একবার পানি সেচ দেয়া ভাল। অতিরিক্ত পানি যাতে না দাঁড়ায় সেজন্য সমতল বা মাঝারি-নিচু জমিতে বীজ বপনের পূর্বেই নিকাশ নালা কেটে রাখা প্রয়োজন।

১৭. বারি ছোলা জাতের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। এ জাতটি ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক অবগুচ্ছমণ্ডলীয় গবেষণা কেন্দ্র (ICRISAT) কর্তৃক উচ্চ ফলনশীল বিবেচনায় ১৯৯৩ সালে জাতটি সারাদেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের বৈশিষ্ট্য হলো–

(১) গাছের উচ্চতা ৫৫ থেকে ৬৫ সেন্টিমিটার

(২) ক্যেনোপির উপরিভাগ মাঝারি বিস্তৃত।

(৩) অগ্রভাগ তুলনামূলকভাবে হালকা, শাখা-প্রশাখা ক্রমে কম।

(৪) গাছের পাতার রঙ গাঢ় সবুজ, উপশিরা বা অকর্ষী লম্বা।

(৫) হাজার বীজের ওজন ১৪৫ গ্রাম থেকে ১৫০ গ্রাম।

(৬) বীজের দুই পাশ সামান্য চ্যাপ্টা।

(৭) বীজের রঙ হালকা বাদামি।

(৮) জাতটি পরিপক্ব হতে ১২০ দিন থেকে ১৩০ দিন সময় লাগে।
(৯) ফলন হেক্টর প্রতি ১.৪ টন থেকে ১.৬ টন।
(১০) এ জাত নেতিয়ে পড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
(১১) বীজে আমিষ ২৪% থেকে ২৬%।

ক. বারিছোলা ৩ : এ জাতটি ১৯৮৫ সালে ইক্রিসাট (ICRISAT) হতে সংগ্রহ করা হয়। বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি ১৯৯৩ সালে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) এ জাতের গাছ খাড়া প্রকৃতির।
(২) উচ্চতা ৬০ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার।
(৩) রঙ হালকা সবুজ।
(৪) পত্রফলক বেশ বড়।
(৫) গাছের ডগা সতেজ।
(৬) বীজ প্রচলিত জাতগুলোর চেয়ে বড়।
(৭) হাজার বীজের ওজন ১৮০ থেকে ১৫০ গ্রাম।
(৮) সঠিক সময়ে বুনলে পরিপক্ব হতে সময় লাগে ১১৫ থেকে ১২৫ দিন।
(৯) রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে এর চাষাবাদ ভাল হয়।
(১০) হেক্টর প্রতি ফলন ১.৮ থেকে ২.০ টন।
(১১) ডাল রান্নার জন্য সময় লাগে ৪৫ মিনিট।
(১২) বীজে আমিষের পরিমাণ ২৩% -২৬%।

বারি ছোলা ২ এবং বারি ছোলা ৩-এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বারি ছোলা-২	বারি ছোলা-৩
গাছ	মধ্যম বিস্তৃত	খাড়া
গাছের উচ্চতা	৫৫-৬৫ সেন্টিমিটার	৬০-৭০ সেন্টিমিটার
হাজার বীজের ওজন	১৪০-১৫০ গ্রাম	১৮০-১৯৫ গ্রাম
গাছ প্রতি পাতা	গাঢ় সবুজ	হালকা সবুজ
জীবনকাল	১২০-১৩০ দিন	১১৫-১২৫ দিন
গাছের ডগা	হালকা	সতেজ
প্রতি হেক্টরে ফলন	১.৪-১.৬ টন	১.৮-২.০ টন

৯. বারিছোলা-৪ (জোড়াফুল) : ছোলার জোড়া ফুল জাতটি ১৯৮৫ সালে ICRISAT হতে নার্সারির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীকালে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে জাতটি কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) এক বৃন্তে দুটি ফুল ও ফল ধরে।
(২) গাছ মাঝারি খাড়া প্রকৃতির।
(৩) গাছের উচ্চতা ৫০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার।
(৪) পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের।
(৫) বয়স্ক গাছের কাণ্ডে খয়েরি রঙের রঞ্জক পদার্থ দেখা যায়।
(৬) বীজের পার্শ্ব সামান্য চ্যাপ্টা।
(৭) ত্বক মসৃণ।
(৮) বীজের রঙ হালকা বাদামি।
(৯) হাজার বীজের ওজন ১৩০ থেকে ১৪০ গ্রাম।
(১০) জীবনকাল ১২০ থেকে ১৩০ দিন।
(১১) হেক্টর প্রতি ফলন ১.৮ থেকে ২.০ টন।
(১২) এ জাত ছোলার ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
(১৩) ডাল রান্নার জন্য সময় লাগে ৩৫ মিনিট।
(১৪) বীজে আমিষের পরিমাণ ১৮%-২১%।

বারি ছোলা ৩ এর বারি ছোলা ৪-এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বারি ছোলা-৩	বারি ছোলা-৪
গাছের উচ্চতা	৬০-৭০ সেন্টিমিটার	৫০-৬০ সেন্টিমিটার
গাছপ্রতি পাতা	হালকা সবুজ	গাঢ় সবুজ
জীবনকাল	১১৫-১২৫ দিন	১২০-১৩০ দিন
ফুল	এক বৃন্তে একটি ফুল	এক বৃন্তে ২টি ফুল
ডাল রান্নার সময়	৪৫ মিনিট	৩৫ মিনিট

গ. **বারিছোলা ৫ (পাবনাই) :** ছোলার পাবনাই জাতটি পাবনা থেকে সংগৃহীত জর্মপ্লাজম থেকে মনোনীত করে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির।
(২) উচ্চতা ৪৫ থেকে ৫৫ সেন্টিমিটার।
(৩) গাছের রঙ হালকা সবুজ।
(৪) চারা অবস্থায় গাছের কাণ্ডে রঙ থাকে না।
(৫) পরিপক্ব অবস্থায় কাণ্ডে হালকা কাণ্ডে খয়েরি রঙ পরিলক্ষিত হয়।
(৬) বীজ ছোট আকারের।
(৭) বীজের রঙ ধূসর বাদামি।

(৮) 'হিলাম' খুব স্পষ্ট।

(৯) বীজের পার্শ্ব সামান্য চ্যাপ্টা।

(১০) দেহ বেশ মসৃণ।

(১১) হাজার বীজের ওজন ১২৫ থেকে ১৩০ গ্রাম।

(১২) এ জাত ১২৫ থেকে ১৩০ দিনে পরিপক্ব হয়।

(১৩) হেক্টর প্রতি ফলন ১.৮ থেকে ২.০ টন।

(১৪) এ জাতটি স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে উদ্ভাবিত বলে এদেশের আবহাওয়ায় এর অভিযোজন ক্ষমতা ভাল।

(১৫) ডাল রান্নার জন্য সময় লাগে ৩৭ মিনিট।

(১৬) বীজে আমিষের পরিমাণ ২০%-২২%।

বারি ছোলা-৪ এবং বারি ছোলা ৫-এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বারি ছোলা-৪	বারি ছোলা-৫
গাছ	মাঝারি খাড়া	মাঝারি ছড়ানো
গাছের উচ্চতা	৫০-৬০ সেন্টিমিটার	৪৫-৫৫ সেন্টিমিটার
গাছপ্রতি পাতা	গাঢ় সবুজ	হালকা সবুজ
হাজার বীজের ওজন	১৩০-১৪০ দিন	১১০-১২০ দিন
ফুল	এক বৃন্তে ২টি ফুল	এক বৃন্তে একটি ফুল

ঘ. **বারিছোলা-৬ :** নাভারুন জাতটি ১৯৮৫ সালে আন্তর্জাতিক নার্সারির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীকালে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে জাতটি কৃষক পর্যায়ে চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৫৫ থেকে ৬৫ সেন্টিমিটার।

(২) পত্রফলক মাঝারি আকারের।

(৩) রঙ হালকা সবুজ

(৪) চারা অবস্থায় কাণ্ডে কোনো রঙ দেখা যায় না

(৫) কিন্তু পরিপক্ব অবস্থায় কাণ্ডে হালকা [illegible] পরিলক্ষিত হয়

(৬) বীজের আকার কিছুটা [illegible]

(৭) ত্বক মসৃণ।

(৮) বীজের রঙ বাদামি হলদে।

(৯) বীজ আকারে দেশী জাতের চেয়ে বড়

(১০) হাজার বীজের ওজন [illegible]

(১১) জীবনকাল ১২৫ থেকে [illegible] দিন

(১২) হেক্টর প্রতি ফলন [illegible]

(১৩) ডাল বন্নার সময় ৩৫ মিনিট

(১৪) আমিষের পরিমাণ ১৯%−২১%

(১৫) এ জাত কিছুটা নাবীতে বপন করা যায়।

বারি ছোলা ৫ ও বারি ছোলা ৬ এর মধ্যে পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বারি ছোলা-৫	বারি ছোলা-৫
গাছের উচ্চতা	৪৫-৫৫ সেন্টিমিটার	৫৫-৬৫ সেন্টিমিটার
হাজার বীজের ওজন	১১০-১২০ গ্রাম	১৫৫-১৬৫ গ্রাম
বীজ	চ্যাপ্টা	গোলাকার
বীজের বর্ণ	ধূসর বাদামি	বাদামি হলদে

১৮. **বারি ছোলা উৎপাদন প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়**

ক. **মৃত্তিকা ও জমি চাষ :** দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ, pH ৫.৫ থেকে ৮.২। তবে লোনা জমিতে ফলন কম হয়। জলাবদ্ধ জমি ছোলার জন্য উপযুক্ত নয়। বাংলাদেশের পলিমাটি ছোলা চাষের জন্য ভাল।

জমি চাষ : মৃত্তিকা আর্দ্রতা সংরক্ষণের জন্য গভীর চাষ দরকার। ৩ থেকে ৪টি আড়াআড়ি চাষ ও প্রয়োজনীয় মই দিয়ে ভালভাবে তৈরি করতে হয়। মই দিয়ে জমি সমতল করতে হয়।

বীজ হার : সাধারণত ৪০ থেকে ৫০ কেজি। সারি থেকে সারির দূরত্ব : ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার। বীজ রোপণ গভীরতা : ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব : ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার। প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা : ২৫ থেকে ৩৫টি।

বারি ছোলা ৬-এর বীজ হার নির্ধারণ (উদাহরণ)

রোপণ দূরত্ব গড় = ২৭ × ১৩ সেন্টিমিটার

প্রতি গাছের জন্য স্থান = ৩৫১ বর্গ সেন্টিমিটার = ৩৫.১ বর্গমিটার

প্রতি হাজার বীজের ওজন = ১৬০ গ্রাম

প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা = ১০,০০০ বর্গ মিটার × ৩৫

$$= ৩,৫০,০০০$$

$$= \frac{৩৫০০০০ \times ১৬০}{১০০০ \times ১০০০} \text{ কেজি}$$

$$= ৩৫ \times ১.৬$$

$$= ৫৬ \text{ কেজি}$$

মাঠ উপাদান ২০% = ১১.২

মোট বীজের পরিমাণ = ৬৭ কেজি (বীজের প্রকৃত মানের ভিত্তিতে)

বীজের প্রকৃত মান (RVS) ৭০% হলে

গ্রস বীজের পরিমাণ = ৬৭+২০
= ৮৭ কেজি

ছিটিয়ে বুনলে উপাদান ১৫% = ৮৭+১৩ = ১০০ কেজি

বীজ বপন পদ্ধতি : ছিটিয়ে ও সারি পদ্ধতিতে ছোলা বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব, গাছের প্রকৃতি ও বপন সময়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হয়।

বীজ বপন সময় : নভেম্বর ১৫ থেকে ডিসেম্বর ১০ তারিখ পর্যন্ত ছোলা বীজ বোনা যায়। তবে বারি ছোলা-৩ জাত অক্টোবর শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বপনের উপযুক্ত সময়।

বারি ছোলায় সার প্রয়োগ : সাধারণ জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৪৫ কেজি, টিএসপি ৮৩ কেজি এবং এমপি ৩৪ কেজি হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

অপ্রচলিত এলাকায় চাষের জন্য নির্দিষ্ট অণুজীব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

তিস্তাবিধৌত এলাকার জন্য উপরোক্ত সারের সাথে হেক্টর প্রতি ১.৫ কেজি বোরন সার ব্যবহার করতে হয়।

সার প্রয়োগের চিত্র বিএআরসি সুপারিশকৃত নির্দেশনা আগে দেওয়া হয়েছে। ফসলের ফলন লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে এই নির্দেশনা অনুসরণ করে সারের সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হয়।

বারি উদ্ভাবিত ছোলা জাতসমূহে জীবনকাল ও গাছের প্রকৃতির ভিত্তিতে বিভিন্ন ফসলের সাথে আন্তঃফসলও চাষ করা যায়। সেক্ষেত্রে আন্তঃফসলসমূহের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সার প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : বপনের ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে প্রথমবার ভালভাবে আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য নিকাশ নালা রাখতে হয়। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বপনের পর হালকা সেচ দিতে হয়।

ছোলার জন্য মাটিতে রসের আর্দ্রতা বেশি ও কম হওয়া দুই-ই ক্ষতিকর। এজন্য ছোলার জমিতে আর্দ্রতা রক্ষণাবেক্ষণে খুব যত্নবান হতে হয়। সেচ দিতে হলে তা নালা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। জমির ঢাল অনুসারে নালা এককভাবে তৈরি করতে হয় যাতে তা পানি নিকাশের কাজেও ব্যবহার করা যায়।

১৯. ছোলার পোকা দমন

ছোলা কয়েক ধরনের পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে দুটি পোকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি পোকার বিবরণ ও দমন পদ্ধতি সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো।

পোকার নাম	ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
কাটুই পোকা	পোকার শূককীট গাছের গোড়া বা শাখা কেটে দেয়। দিনে পোকা মাটির ঢেলার নিচে লুকিয়ে থাকে।	বিএইসি বান ডিউক (১০%) প্রয়োগ বা অলড্রিন (৫%) প্রয়োগ ও প্রতি হেক্টরে ২০ থেকে ২৫ কেজি।

ফল মাজরা	ফল ছিদ্র করে তা নষ্ট করে দেয়	(১) কীড়া ছোট অবস্থায় হাত দ্বারা সংগ্রহ করে মারতে হয় (২) ডেসিস ২.৫ ইসি বা রিপকর্ড ১০ ইসি বা সিমবুস ১০ ইসি বা ফেনম ১০ ইসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হয়।

২০. ছোলার রোগ ও প্রতিকার

ছোলার প্রধান প্রধান রোগ ও প্রতিকার সংক্ষেপে ছকের আকারে উল্লেখ করা হলো।

রোগে নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
বট্রিটিস গ্রে মোল্ড	গাছের কাণ্ড ও পাতায় ধূসর বাদামি দাগ দেখা যায়. ফুল ঝরে যায়।	(১) বীজ শোধন : ব্যাভিস্টিন ৫০ ডব্লিউ পি প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ থেকে ৩ গ্রাম। (২) বনিলাপ স্প্রে। (৩) ব্যাভিস্টিন (৫০%) (কুকউ) ৫০% (০.২০%) মিশ্র প্রয়োগ।
নুয়ে পড়া	পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। গাছ টান দিলে আস্তে উঠে আসে। গাছের শিকড় পচে যায়।	(১) বীজ শোধন : বেনলেট টি ২০ (২) জমিতে সরিষার খৈল প্রয়োগ।
ধসা রোগ	গাছের ডগা নুয়ে গাছ নেতিয়ে পড়ে মারা যায়। কাণ্ডের দাগে গাছ ভেঙে পড়ে।	(১) বীজ শোধন : থিরাপ সি ৫ গ্রাম/কেজি বীজ। (২) স্প্রে কাপ্টান বা জিনেব সি ২.৫ কেজি/হেক্টর ১৫ দিন পর পর স্প্রে।
গোড়া ও কলার পঁচা	গাছের গোড়ার দিকে পচন ধরে। গাছের বাকলে স্ক্লেরোশিয়া দেখা যায়।	(১) বীজ শোধন : ভিটাভেক্স ২০০, প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ থেকে ৩ গ্রাম। (২) মৃত্তিকা প্রয়োগ ডিমোন্জাস সি-২ কেজি/হেক্টর। (৩) সুষম সার প্রয়োগ।

২১. বারি ছোলার ফসল বিন্যাসের উদাহরণ

মিশ্র ছোলা-তিশি-সবুজ সার-- রোপা আমন ফসল বিন্যাস

অবস্থান ও পরিবেশ : রাজশাহী বিভাগের বরেন্দ্র এলাকার জন্য এই ফসল বিন্যাস ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বৃষ্টিপাত : বৃষ্টিপাত গড়ে ১০০ মিলিমিটার, বার্ষিক- চার মাস

মৃত্তিকা : পলি দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ।

ফসল বিন্যাসের সুবিধা : বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রচলিত ফসল বিন্যাস যথা : রোপা আমন-এর পরিবর্তে উল্লিখিত উন্নত ফসল ধারা অবলম্বন করলে নিম্নরূপ সুবিধা পাওয়া যায়।

(১) রোপা জমির উর্বরতা বাড়ায়।

(২) মাটির পরিবেশ উন্নত করে।

(৩) রোপা আমন ধানে ইউরিয়া সার ব্যবহার জনিত ব্যয় প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

(৪) একটি বাড়তি রবি শস্য করা যায় বলে আয় বেশি হয়।

(৫) ডাল ফসলের গাছ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

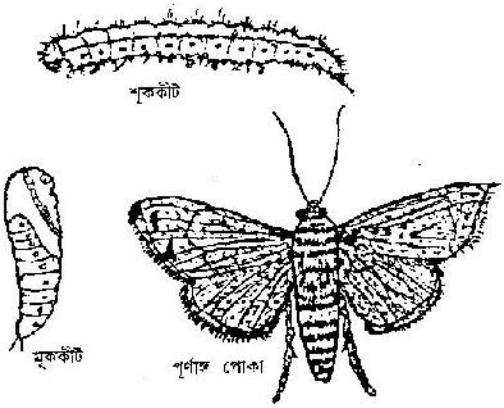

চিত্র ৪ : ছোলার ফল মাজরা পোকা

ফসল বিন্যাস

মিশ্র ছোলা+তিশি

জাতের নাম : ছোলা : নবীন

তিশি : স্থানীয় জাত

বীজ বপন সময় : অক্টোবর মাস

জমি তৈরি : ২ থেকে ৩ টি চাষ মই

সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	৪০-৪৫ কেজি
টিএসপি	৮৫-৯৫ কেজি
এমপি	২৫-৩৫ কেজি

বীজ হার : ছোলা ৩০ কেজি/ হেক্টর (ছিটিয়ে)

তিশি : ৩ কেজি/ হেক্টর

ফসল কাটা : মার্চ মাস

ফলন : ছোলা : ১৫০০ কেজি/ হেক্টর

তিশি : ৪০০ কেজি/ হেক্টর

ছোলা+ভুট্টা আন্তঃফসল

ছোলা : ২ সারি, সারি থেকে সারির দূরত্ব - ৩০ সেন্টিমিটার;

ভুট্টা : ২ সারি, সারি থেকে সারির দূরত্ব - ২৫ সেন্টিমিটার;

ছোলা : ৪ সারি, সারি থেকে সারির দূরত্ব - ৩০ সেন্টিমিটার;

ভুট্টা : ২ সারি, ৩৭.৫ সেন্টিমিটার/ ১৫০ সেন্টিমিটার/ ৩৭.৫ সেন্টিমিটার।

ছোলা-বোনা আউশ-রোপা আমন ফসল বিন্যাস

ছোলা : বারি ছোলা ২

বোনা আউশ– অঙ্কুরিত বোনা আউশ (বি আর-২৬)

রোপা আমন (ব্রিধান ৩২)

জমি : উঁচু ও মাঝারি উঁচু

সেচ : সেচযুক্ত

বারি ছোলা ২ : বপন ১৫ নভেম্বর-৭ ডিসেম্বর

ফসল তোলা : ২৫ মার্চ-১০ এপ্রিল

অঙ্কুরিত বোনা আউশ : বপন ১০-২০ এপ্রিল

ফসল কাটা : ৮ থেকে ১৮ জুলাই

রোপা আমন : রোপণ ২৫ জুলাই থেকে আগস্ট ১০

ফসল কাটা : ১ থেকে ১৫ নভেম্বর।

তৃতীয় অধ্যায়

খেশারি চাষ

১. ভূমিকা

এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশে খেশারির অবস্থান প্রথম। বাংলাদেশে মোট খেশারি চাষভুক্ত জমির পরিমাণ প্রায় আড়াই লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৯০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) এ পর্যন্ত দুটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এসব জাতের বিষক্রিয়ার টক্সিনের মান কম, শতকরা ০.০৬ ভাগ মাত্র।

খেশারি বাংলাদেশে বিশেষ করে স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য একটি জনপ্রিয় ডাল। খেশারি চাষের পরিমাণ অন্যান্য ডাল ফসলের থেকে বেশি, বর্তমানে মোট ডাল ফসলের প্রায় ৩০%। আগে এর পরিমাণ আরও বেশি ছিল।

২. উৎপত্তি ও বিস্তার

খেশারির মূল উৎপত্তি দক্ষিণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া। তবে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন প্লাবন ভূমিতে এর চাষ বেশি হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে নিচু হাওড় এলাকায় এবং রোপা আমনের সাথে অনুফসল ও মিশ্র ফসল হিসেবে খেশারির চাষ বেশি হয়। ধারণা হতে পারে যে, এ ধরনের নিচু ও মাঝারি নিচু মাটির কোনো এলাকায় এর উৎপত্তি হয়েছে।

৩. খেশারির উদ্ভিদতত্ত্ব

খেশারি একটি লতানো গাছ। এর বেশ শাখা-প্রশাখা হয় এবং শিকড় মাটির অনেক নিচে যায়। সেজন্য খেশারি বেশ খরা সহ্য করতে পারে।

খেশারির ফল উৎপাদনের জন্য বড় দিনের প্রয়োজন হয়। খেশারির অঙ্কুরোদ্গম 'মৃৎগত' (hypogeal)। বীজ গজানোর পর বীজপত্র মাটির নিচেই থেকে যায়।

খেশারির শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান

গোত্র : Leguminosae

উপগোত্র : Papilionaceae

গণ : *Lathyrus*

প্রজাতি : *L. sativus*

গাছ : লতানো, পাতা : সরু

ফুল : সাদা, নীল ও মিশ্র,

কাণ্ড : নরম, ফল : শুটি বা পড প্রকৃতির এবং

শিকড় : মাঝারি গভীর।

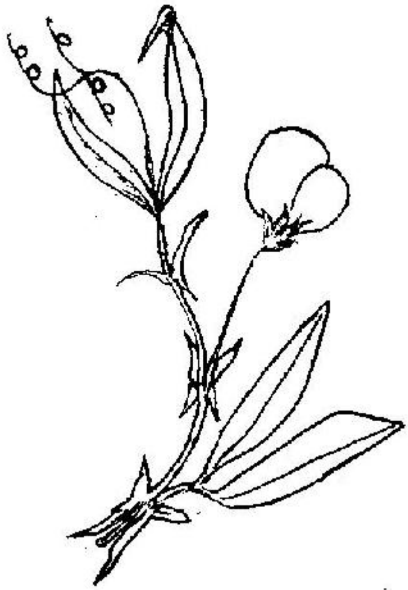

চিত্র ১ : খেশারি গাছের একাংশে ফুল, পাতা ও ফল দেখানো হয়েছে।

২. খেশারির জাত

বিশ্বে এবং বাংলাদেশে বহু জাতের খেশারি রয়েছে। উৎপত্তি ও ফলন ক্ষমতা অনুসারে এগুলোকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যায়। যেমন-

বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উভয় জাতের খেশারি চাষ হয়ে থাকে। এখানে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

দেশীয় জাত : বহু বছর ধরে বাংলাদেশে খেশারির চাষ হয়ে আসছে। তাই এদেশে এর নানা ধরনের জাতও রয়েছে। এসব জাতের বেশিরভাগের ফলন কম। এসব জাতের মধ্যে কলারোয়া এবং নং ৬১৩০ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫. খেশারির পরিবেশগত চাহিদা

ক. **আবহাওয়া :** খেশারি অনেকটা ঠাণ্ডা আবহাওয়ার ফসল। বাংলাদেশে শীত মৌসুমেই এর চাষ হয়ে থাকে। এ ফসলের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা হলো ১০° থেকে ৩০° সে.।

খ. **জমি ও মাটি :** অনেক ধরনের মাটিতেই খেশারির চাষ হয়ে থাকে। অনুর্বর বেলে মাটি থেকে শুরু করে এঁটেল মাটিতেও এর চাষ হয়ে থাকে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খেশারির চাষ নিচু জমিতে ধান কাটার পর করা হয়। মাটি মোটামুটি এঁটেল হয়ে থাকে। কিছুটা লোনা মাটিতেও এর চাষ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে ঢাকা, বরিশাল, রাজশাহী, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী এলাকায় খেশারির চাষ বেশি হয়। তবে খেশারি চাষের প্রধান প্রধান এলাকা হলো–

(১) ঢাকা : কালিয়াকৈর, ঘিওর, সিংগাইর ও নরসিংদী।
(২) বরিশাল : কোতয়ালী, ভোলা, বোরহানউদ্দিন, তজুমুদ্দিন ও ঝালকাঠি।
(৩) রাজশাহী : নাটোর, নওয়াবগঞ্জ, লালপুর ও পুটিয়া
(৪) ফরিদপুর : জাজিরিয়া, নড়িয়া ও গোয়ালন্দ ঘাট।
(৫) নোয়াখালী : হাতিয়া, লক্ষীপুর ও রায়পুর।
(৬) নেত্রকোণা : মোহনগঞ্জ, আটপাড়া ও বারহাট্টা।

৬. খেশারির সাধারণ উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি তৈরি : বীজ বোনার আগে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হয়। ধানের পর বোনা হলে ধান কাটার ১ থেকে ২ সপ্তাহ আগে জমিতে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। উঁচু এলাকায় জমি তৈরির জন্য ১ থেকে ২ টি চাষ মই দেওয়া হয়।

বীজ সংগ্রহ : বাংলাদেশের বেশিরভাগ কৃষক তাদের নিজেদের জমি থেকেই বীজ সংগ্রহ করে। ঠিকমত বীজ রাখতে পারলে প্রায় দুই বছর পর্যন্ত বীজ ভাল থাকতে পারে। গাছের নিচের অংশ থেকে সংগ্রহ করা বীজে বেশি ফলন হয়।

বীজ বোনার সময় : আউশ অথবা পাটের পর খেশারি বীজ বোনা হলে অক্টোবর মাসে বীজ বোনা উচিত। আগাম আমনের পরে বোনা হলে নভেম্বর মাসের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বীজ বোনা যায়। রোপা আমন বা বোনা আমনের পর বোনা হলে নভেম্বরের শেষ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে বীজ বোনা উচিত।

বীজের হার : খেশারি একক ফসল হিসেবে বোনা হলে প্রতি হেক্টরে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি বীজ লাগে। অন্য ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনা হলে বীজ লাগে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি থেকে ২০ কেজি। জমিতে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকলে কিছুটা বেশি হারে বীজ বুনতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : খেশারি সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। উঁচু এলাকায় জমি চাষ করার পর খেশারি সারি করে বোনা যেতে পারে। খেশারি বীজ মাটির ১.৫ থেকে ২ সেন্টিমিটার গভীরে বুনতে হয়।

সারি থেকে সারির দূরত্ব : ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার এবং
গাছ থেকে গাছের দূরত্ব : ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার রক্ষা করতে হয়।

সার প্রয়োগ : বাংলাদেশে খেশারির জমিতে সার ব্যবহার কম হয়। তবে হেক্টর প্রতি ভাল ফলনের জন্য নিম্নরূপ সার দিতে হয়–

সাধারণ সার সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	৩০-৪০	মূল সার
টিএসপি	৫০-৭০	মূল সার
এমপি	৪০-৫০	মূল সার
ডলোচুন	৪০০-৬০০	মূল সার
জিপসাম	৩০-৪০	ঘাটতি এলাকায়
জৈবসার	২-৫ টন	সম্ভব হলে
অণুজীব সার	প্রাপ্তি সাপেক্ষে, নির্দেশনা অনুসারে	

এখানে সকল জাতের ক্ষেত্রে (উচ্চ ফলন লক্ষ্যমাত্রা : ১.২ টন/হেক্টর) বিএআরসি অনুমোদিত সার সুপারিশ নির্দেশনাও প্রদান করা হলো–

ভূমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	B
উত্তম	০-৫	০-৪	০-৫	০-১.৫	-	-
মধ্যম	৬-১০	৫-৮	৬-১০	১.৬-৩	-	-
কম	১১-১৫	৯-১২	১১-১৫	৩.১-৪.৫	-	-
খুব কম	১৬-২০	১৩-১৬	১৬-২০	৪.৬-৬	-	-

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় দিতে হয়।

বাংলাদেশে প্রকৃত খেশারি জমির উর্বরতা মান মধ্যম থেকে কম হতে পারে। সেই অনুসারে সার নির্দেশনা অনুসরণ করতে হয়।

৭. ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ

খেশারি গাছের পাতা হলুদ এবং ফলের রঙ ধূসর হলে গাছ তুলে বা কাঁচি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়। এরপর গাছগুলোকে ৭ থেকে ৮ দিন রোদে শুকানোর পর মাড়িয়ে ফল থেকে বীজ বের করা হয়। ফল থেকে বীজ বের করার পর রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

ফলন : বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি হেক্টরে খেশারির উৎপাদন ৭০০ থেকে ৮০০ কেজি। ফলন বাড়ানোর জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

(১) উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার।

(২) সুষম হারে রাসায়নিক ও অণুজীব সার ব্যবহার।

(৩) পোকা ও রোগ দমন।

(৪) ভালভাবে পরিচর্যা করা।

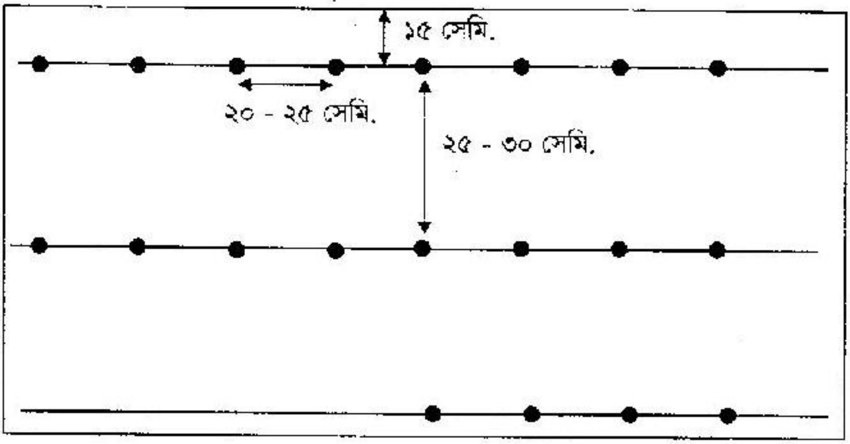

চিত্র ২ : খেশারির বীজ বপন নকশা

৮. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

শিমজাতীয় গাছ হিসেবে খেশারি গাছ মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এক হেক্টর ভাল খেশারির জমিতে প্রায় ১০০ কেজি নাইট্রোজেন বাতাস থেকে মাটিতে সংবন্ধন হতে পারে। শিকড়ে নডিউলের অভ্যন্তরে সেই নাইট্রোজেন জমা হয়।

সাধারণ চাষে খেশারিতে নডিউলের সংখ্যা কম হয়। তবে বীজের সাথে মিশিয়ে অণুজীব সার ব্যবহার করলে নডিউলের সংখ্যা বাড়ে, নডিউলের আকার বড় হয়। ফল পরিপক্ব হওয়ার পর গাছ না উপড়িয়ে গোড়ায় ছেঁটে নিয়ে বা কেবল ফল তুলে নিয়ে এই নডিউল মাটির উর্বরতা বাড়ানো যায়।

৯. খেশারির উচ্চ ফলনশীল জাত

ক. বারি খেশারি-১ : বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দুটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-

(১) বারি খেশারি জাতটি ১৯৯৫ সালে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(২) জাতের গাছ গাঢ় সবুজ রঙের।

(৩) গাছে প্রচুর শাখা হয়ে থাকে।

(৪) ফুলের রঙ নীল, বীজের রঙ ধূসর থেকে হালকা ধূসর।

(৫) এ জাতের হাজার বীজের ওজন ৪৫ থেকে ৫৫ গ্রাম।

(৬) জাতটি পরিপক্ব হতে ১১০ থেকে ১১৫ দিন সময় লাগে।

(৭) জাতটি বাংলাদেশের সমগ্র এলাকাতেই চাষ করা যায়।

(৮) ফলন হেক্টর প্রতি ১.৪ থেকে ১.৬ টন।

(৯) এই জাতের গাছ গো-খাদ্য হিসেবেও ভাল।

খ. **বারি খেশারি-২** : এ জাতটি ১৯৯৬ সালে সারাদেশে আবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

(১) গাছের উচ্চতা ৫৫ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার।

(২) পাতা স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশি চওড়া।

(৩) ফুলের রঙ নীল।

(৪) হাজার বীজের ওজন ৫০ থেকে ৫৫ গ্রাম।

(৫) বীজের রঙ হালকা ধূসর।

(৬) জীবনকাল ১১০ থেকে ১১৫ দিন।

(৭) হেক্টর প্রতি ফলন ১.৫ থেকে ১.৬ টন।

(৮) গাছ গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১০. বারি খেশারি উৎপাদন প্রযুক্তি (সারমর্ম)

জমি ও মৃত্তিকা : এঁটেল দোআঁশ থেকে এঁটেল মধ্যম অম্লীয় থেকে মধ্যম ক্ষারীয় মাটিতে ভাল জন্মে। ১২০০ মিটারের অধিক উঁচু পাহাড়ের ঢালের মাটিতে জন্মানো যায়। সাধারণ নিচু জমিতে ভাল হয়। খরাপ্রবণ মাটিতেও ফলানো যায়।

খেশারি প্রধানত আমন ধান কাটার পূর্বে সাথী ফসল হিসেবে আবাদ করা হয়। এতে ভিন্নভাবে কোনো চাষের প্রয়োজন হয় না। একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : সাথী ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে আমন ধান কাটার প্রায় এক মাস পূর্বে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা অবস্থায় ছিটিয়ে বপন করতে হয়। একক ফসল হিসেবেও ছিটিয়ে বপন করা যায়। তবে সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারির দূরত্ব ৫০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়।

বীজ বপন সময় : শেষ অক্টোবর থেকে নভেম্বর।

বীজ বপন হার : ৫০ থেকে ৬০ কেজি/হেক্টর, তবে সাথী ফসলের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ কেজি বীজ দিতে হয়।

প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা : ২০ থেকে ৩০টি রাখা ভাল।

পরিচর্যা : বীজ বপনের ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করতে হয়।

১২. ফসল পদ্ধতি (cropping system)

(১) একক চাষ : ধান বা অন্য ফসল কাটার পর ২ থেকে ৩টি চাষ দিয়ে ছিটিয়ে বপন বা লাঙল দ্বারা নালা টেনে সারিতে বীজ বপন করতে হয়।

(২) বোনা আমন ধানের জমিতে অনুফসল : ধান কাটার ১৫ থেকে ২০ দিন আগে জমিতে আর্দ্রতা থাকা অবস্থায় ছিটিয়ে বীজ বপন করতে হয়

রিলে ফসলে বীজ বপন : রিলে ফসলের ক্ষেত্রে বীজ বপন আমন ধান পাকার সময় এবং জমিতে রসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে বীজ বপন করতে হয়।

সার প্রয়োগ : একক ফসলের জন্য জমিতে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৪৫ কেজি, টিএসপি ৮০ কেজি এবং পটাশ ৩০ কেজি হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অপ্রচলিত এলাকায় আবাদের জন্য প্রতি কেজি বীজের সাথে ১০০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুবীজ সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। রিলে ফসলের ক্ষেত্রে সাধারণত সার দেওয়া হয় না।

১৩. খেশারির ব্যবহার

খেশারির ডাল সাধারণত স্বল্প আয়ের লোকেরাই বেশি ব্যবহার করে থাকে। গ্রামের লোক কমবেশি এই ডাল খেয়ে থাকে।

বিষাক্ততা কমানো : স্থানীয় জাতের এই ডাল থেকে ক্ষতিকর বা বিষাক্ত পদার্থ দূর করার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে। নিচে এই উপায়গুলোর বর্ণনা করা হলো-

(১) রান্না করার আগে ডালকে সিদ্ধ করে তার পানি ফেলে দিয়ে রান্না করা উচিত।

(২) ডাল রান্না করার আগে ডালকে প্রায় ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে রান্না করার আগে সে পানি ফেলে দিতে হয়।

(৩) ডালকে ২০ মিনিট ধরে ভাজলে (১৫০° সেঃ) ডালের ক্ষতিকর পদার্থ দূর হয়।

খেশারির বিষাক্ততা নিয়ন্ত্রণ : খেশারি একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাল ফসল হওয়া সত্ত্বেও এর বিষাক্ততার কারণে যুগে যুগে খেশারি চাষের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়েছে। খেশারি বেশি খেলে লেথারিজম (Lathyrism) নামে একটি রোগ হয়। এতে শরীরের হাত পা অবশ হয়ে যায়। খেশারির এই বিষকে নিউরোটক্সিন (Neurotoxin) বলে। রাসায়নিকভাবে B-(N)-Oxalyl Amino-Alanine বা সংক্ষেপে BOAA.

খেশারির বিষাক্ততা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়, যথা–

(১) কম বিষাক্ত জাত উদ্ভাবন

(২) BOAA- এর বিষাক্ততা বিনষ্টকরণ

ভারতের পুশা -২৪ LSD-1, LSD-3, LSD-6 প্রভৃতি জাতে BOAA- এর পরিমাণ কম অর্থাৎ (০.১৫ থেকে ০.২০%)। ভারত ও বাংলাদেশে স্থানীয় জাতসমূহে BOAA- এর মাত্রা বেশি ০.২০% এর বেশি : তবে মৃত্তিকা ও আবহাওয়াভেদে একই জাতের খেশারিরও BOAA- এর মাত্রা কম বেশি হতে পারে।

খেশারি ডাল পানিতে সিদ্ধ করে সেই পানি ফেলে দেওয়া। এতে প্রায় ৯০% বিষাক্ততা কমে যেতে পারে।

১৪. পোকা দমন

জাবপোকা খেশারির প্রধান ক্ষতিকারক পোকা। ০.০৪% 'মনক্রোটোফস' অথবা ০.০৩% 'ফসফামিডন' অথবা ০.০৭% 'এণ্ডসালফান' ৬০০ থেকে ৭০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি হেক্টরে ব্যবহার করে জাবপোকা দমন করা যায়।

১৫. খেশারির রোগ দমন

খেশারির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রোগ হলো-

(১) পাউডারি মিলডিউ
(২) ডাউনি মিলডিউ
(৩) রাস্ট।
(৪) উইল্ট।

খেশারির প্রধান প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে মরিচা ধরা, ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলডিউ প্রভৃতি। এগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো-

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
মরিচা রোগ	পাতায় মরিচার মতো দাগ পড়ে	স্প্রে ডাইথেন এম ৪৫ সপ্তাহ পর পর ২ থেকে ৩ বার
ডাউনি মিলডিউ	পাতা হলদে হয়ে ঝলসে যায়, পাতায় সাদাটে আবরণ পাতার নিচে ছত্রাকের স্পষ্ট অবস্থান	স্প্রে কপার অক্সিক্লোরাইড ৩ কেজি/ হেক্টর। রিডোমিল এম জেড (.০২%) ১২ দিন পর পর ৩টি স্প্রে
পাউডারি মিলডিউ	পাতায় সাদা গুঁড়া দাগ দেখা যায়। পাতা ও কচি ডগা বিনষ্ট হয়ে গাছ মারা যায়।	স্প্রে সালফার গুঁড়া ৩০কেজি/ হেক্টর দ্রবণযোগ্য সালফার ৯৫ কেজি/হেক্টর।

১৬. ডাল ফসলে জীবাণু সারের ব্যবহার

Rhizobium এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া যা শিমজাতীয় ফসলের শিকড়ে গুঁটি (নিডউল) তৈরি করে থাকে। এই জাতীয় ব্যাকটেরিয়া নিজেদের পুষ্টি আহরণের জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং পোষক গাছটি কেও তা সরবরাহ করে। সাধারণ অবস্থায় মাঠে বীজ বোনার ২১-২৮ দিনের মধ্যে শিমজাতীয় ফসলের শিকড়ে গুঁটি দেখা যায়। গুঁটিগুলোর আকার-আকৃতি ও রঙের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কার্যকরি গুঁটিগুলো সাধারণত বড় হয় এবং মূল শিকড় অথবা পার্শ্ব শিকড়ের উপরের দিকে গুচ্ছ অবস্থায় থাকে। এই গুঁটিগুলোর ভিতরের দিকটা গাঢ় লাল রঙের হয়।

অকার্যকর গুঁটি আকারে ছোট, সাদা থেকে হালকা সবুজ রঙের হয়, সংখ্যায় অধিক এবং সেগুলো সমস্ত শিকড়ে ছড়ানো অবস্থায় থকে।

জৈবিক নাইট্রোজেন সংবন্ধন প্রযুক্তির মাধ্যমে শিমজাতীয় ফসলের ফলন আশানুরূপ মাত্রায় বাড়ানো সম্ভব। নাইট্রোজেন সংবন্ধন সক্ষম জীবাণুকে সংগ্রহ ও সংবন্ধন করে এক ধরনের সার তৈরি করা হয়– যা জীবাণু সার বা ইনোকুলাম নামে পরিচিতি।

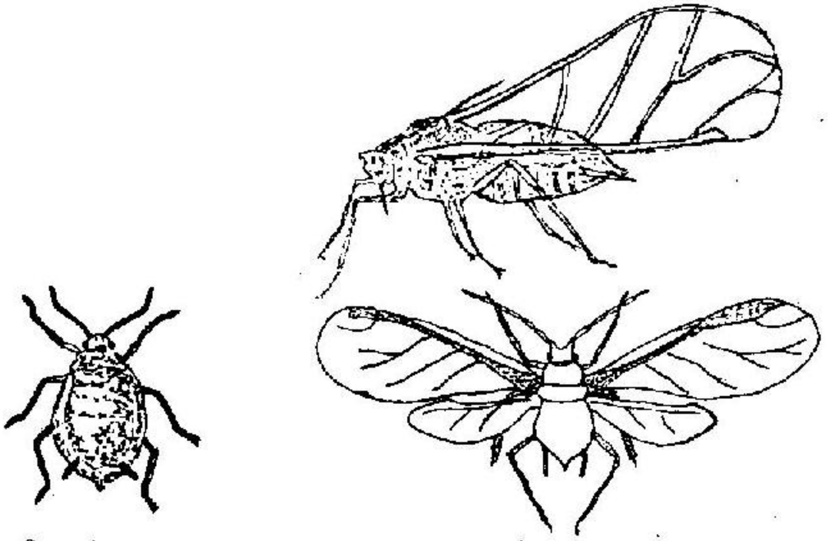

পাখাহীন পূর্ণ বয়স্ক জাব পোকা   পাখাযুক্ত পূর্ণ বয়স্ক জাব পোকা

চিত্র ৩ : জাব পোকা

জীবাণু সারের প্রভাব : নিচে জীবাণু সারের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

(১) গাছের শিকড়ে অধিক সংখ্যক নাইট্রোজেন গুটি তৈরি হয়

(২) গাছের ডালপালা ও উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(৩) গাছ অধিক সবুজ ও রসালো দেখায়।

(৪) পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে না।

(৫) বীজে পরিমাণ মতো উঠা (গাম এরাবিক) মেশাতে হবে যাতে বীজগুলো আঠালো হয়। আঠার অভাবে পানিও মেশানো যেতে পারে।

(৬) আঠালো বীজে জীবাণু সার এমনভাবে মেশানো উচিত যাতে বীজের গায়ে কালো প্রলেপ পড়ে।

(৭) জীবাণু সার মিশানো বীজ কিছু সময় ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে নিতে হয়।

(৮) সকালে বা বিকালে অল্প রোদে জীবাণু সার মেশানো বীজ বপন করতে হয়।

(৯) জীবাণু সার মেশানো বীজ অবিলম্বে বপন করে বপনের পর দ্রুত মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

জীবাণু সার ব্যবহারে সতর্কতা

(১) জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ বা জীবাণু সারকে রোদে রাখা যাবে না।

(২) বীজে জীবাণু সার মেশানোর পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাড়াতাড়ি বপন করতে হয়।

(৩) জীবাণু সার ও জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে।

জীবাণু সার স্থানান্তরে সতর্কতা

(১) গাড়ি বা বাসে পরিবহনের সময় জীবাণু সারের প্যাকেট ইঞ্জিন, তপ্ত বেঞ্চ বা খোলা ছাদের উপর রাখা উচিত নয়।

(২) জীবাণু সারের প্যাকেট ঢাকনাবিহীন অবস্থায় রোদে বহন করা উচিত নয়।

BANSDOC Library Dhaka

চতুর্থ অধ্যায়

মশুর চাষ

১. **উৎপত্তি ও বিস্তার :** মশুরের সম্ভাব্য উৎপত্তি স্থানগুলো হচ্ছে পশ্চিম এশিয়া, গ্রিস ও ইটালি।

প্রজাতি প্রকার : মশুর প্রধানত দু' প্রকার যথা–

(১) মালকা মশুর– দানা বড় ;

(২) মুশুরি– দানা ছোট।

বাংলাদেশের মশুরি (Musri) প্রকারের মশুরের চাষ বেশি হয়।

মশুর বাংলাদেশের সুস্বাদু জনপ্রিয় ডাল। গবাদি পশুর খাবার হিসেবেও ডালের খোসা ও খড় ব্যবহার করা হয়।

২. **বিশ্বে মশুরের উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য (১৯৯৮)**

ক. বিশ্ব জমি ৩৪ লক্ষ হেক্টর।

খ. বিশ্ব উৎপাদন ৩০ লক্ষ টন।

গ. এশিয়া মহাদেশে মশুরের চাষাধীন জমি ২৭ লক্ষ হেক্টর।

ঘ. মশুরের হেক্টর প্রতি ফলন বেশি ওসেনিয়া ১৪৩৭ কেজি।

ঙ. এশিয়ায় ফলন মাত্র ৮১৭ কেজি/হেক্টর।

চ. বিশ্বে মশুর উৎপাদন প্রায় স্থবির হয়ে আছে।

ছ. দেশ হিসেবে বেশি ফলন লেবাননে, ২২১০ কেজি/হেক্টর। মিশরে ১৬৮৪ কেজি/হেক্টর। আজারবাইজানে ১৬৬০ কেজি/হেক্টর।

জ. ফলন কম ইরানে ও বাংলাদেশে ; ৪০০-৫০০ কেজি/হেক্টর।

ঝ. মশুর চাষের জমি ভারতে ১২ লক্ষ হেক্টর ; ফলন মাত্র ৭৩৬ কেজি/হেক্টর। তবে মোট উৎপাদন বেশি।

ঞ. তুরস্কে ৫.৫ লক্ষ হেক্টর জমি ৬ লক্ষ টন মশুর উৎপাদিত হয়

ট. অস্ট্রেলিয়ায় মশুরের জমি দ্রুত বাড়ছে ১৯৮৯ সালে ৬ হাজার হেক্টর থেকে ১৯৯৮ সালে ৮৩ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে ভেচ মশুরও রয়েছে

ঠ. মশুরের জমি :

বাড়ছে	কমছে	প্রায় সমান আছে
আফ্রিকা উত্তর আমেরিকা ওসানিয়া (অনেক বেশি)	দক্ষিণ আমেরিকা ইউরোপ	এশিয়া

২.১ মহাদেশীয় মশুর উৎপাদন তথ্য জমির পরিমাণ (হাজার/হেক্টর)

মহাদেশ	সাল			
	১৯৮৯-৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
আফ্রিকা	১১১	১১৪	১১৩	১১৮
উত্তর আমেরিকা	২১৩	৩৬৯	৪০৮	৪৪৫
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৪	২৯	২৭	২৭
এশিয়া	২৭১৪	২৭৯০	২৬৯৬	২৬৯০
ইউরোপ	৬৪	৫৮	৫৩	৪২
ওসেনিয়া	৬	১৯	৫৮	৮৩
বিশ্ব	৩২২৮	৩৩৭৯	৩৩৫৫	৩৪০৪

২.২ ফলন (কেজি/হেক্টর)

আফ্রিকা	৭৪৯	৭৪৬	৬৪৭	৬২৩
উত্তর আমেরিকা	১৩৪১	১২৭৯	১২১৭	১২৯৬
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৭৩	৯১৮	৮৪৫	৮৭৫
এশিয়া	৭৩৮	৭৬৬	৭৭০	৮১৭
ইউরোপ	৬৬১	৭৮৪	৬৯৪	৭২১
ওসেনিয়া	১৩১৯	২১২৭	১৬৫৪	১৫৩৭
বিশ্ব	৭৫১	৮৩১	৮১৭	৮৭৮

২.৩ বিশ্বের বিভিন্নদেশভিত্তিক মশুর উৎপাদন

দেশ	জমি হাজার/হেক্টর	ফলন কেজি/হেক্টর	মোট উৎপাদন হাজার টন
ভারত	১২০০	৭৩৬	৮৮৩
তুরস্ক	৫৪৮	১০৬৯	৫৮৬
কানাডা	৩৭২	১২৯১	৪৮০
ইরান	২৬৪	৪৯২	১৩০
বাংলাদেশ	২০০	৪১৪	১৬৩
নেপাল	১৫৫	৭৩২	১১৪
সিরিয়া	১৪৫	১০৭৪	১৫৬
চীন	৯০	১১৬৭	১০৫
মিশর	৪	১৬৮৪	৮
যুক্তরাষ্ট্র	৬৪	১৩৭০	৮৮

আজারবাইজান	১	১৩৬০	২
লেবানন	৬	২২১০	১৪
গ্রিস	১	১৫৪৭	১
নিউজিল্যান্ড	১	১৪২৯	১
অস্ট্রেলিয়া	৮২	১০৩৭	৮৫
বিশ্ব	৩৪০৪	৮৭৮	২৯৮৮

৩. উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

(১) মশুর গাছ লম্বায় ছোট, তবে এর অনেক শাখা-প্রশাখা হয়।
(২) গাছের প্রধান মূল কিছুটা সরু।
(৩) শিকড় মাটির ভিতরে ছড়িয়ে থাকে।
(৪) সাধারণত এঁটেল মাটিতে শিকড় অনেক নিচে চলে যায়।
(৫) বীজ গজানোর পর এর বীজপত্র মাটির নিচে থেকে যায়।
(৬) অঙ্কুরোদ্গম মৃৎগত
(৭) মশুর গাছে বীজ বোনার ৫০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে ফুল ফোটে।
(৮) প্রতিটি ডালের আগায় ৩ থেকে ৫টি করে ফুল ফোটে।
(৯) বাংলাদেশে প্রচলিত জাতের মশুরকলাই পরিপক্ব হতে ৯৫ থেকে ১০০ দিন সময় লাগে।

৪. মশুরের জাত শ্রেণিকরণ

মশুর কলাইয়ের অনেক জাত রয়েছে। মশুরকলাই জাতের উৎস ও ফলনশীলতা অনুসারে নিচে একটি শ্রেণীকরণ দেখানো হলো।

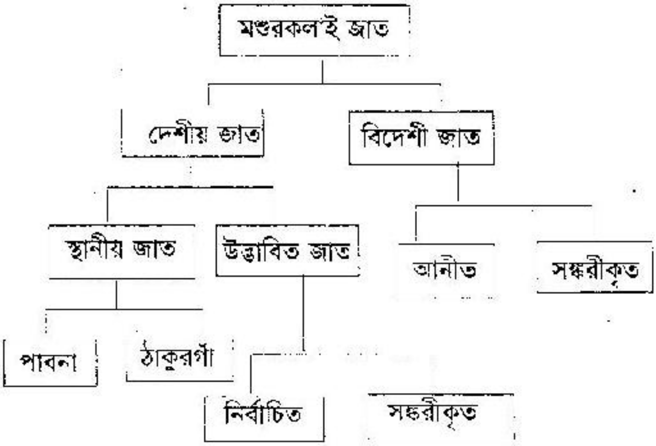

এখানে দেশীয় ও বিদেশী জাতসমূহ বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হলো।

দেশীয় জাত : বাংলাদেশে বেশ কয়েক ধরনের মশুরের জাত আছে। এর মধ্যে মুগডিয়া-১৫ এবং নং ৫৫০১ উল্লেখযোগ্য। সঠিক যত্ন নিতে পারলে এই দুই জাত থেকে প্রতি হেক্টরে ১০০০ কেজি পর্যন্ত ভাল ফলানো যেতে পারে। পাবনা জাতের মশুর স্থানীয়ভাবে বেশ জনপ্রিয় এবং এরও বেশ চাষ হয়ে থাকে।

৫. মশুর জাত শনাক্তকরণ নির্দেশনা

১.	গাছের আকৃতি মধ্যম বড়	বারি মশুর ১, বারি মশুর ২ বারি মশুর ৩, বারি মশুর ৪
২.	গাছের উপরিভাগের ডগা সহজে লতানো নয়	বারি মশুর ১
	উপরিভাগ সামান্য লতানো	বারি মশুর ১
	উপরিভাগ হালকা	বারি মশুর ৩
৩.	গাছের পাতা গাঢ় সবুজ	বারি মশুর ১, বারি মশুর ২
	সবুজ	বারি মশুর ৩
	হালকা সবুজ	বারি মশুর ৪
৪.	গাছে সূক্ষ আকর্ষী আছে	বারি মশুর ১
	সরু আকর্ষী আছে	বারি মশুর ২
	আকর্ষী নাই	বারি মশুর ৩
	আকর্ষী আছে, পাতা বড়	বারি মশুর ৪
৫.	কাণ্ড হালকা সবুজ	বারি মশুর ১, বারি মশুর-২
৬.	কাণ্ডে পিগমেন্ট নেই	বারি মশুর ১
	কাণ্ডে পিগমেন্ট আছে	বারি মশুর ৩
৭.	ফুলের রঙ সাদা	বারি মশুর ১, বারি মশুর-২ বারি মশুর ৩, বারি মশুর-৪
৮.	হাজার বীজের ওজন মধ্যম (১৪-১৭ গ্রাম)	বারি মশুর ১
	ছোট (১১-১৩ গ্রাম)	বারি মশুর ২
	বড় (২২-২৪ গ্রাম)	বারি মশুর ৩
	মধ্যম (১৯-২০ গ্রাম)	বারি মশুর ৪
৯.	দানার বর্ণ ধূসর	বারি মশুর ১, বারি মশুর-২
	ধূসরসহ কালো দাগ	বারি মশুর ৩

৬. মশুরের জাত

ক. বারি মশুর-১ (উৎফলা) : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। এ জাতটি পাবনা এলাকা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯১ সালে আবাদের জন্য জাতটি অনুমোদন লাভ করে

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের আকৃতি মধ্যম।
(২) উপরিভাগের ডগা বেশ সতেজ, লতানো হয় না।
(৩) গাছের পাতা গাঢ় সবুজ, সূক্ষ্ম আকর্ষী আছে।
(৪) কাণ্ড হালকা সবুজ, কোনো পিগমেন্ট নেই।
(৫) ফুলের রঙ সাদা।
(৬) হাজার বীজের ওজন ১৪ গ্রাম থেকে ১৬ গ্রাম।
(৭) বীজে আমিষের পরিমাণ শতকরা ২৮ ভাগ।
(৮) জাতটির জীবনকাল ১০৫ থেকে ১১০ দিন।
(৯) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৭ টন থেকে ১.৮ টন।
(১০) দানার পরিমাণ ৮৯%।
(১১) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৭৮%
(১২) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১১ মিনিট।
(১৩) রান্নার সময় ডালের দ্রবীভবন ৫৪%।
(১৪) পানিশোষণ ২.২ গ্রাম/গ্রাম
(১৫) শর্করার পরিমাণ ৪৮%।

খ. বারি মশুর ২ : সিরিয়া থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে এই সারিটি এনে পরবর্তীকালে বহুস্থানিক পরীক্ষার পর ১৯৯৩ সালে সারা দেশে আবাদের জন্য জাত হিসেবে অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের আকৃতি মধ্যম।
(২) গাছের উপরিভাগ সামান্য লতানো।
(৩) পাতায় আকর্ষী থাকে।
(৪) গাছের পাতা গাঢ় সবুজ।
(৫) কাণ্ড হালকা সবুজ, পিগমেন্ট নেই।
(৬) ফুল সাদা।
(৭) হাজার বীজের ওজন ১১ গ্রাম থেকে ১৩ গ্রাম।
(৮) জাতটি মরিচা ও ঝলসে যাওয়া রোগ সহনশীল।
(৯) জাতটির জীবনকাল ১০৫ থেকে ১১০ দিন।
(১০) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৮ টন থেকে ১.৯ টন।
(১১) দানার পরিমাণ ৮৯%।
(১২) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৭৬%

(১৩) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১৫ মিনিট।

(১৪) ডালের দ্রবীভবন ৫২%।

(১৫) পানিশোষণ ২.২ গ্রাম/গ্রাম।

(১৬) বীজের আমিষের পরিমাণ ২৮%।

(১৭) শর্করার পরিমাণ ৪৬%।

বারি মশুর ২ এর প্রজেনি

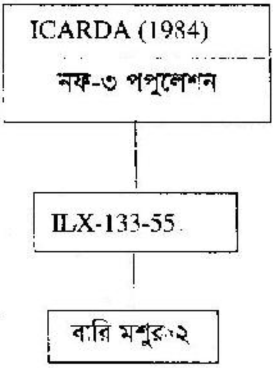

গ. **বারি মশুর ৩** : এ জাতটি ১৯৮৫ সালে সঙ্করায়ণ ও পরবর্তীকালে বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এ জাতটি ১৯৯৬ সালে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) পাতার রঙ সবুজ।

(২) কাণ্ডে পিগমেন্ট আছে।

(৩) ফুল সাদা।

(৪) পত্রফলক ও আকর্ষী নেই।

(৫) বীজের রঙ ধূসর।

(৬) বীজের রঙ ধূসর ছোট ছোট কালো দাগ আছে।

(৭) বীজের আকার স্থানীয় জাত অপেক্ষা বড়।

(৮) মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম রোগ সহনশীল।

(৯) হাজার বীজের ওজন ২২ গ্রাম থেকে ২৪ গ্রাম।

(১০) জীবনকাল ১০০ দিন থেকে ১০৫ দিন।

(১১) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৯ টন থেকে ২.০ টন।

(১২) দানার পরিমাণ ৯০%।

(১৩) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৭৮%।

(১৪) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১১ মিনিট।

(১৫) ডাল দ্রবীভবন ৭৪%।

(১৬) পানিশোষণ ২ গ্রাম/গ্রাম।

(১৭) বীজে আমিষের পরিমাণ ২৫%।

(১৮) শর্করার পরিমাণ ৬০%।

বারি মশুর- ৩ এর প্রোজেনি

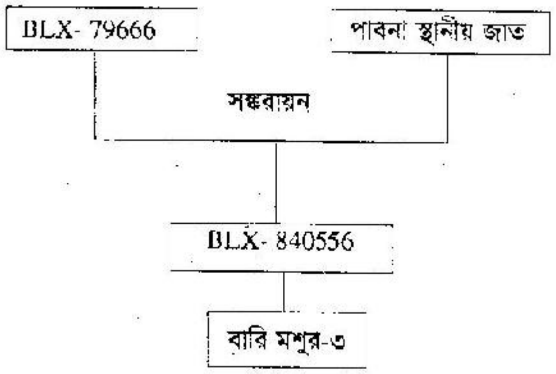

ঘ. বারি মশুর-৪ : এ জাতটি ১৯৮৫ সালে বারিমশুর-১ এবং ইকার্ডা থেকে প্রাপ্ত জাতের সাথে সঙ্করায়ন করে ১৯৮৭ সালে একক গাছ নির্বাচন করা হয়। এই সারিটি (আই এল এক্স ৮৭২৪৭) ১৯৯৬ সালে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের পাতার রঙ হালকা সবুজ।

(২) পত্রফলক আকারে বড়।

(৩) পাতার শীর্ষে আকর্ষী আছে।

(৪) ফুলের রঙ সাদা।

(৫) বীজের আকার স্থানীয় জাত অপেক্ষা বড় ও চ্যাপ্টা ধরনের।

(৬) বীজের রঙ লালচে বাদামি।

(৭) হাজার বীজের ওজন ১৯ থেকে ২০ গ্রাম।

(৮) জীবনকাল ১১০ থেকে ১১৫ দিন।

(৯) এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম রোগ প্রতিরোধী।

(১০) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৯ থেকে ২.০ টন।

(১১) দানার পরিমাণ ৮৮%।

(১২) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৭৮%।

(১৩) রান্নার সময় ১২ মিনিট।

(১৪) পানিতে দ্রবীভবন ৬৭%।

(১৫) পানিশোষণ ১.৯ গ্রাম/গ্রাম।

(১৬) বীজে আমিষের পরিমাণ ২৫.৮%।

(১৭) শর্করার পরিমাণ ৬০%।

বারি মশুর-৪ এর প্রোজেনি

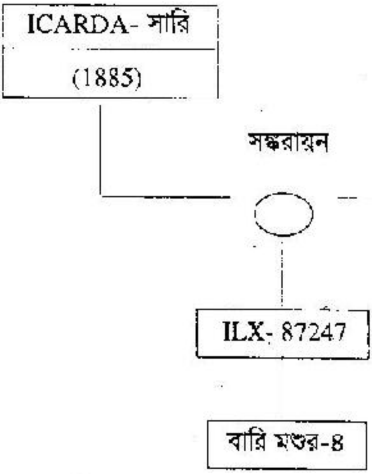

৭. মশুরের সাধারণ উৎপাদন প্রযুক্তি

পরিবেশগত চাহিদা : কিছুটা ঠাণ্ডা আবহাওয়াতে মশুর ডাল ভাল জন্মাতে পারে। এই উপমহাদেশে তাই শীতের সময় মশুরের চষ করা হয়, তবে খুব বেশি ঠাণ্ডা বা গরম আবহাওয়া এই ফসল সহ্য করতে পারে না। মাটিতে অল্প পানি বা কিছুটা শুকনো মাটিতেও মশুরের চাষ করা যেতে পারে।

মশুর সাধারণত উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ভাল জন্মে থাকে। মশুর অঙ্কুরোদ্গমের জন্য সবচেয়ে উত্তম তাপমাত্রা ১৫°-২০° সেলসিয়াস। ভাল ফলনের উত্তম তাপমাত্রা ১৬°-২৮° সেলসিয়াস। এ তাপমাত্রায় অঙ্কুরোদ্গম সবচেয়ে ভাল হয়ে থাকে। তাপমাত্রা যদি এর নিচে নামতে থাকে তাহলে অঙ্কুরোদ্গমের হারও কমতে থাকে। তবে এক জেনোটাইপ হতে অন্য জেনোটাইপে এ তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়। এছাড়াও বীজের আকার ও বয়সের উপরও এ তাপমাত্রা নির্ভর করে। ছোট বীজ বড় বীজ অপেক্ষা তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়। মশুর সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর ফসল। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৭৫০ মিলিমিটার হলে মশুরের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায়।

এই ফসলকে কিছুটা খরাসহিষ্ণু ফসল বলা হয়ে থাকে। তবে মশুর উজ্জ্বল রোদ ও অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্রতা পূর্ণ পরিবেশে ভাল জন্মে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মশুর সহ্য করতে পারে না। মাটিতে পানির পরিমাণ অতিমাত্রায় কমে গেলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

জমি ও মাটি : বেশ কয়েক ধরনের মাটিতে মশুরের চাষ হতে পারে। বেলে মাটি, পলি মাটি ও এঁটেল মাটিতে মশুরের চাষ ভাল হয়। pH ৬.০ থেকে ৭.০ হলে ভাল হয়।

সব ধরনের মাটিতেই মশুরের চাষ করা যেতে পারে। তবে সুনিষ্কাশিত হলে দোআঁশ মাটিতে এই ফসল ভাল জন্মে থাকে। জমিতে যদি পানি জমে না থাকে, তবে কাদামাটিতেও এর চাষ করা যেতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত মাটিতেও এর চাষ করা যেতে পারে।

মশুর চাষ এলাকা : বাংলাদেশে ফরিদপুর, রাজশাহী, পাবনা ও যশোর এলাকায় মশুরের চাষ বেশি হয়ে থাকে। প্রধান প্রধান এলাকা হলো–

ফরিদপুর : শিবচর, জাজিরা, বোয়ালমারী, মাদারীপুর।

রাজশাহী : লালপুর ও গোমস্তাপুর।

পাবনা : আটঘরিয়া, পাবনা, সাথিয়া, উল্লাপাড়া ও সুজানগর।

যশোর : কোতয়ালী, শ্রীপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ এবং মণিরামপুর।

জমি তৈরি : বাংলাদেশে পলি মাটি ও দোআঁশ মাটিতে মশুরের চাষ ভাল হয়। বোনা আমন বা রোপা আমনের পরপরই মশুর বোনা হলে জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না। ধান কাটার ১ থেকে ২ সপ্তাহ আগে জমিতে বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ভালভাবে মশুরের চাষ করতে হলে এবং জমিতে সেচের ব্যবস্থা থাকলে ২ থেকে ৩টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

বীজ বপন : বীজের আকার ও রঙ দেখে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ভাল বীজ বাজারেও কিনতে পাওয়া যেতে পারে। তবে এতে ভেজাল থাকার আশঙ্কা থাকে। মশুরের চাষ অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত করা হয়। রোপা আমন কাটার পর অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেও বীজ লাগানো হয়। তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের পর মশুরের বীজ লাগানো ঠিক নয়। তাতে ফলন অনেক কমে যায়। চর এলাকায় বন্যার পানি চলে গেলে পলিমাটিতে মশুরের চাষ করা যায়।

বীজের হার : মশুর একক ফসল হিসেবে বোনা হলে প্রতি হেক্টরে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি বীজ লাগে। বেশি ফলনের জন্য অনেক সময় বীজ কিছুটা বেশি দিতে হয়। যেসব জাত স্বল্পমেয়াদী বা দেরিতে বোনা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ ৪০ কেজি পর্যন্ত প্রয়োজন হয়।

বপন পদ্ধতি : বাংলাদেশে মশুর বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। ছিটানোর পর হালকা চাষ দিয়ে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। ধানের পর মশুর বোনা হলে ধান কাটার দুই সপ্তাহ আগে ধানের ক্ষেতে মশুর বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

৭. বাকৃবি-জিয়া সার-বীজ ছিটানো যন্ত্র

ভূমিকা : কৃষি ক্ষেত্রে সার ও বীজ ছিটানোর প্রক্রিয়াটি এখনো বাংলাদেশে পুরোপুরি প্রাচীন পদ্ধতিতে হাতে ছিটানো হচ্ছে। এ কাজটির যান্ত্রিক রূপ অতীতে প্রয়োজন না হলেও বর্তমানে এর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। হাতে ছিটানো বীজ বা সার কোনো অবস্থাতেই সমভাবে জমিতে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া এ কাজটি মোটামুটি ভালভাবে করতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। অভিজ্ঞ কৃষক কর্তৃক বীজ ছিটানো হলেও পুরোপুরি সমভাবে জমিতে প্রয়োগ সম্ভব হয় না বিধায় বীজের যেমন অপচয় হয় তেমনি কোথাও ঘন কোথাও পাতলাভাবে গাছ জন্মায়। অনুরূপভাবে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, কোনো গাছের গোড়ায় বেশি

সার পড়ছে কোনো গাছের গোড়ায় যৎসামান্য সার পড়ছে। ফলে সারের অপচয় ছাড়াও একই জমিতে উৎপাদনশীলতার তারতম্য দেখা দেয়। হাতে ছিটানোর পদ্ধতিতে একর প্রতি জমিতে সার বা বীজ ছিটানোর সময় লাগে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিষয়টি কষ্টকরও বটে। এই সমস্যা সমাধান কল্পে উক্ত প্রক্রিয়াটির দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. এ.টি.এম. জিয়াউদ্দিন কর্তৃক নব উদ্ভাবিত 'বাকৃবি জিয়া সার বীজ ছিটানো যন্ত্রটির ব্যবহার ২০০০ সালের নভেম্বর মাস থেকে শুরু হয়েছে।

উদ্ভাবনের ইতিহাস : বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এ.টি.এম জিয়াউদ্দিন ১৯৯১ সালে সর্বপ্রথম যন্ত্রটির উদ্ভাবনের তত্ত্ব ও ডিজাইন নিয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি বস্তুর উপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও কাইনামেটিক্স-এর তত্ত্ব ব্যবহার করে যন্ত্রটির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন সফলভাবে সুসম্পন্ন করেন। তার উদ্ভাবিত ডিজাইন তত্ত্বটির বাস্তব রূপ দান করেন তারই প্রিয় ছাত্র তৎকালীন কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের ছাত্র জনাব পরিতোষ রায়। কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের সহায়তায় যন্ত্রটির প্রথম সংস্করণ বাস্তবরূপ লাভ করে ১৯৯২ সালে। উক্ত সাফল্য তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে যন্ত্রটিতে কোনো মিটারিং ইউনিট না থাকায় এর বাণিজ্যিক ব্যবহার করা তখন সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে যন্ত্রটির অধিকতর উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। তারপর কয়েকবার পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও যন্ত্রটির উন্নয়নমূলক ক্ষুদ্র প্রকল্প প্রস্তাব বারবার বিফল হয়। অবশেষে দীর্ঘ আট বছর পর ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস) উক্ত যন্ত্রটির উপর গবেষণা প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। প্রফেসর ড. এ.টি.এম জিয়াউদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এবং সিনিয়র মেকানিক মোঃ আব্দুল আজিজের একান্ত সক্রিয়তায় যন্ত্রটি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। যন্ত্রটির গবেষণাগার ও মাঠ পর্যায়ে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফল খুবই সম্ভাবনাময়। সংশ্লিষ্ট সকল মহলই বাংলাদেশে ও অনুরূপ উন্নয়নশীল দেশে যন্ত্রটির উৎপাদন ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের খুবই উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন।

যন্ত্রের বিবরণ : প্রায় ৬ কেজি নিজস্ব ওজনবিশিষ্ট লোহার ফ্রেমের উপর স্থাপিত একটি রোটর যা চেইন ও স্প্রকেটের সাহায্যে ঘুরানো যায়– একটি সার বা বীজের ধারক ও একটি প্লাস্টিকের প্লাটফর্ম নিয়ে যন্ত্রটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের ওয়ার্কশপে। যন্ত্রটির উপরে একটি সার বা বীজ রাখার ধারক রয়েছে সেখান হতে একটি মিটারিং ইউনিট-এর ভিতর দিয়ে পরিমাণমতো সার বা বীজ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলে আনভূমিকভাবে স্থাপিত একটি গোলাকার প্লাস্টিক প্লাটফর্মের উপর পতিত হয়। সার বা বীজ উক্ত প্লাটফর্মের উপর পতিত হওয়া মাত্রই একটি ঘূর্ণায়মান লোহা দণ্ডের আঘাতে তা অত্যন্ত সমভাবে প্রায় ৬ মিটার চওড়া হয়ে জমিতে পতিত হয়। চালক যন্ত্রটিতে ঘূর্ণায়মান লোহা দণ্ডটিতে শক্তি সঞ্চারিত করে থাকে। যন্ত্রটি একজন কৃষক পিঠে বহন করে জমিতে প্রয়োজন মতো সার বা বীজ প্রয়োগ করতে পারে অতি দক্ষতার সাথে এবং অত্যন্ত সমভাবে। অনেক ধরনের বীজ যেমন– গম, ধান, ডালবীজ, সরিষা, কলাই, ভুট্টা ইত্যাদি স্বল্প সময়ে বপন করা যায়। তাছাড়াও সার, যেমন– ইউরিয়া, টিএসপি এম.পি ইত্যাদি জমিতে পরিমাণমতো ছিটানোর জন্য যন্ত্রটি অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। হাতে সার বা বীজ ছিটানোর সমতা যেখানে মাত্র ৪০% হতে ৫০% সেখানে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রমাণিত যে যন্ত্রটি স্বাভাবিক ঘূর্ণনে (রোটরের ৭০০ আর.পি.এম) মিহি ইউরিয়া,

টিএসপি, গম, ধান, মশুর ডাল ও কলাই যথাক্রমে ৯৭.৭৫%, ৯৩.৫০%, ৮৮.৭৫%, ৯৫.২৪%, ৯৭.২১% ও ৯৬.২৫% সমতায় ছিটাতে পারে। ফলে এটি কৃষিক্ষেত্রে খুবই সন্তোষজনকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) এটি সার বা বীজ (যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, গম ধান, মশুর ডাল, সরিষা, কলাই, ভুট্টা ইত্যাদি) সুষমভাবে ছিটাতে পারে।

(২) এটি ঘন্টায় সর্বোচ্চ প্রায় ২.০ হেক্টর জমিতে সার বা বীজ ছিটাতে পারে (হাতে ছিটানোর হার ঘন্টায় মাত্র ০.৩০ হেক্টর)।

(৩) ছিটানোর সুসমতা সার ও বীজের আকারভেদে ৮৮% হতে ৯৮%।

(৪) যন্ত্রটিতে একটি সূক্ষ্ম পরিমাপক থাকায় এটি পরিমাণমতো সার বা বীজ সহজেই ছিটাতে পারে।

(৫) যন্ত্রটি তৈরি বাবদ মোট খরচ খুবই কম।

(৬) সার বা বীজ ছিটাতে সময় কম লাগে এবং অপচয় রোধ হয় বিধায় সার্বিকভাবে বপন খরচ খুবই কম।

(৭) যন্ত্রটি চালাতে কোনো তেল বা বিদ্যুতের প্রয়োজন নেই এবং হাতে রাসায়নিক সার স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় না। ফলে কৃষকের শরীর বা পরিবেশের উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে না।

(৮) যন্ত্রটি থানা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে উৎপাদন বা বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্ভব বিধায় স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

(৯) মাঠ পর্যায়ে কৃষক কর্তৃক যন্ত্রটি নিখুঁত এবং টেকসই বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ব্যবহার বিধি

(১) মিটারিং ইউনিটের কাটাটি শূন্য অবস্থানে স্থাপন করুন যাতে সার বা বীজ রাখার ধারকের তলাটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে

(২) সার বা বীজ রাখার ধারকটিতে পরিমাণ মতো সার বা বীজ ভরে নিতে হবে।

(৩) মেশিনটি কাঁধে নিয়ে বেল্ট দুটিকে বুকের উপর আড়াআড়িভাবে বেঁধে নিতে হবে।

(৪) জমির একপাশ দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে (ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার) চলার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে হাতলটি ঘোরাতে হবে।

(৫) মিটারিং ইউনিটের কাঁটাটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করুন।

(৬) জমির একপাশ দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে (ঘণ্টায় ৪ কিলোমিটার) চলার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে হাতলটি ঘোরাতে থাকুন এবং ছিটানোর কাজটি সুসম্পন্ন করুন।

(৭) প্রয়োজনে শেষে যন্ত্রটি পরিষ্কার করে এর ঘূর্ণায়মান অংশগুলোতে তেল বা মবিল দিয়ে শুষ্ক স্থানে রেখে দিন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত সার বীজ ছিটানো যন্ত্র রঙিন চিত্রাংকে দেখানো হয়েছে। বীজের আকার আকৃতি অনুসারে যন্ত্রাংশ অভিযোজন করতে হয়।

সরিষা, তিল ও ছোলার সাথে সাথে মশুর চাষ করতে হলে নির্দিষ্ট অনুপাতে বীজ মিশিয়ে তারপর ছিটিয়ে বুনতে হয়। গমের সাথে বোনা হলে প্রথমে গমের বীজ সারি করে বোনা হয়, তারপর মশুর বীজ ছিটানো হয়। আখের জমিতে বোনা হলে আখের দুই সারির মাঝে এক সারিতে অথবা ছিটিয়ে মশুর বীজ বুনতে হয়।

সারির দূরত্ব	৩০ সেন্টিমিটার
গাছের দূরত্ব	১০ সেন্টিমিটার
বীজ বপন গভীরতা	১.৫-২.৫ সেন্টিমিটার
বীজ বপন যন্ত্র	বারি সিড ড্রিল
প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা	৩০০-৪০০টি

৮. সার প্রয়োগ

মশুরে প্রয়োগযোগ্য বিএআরসি অনুমোদিত সার সুপারিশ নিচে ছকের আকারে উল্লেখ করা হলো।

সকল জাতের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলন লক্ষমাত্রা : ১.৫ টন/হেক্টর

জমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	Mo
উত্তম	০-৬	০-৯	০-১১	০-৬	-	-
মধ্যম	৭-১২	১০-১৮	১২-২২	৭-১২	০-.১	০-.৩
কম	১৩-১৮	১৯-২৭	২৩-৩৩	১৩-১৮	১.১-২	.৪-.৬
খুব কম	১৯-২৪	২৮-৩৬	৩৪-৪৪	১৯-২৪	২.১-৩	.৭-১

মধ্যম ফলন লক্ষমাত্রা : ১.২ টন/হেক্টর

জমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	Mo
উত্তম	০-৪	০-৬	০-৬	০-৩	-	-
মধ্যম	৪-৮	৭-১২	৭-১২	৪-৬	০-.৬	০-.৩
কম	৯-১২	১৩-১৮	১৩-১৮	৭-৯	.৭-১.২	.৪-.৬
খুব কম	১৩-১৬	১৯-২৪	১৯-২৪	১০-১২	১.৩-২	.৭-১

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। প্রয়োজনবোধে দস্তা ও বোরন সার স্প্রে করা যায়।

৯. পানি সেচ ও নিকাশ

বাংলাদেশে মাঝারি নিচু জমিতে মশুরের চাষ হয়ে থাকে। রবি মৌসুমে বৃষ্টি হলে মাটিতে বেশ কিছুটা পানি জমা থাকে। এই পানিই মশুর চাষের জন্য যথেষ্ট। খরার সময় বা শুষ্ক বালি মাটিতে ১ থেকে ২ বার সেচ দিলে বেশ ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

মাটির আর্দ্রতা চাহিদা-	বারি মশুর-৩ - ২০-২৫%
	অন্যান্য জাত - ১৫-২০%

পরিচর্যা : মশুর নরম ধরনের গাছ। জমিতে আগাছা থাকলে মশুরের শাখা-প্রশাখা বাড়তে পারে না। এজন্য জমি নিড়ানো দরকার।

১০. ফসল পর্যায়

বাংলাদেশে মশুর প্রধানত একক ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। তবে গম, যব, তিল, ছোলা, সরিষা, মটর, আখ ইত্যাদি ফসলের সাথেও বোনা হয়। ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া, যশোর এবং টাংগাইল জেলায় অন্যান্য ফসলের সাথে মিশিয়ে মশুরের বেশ চাষ হয়। কিন্তু রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, খুলনা, কুমিল্লা ও সিলেট জেলায় একক ফসল হিসেবে মশুরের চাষ হয়ে থাকে। কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার চিনি কারখানার আশেপাশের জায়গায় আখের সাথে মশুর চাষ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আউশ, আমন, পাট এবং অন্যান্য খরিফ ফসলের পর রবি ফসল হিসেবে মশুরের চাষ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে রবি ফসল হিসেবে একক মশুর চাষের প্রচলিত ফসল পর্যায় নিচে উল্লেখ করা হলো–

আউশ ধান	–	*মশুর*
পাট	–	*মশুর*
রোপা আমন	–	*মশুর*
রোপা আমন	–	*মশুর*

সেচের ব্যবস্থা থাকলে

রোপা আউশ	–	*রোপা আমন*	–	*মশুর*
পাট	–	*রোপা আমন*	–	*মশুর*

১১. আগাছা দমন

মশুরের আশানুরূপ ফলন পেতে হলে ফসল বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাতেই আগাছা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আগাছা দমন না করলে মশুরের ফলন ৬০% পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সাধারণত আগাছার বৃদ্ধি ফসলের বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত হয়। আগাছার বৃদ্ধির অব্যাহত থাকলে মশুরের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং ফলনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। মশুর যদি ছিটানো পদ্ধতিতে বপন করা হয়, তাহলে আগাছা দমন বেশ কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে, ফলে ফলন ও তুলনামূলকভাবে কম হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যদি অঙ্কুরোদ্গমের পর থেকে ৫ সপ্তাহ মশুরের জমিকে আগাছা মুক্ত রাখা যায়, তাহলে ফলন কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে অঙ্কুরোদ্গমের ২০-৩০ দিন পর অবশ্যই এক বার আগাছা দমন করা বাঞ্ছনীয়।

১২. ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ

ফল ফেটে যাওয়ার আগেই ফসল তোলা উচিত। শেষ ফুল ফোটার ১৫ থেকে ২০ দিন পরেই ফসল তোলা হয়। তখন ফলের রঙ হলদে-বাদামি হয়। গাছগুলো কাটার পর তা রোদে শুকানোর জন্য ৬ থেকে ৭ দিন মাটিতেই ফেলে রাখতে হয়। তারপর ফসল মাড়িয়ে রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হয়।

মশুর গুদামে রাখার পর ব্রুকিড পোকা বেশ ক্ষতি করে থাকে। এই পোকার হাত থেকে মশুরকে রক্ষার জন্য ফসটক্সিন বড়ি ব্যবহার করতে হয়।

১৩. **ফলন :** বর্তমানে বাংলাদেশে মশুরের ফলন প্রতি হেক্টরে ৬০০ থেকে ৭০০ কেজি।

বর্তমানে যে জাতগুলোর চাষ হচ্ছে তাতে উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়ানো সম্ভব। প্রতি হেক্টরে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

(১) উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ করা।
(২) ভালভাবে জমি তৈরি করা ও পরিচর্যা করা।
(৩) সঠিক সময়ে বীজ বপন করা।
(৪) সুষম হারে সার ব্যবহার করা।
(৫) পোকা ও রোগ দমনে যত্নশীল হওয়া।

কাঙ্ক্ষিত ফলন প্রাপ্তিতে নিম্নলিখিত বিষয় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ফসল কর্তন : সঠিক সময়ে ফসল কর্তন করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। বিশেষত ডালজাতীয় ফসল বিলম্বে কর্তন করলে দানা ঝরে যায়। নিচে মশুরকলাই কর্তন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

(১) পরিপক্ক ফসল জমিতে অধিক সময় না রেখে সময়মতো কর্তন করে সরাসরি মাড়াই স্থানে নেয়া উচিত।
(২) কর্তনের পর পরই ফসল ব্যাগে অথবা দানা পড়ে না যায় এরূপ পাত্রের মাধ্যমে মাঠ থেকে সংগ্রহ করে মাড়াই স্থানে নেয়া উচিত।
(৩) পরিপক্ক ফসল যাতে ইঁদুর বা পাখি নষ্ট না করে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার।

মাড়াই ও শুকানো স্থান : মাড়াই ও শুকানোর স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাড়াই ও শুকানোর জন্য পলিথিন শিট, পাকা মেঝে বা মাটির উপর গোবরের প্রলেপ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাড়াই স্থানের পোকামাকড় মেরে ফেলতে হয়। ময়লা ও খড়-কুটা ইঁদুরের আক্রমণে সহায়তা করে– এজন্য এগুলো থেকে পরিষ্কার রাখা বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন আবর্জনা ও ময়লা দানার সাথে মিশে দানাকে খাওয়ার অনুপযোগী করে তোলে; যার ফলে ফসলের বাজার দরও কমে যায়।

মাড়াই : মশুর ডালের ফল লাঠির আঘাতে মাড়ানোই উত্তম। তবে অধিক আঘাত করা অথবা মাড়ানোর পূর্বে ফসল অধিক শুকানো উচিত নয়। হাতের তালুতে ফসলের ফল অর্থাৎ পড (pod) নিয়ে ঘষা দিলে মচ মচ শব্দ হলেই বুঝতে হয় যে মাড়াইয়ের সময় হয়েছে। অধিক

পরিপক্ব হলে দানা ঝরে যায়। শুঁটি বা পড বাদামি বা কালো রঙ হলে বুঝতে হয় পরিপক্ব হয়েছে। এ অবস্থায় লাঠি দ্বারা খুব সাবধানে পিটিয়ে মাড়াই করতে হয়। এরপর নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

১৪. গুদামজাতকরণ : গুদামজাতকরণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন–

(১) মাড়াইকৃত বীজ পরিষ্কার করে সূর্যের তাপে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হয়।

(২) শুকানোর সময় হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ক্ষতি এড়াতে পলিথিন শিট ব্যবহার করা উত্তম।

(৩) আর্দ্র বীজ একসাথে অধিক পরিমাণ জড়ো করে না রেখে ছড়িয়ে রাখা উচিত।

(৪) বৃষ্টির পর বীজ পুনরায় শুকিয়ে নিতে হয়।

দানা পরিষ্কারকরণ : দানা পরিষ্কারকরণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া উচিত–

(১) দানা সবসময় পরিষ্কার স্থানে শুকানো দরকার।

(২) প্রবল বাতাসে দানা ঝাড়াই করা উচিত নয়।

(৩) ঝাড়াই কাজে বাঁশের কুলা ব্যবহার করাই উত্তম।

(৪) সঠিক মাপের চালুনি দিয়ে দানা চেলে নিতে হয়।

(৫) স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ঝাড়াইয়ের সময় মুখে পাতলা কাপড় বেঁধে নেয়া উত্তম।

গুদামের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ : আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ–

(১) বীজ শুকিয়ে ৮ থেকে ৯% আর্দ্রতায় গুদামজাত করতে হয়।

(২) বীজ দাঁতের নিচে দিয়ে চিবাতে শক্ত মনে হলে বুঝতে হয় যে বীজের আর্দ্রতা সঠিক পরিমাণে রয়েছে।

গুদামজাতকরণের পাত্র : বায়ু নিরোধক পাত্রে শুকনো বীজ গুদামজাত করা উচিত। মাটির পাত্র, ধাতব টিন বা ড্রাম ব্যবহার করা উত্তম। আর্দ্রতা বেড়ে ও পোকার আক্রমণে যাতে বীজের ক্ষতি না হয় সেজন্য পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ বা কাঠের বাক্সও ব্যবহার করা যায়। তবে কোনোভাবেই যাতে পোকার আক্রমণ না ঘটে সে দিকে নজর রাখতে হয়।

১৫. সংরক্ষিত ডালের পোকা ও ছত্রাক দমন

পালস বিটল বা শুঁসড়ি পোকা গুদামজাত ডাল ফসলের সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা। কতকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে পোকার আক্রমণ কমানো বা বন্ধ করা যায়। পদক্ষেপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) বীজ ৮%-৯% আর্দ্রতায় বায়ু নিরোধ পাত্রে গুদামজাত করতে হয়।

(২) গুদামজাকরণের পূর্বে ভালভাবে বীজ পরীক্ষা করতে হয়। ১০ গ্রাম ওজনের তিনটি নমুনা বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে দেখতে হয় পোকা ও পোকাজনিত ক্ষতির কোনো লক্ষণ আছে কি-না।

(৩) বীজের নমুনায় দুটি পূর্ণাঙ্গ পোকা বা পোকার ৪টি ডিম পাওয়া গেলে যথাশীঘ্র দমন ব্যবস্থা নিতে হয়।

(৪) কোনো পোকা না পাওয়া গেলে বীজ মাটির পাত্র, ধাতব পাত্র, কাঠের বাক্স, প্লাস্টিক বাস্কেট ইত্যাদি পাত্রে মজুদ করতে হয়।

(৫) প্লাস্টিক ব্যাগে মজুদ করার পূর্বে ০.১ মিলিলিটার ডেসিস ২.৫ মিলিলিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যাগের বাইরের দিক শোধন করে নিতে হয়।

(৬) গুদামে প্রতি কেজি শস্যের জন্য ৮ মিলিলিটার নিম তেল শুকনা বালিসহ পাত্রের উপরের অংশে ঢেলে পাত্র বা ব্যাগের মুখ বন্ধ করে দিতে হয়।

(৭) অনুমোদিত মাত্রায় পিরিমিফস মিথাইল (যেমন– এক্টেলিক) ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

(৮) গুদাম ও পাত্র ব্যবহারের পূর্বে উত্তমরূপে পরিষ্কার করে ব্যবহার উপযোগী করে নিতে হয়।

গুদামে ছত্রাক দমন : মশুর ছত্রাককর্তৃক সহজেই আক্রান্ত হতে পারে। অধিক গরম ও আর্দ্রতা ছত্রাকের বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। ছত্রাক আক্রান্ত বীজ কম স্বাদ, কম পুষ্টি ও বিষাক্ত হয়ে যায় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ছত্রাক দমনের জন্যে নিচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) বীজ গুদামজাতের পূর্বে ভালভাবে ঝেড়ে ভাঙা দানা ও আবর্জনামুক্ত করতে হয়।

(২) অনুমোদিত আর্দ্রতায় (৮-৯%) বায়ু নিরোধক পাত্রে গুদামজাত করতে হয়।

১৬. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

মশুর 'রাইজোবিয়াম' নামের ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া শিকড়ে নাইট্রোজেন নডিউল তৈরি করে। বাংলাদেশে এক হেক্টরে মশুর জমিতে ১১০ কেজি থেকে ১১৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে সংবন্ধিত হতে পারে।

পোকা দমন : পোকা মশুরের চারা, পাতা, গাছ, ফুল এমনকি মজুদ বীজেরও ক্ষতি করে থাকে। পোকার কীড়া দ্বারা শিকড় এবং নডিউলেরও ক্ষতি হয়ে থাকে।

১৭. বারি মশুর উৎপাদন প্রযুক্তি (সারমর্ম)

মৃত্তিকা : বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি মশুর চাষের উপযোগী।

জমি তৈরি : ৩ থেকে ৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। তবে ভালভাবে ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করা প্রয়োজন।

বীজ হার : ৪০ থেকে ৪৫ কেজি/ হেক্টর (বারি মশুর ৩)।

অন্যান্য জাত : ৩৫ থেকে ৪০ কেজি/হেক্টর।

সারি থেকে সারির দূরত্ব : ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার।

বীজ বপন গভীরতা : ৩ থেকে ৪সেন্টিমিটার।

প্রতি মিটারে গাছের সংখ্যা : ৩০০ থেকে ৩৫০ টি।

পরিচর্যা : বীজ বপনের ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করা প্রয়োজন।

বপন পদ্ধতি : ছিটিয়ে অথবা সারি করে বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়।

বপন সময় : অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ।

সার প্রয়োগ : নিম্নলিখিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন–

ইউরিয়া : ৪০ থেকে ৪৫ কেজি/হেক্টর।

টিএসপি : ৮০ থেকে ৯০ কেজি/হেক্টর।

এমপি : ৩০ থেকে ৪০ কেজি/হেক্টর।

অপ্রচলিত এলাকায় আবাদের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৯০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : বপনের ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে নিড়ানি দ্বারা একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হয়।

১৮. মশুরের পোকা দমন

বাংলাদেশে মশুর ফসলের ক্ষতিকারক সর্বমোট ৭টি প্রজাতির পোকা শনাক্ত করা হয়েছে। মশুর আক্রমণকারী পোকাগুলো হচ্ছে :

(১) জাবপোকা *(Aphis craceivora)*

(২) ফল ছেদক পোকা *(Helicoverpa armigera)*

(৩) থ্রিপস *(Megaluro-thrips distalis)*

(৪) পাতার উইভিল *(Episomus lacerta)*

(৫) সবুজ গান্ধী পোকা *(Nezara viridula)*

(৬) কাটুই পোকা *(Agrotis ypsilon)* এবং

(৭) ব্রুকিড বা শুঁসড়ি পোকা *(Callosobruchus chinensis, C. maculatus)* ।

এর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে ৩টি পোকা এবং গুদামজাত মশুরের ১টি পোকা মুখ্য অনিষ্টকারী পোকা। নিচে মুখ্য অনিষ্টকারী পোকাগুলোর বর্ণনা, জীবন বৃত্তান্ত ও দমন ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো।

ক. জাবপোকা : মশুরের জাবপোকা সাধারণত কালো রঙের হয়ে থাকে। এ পোকার দেহ নরম। ডিম্বাকৃতির এ পোকার দেহ লম্বায় ১.৫ থেকে ২ মিলিমিটার। এগুলোর দেহ থেকে মিষ্টি রস নিঃসরণ হয় বলে জাবপোকা আক্রান্ত গাছে পিঁপড়ার উপস্থিতি দেখা যায়।

ক্ষতির ধরন : পূর্ণবয়স্ক পোকা ও নিম্ফ উভয়ই মশুরের পাতা, কাণ্ড, পুষ্পমঞ্জরি ও বাড়ন্ত ডগা থেকে রস শুষে খায়। অতিমাত্রায় আক্রমণের কারণে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। আক্রান্ত পুষ্প থেকে সাধারণত শুঁটি বের হয় না। জাবপোকার আক্রমণের ফলে মশুরের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

এ পোকার জীবনকাল ৮-১০ দিন। ডানাযুক্ত পোকা এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে গিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। ফলে অতি অল্প সময়ে এগুলো বিরাট এলাকায় মশুরের অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে।

জাবপোকা অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি থেকে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশি দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এগুলো শিম, বাদাম, মটরশুঁটি ও ক্রুসিফেরাসজাতীয় (cruciferous) গাছের উপর বেঁচে থাকে

নিয়ন্ত্রণ : ডানাযুক্ত জাবপোকা হলুদ প্যান ফাঁদ ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। পানির সাথে সাবানের গুঁড়া মিশিয়ে হলুদ প্যানে রেখে ফাঁদ তৈরি করে তা আক্রান্ত মাঠে রেখে দিলে ডানাযুক্ত পোকাগুলো চলাফেরার সময় উক্ত ফাঁদে ধরা পড়ে। মেলাথিয়ন, রগর, রক্সিয়ন, পারফেকথিয়ন অথবা মেটাসিস্টক্স নামক কীটনাশকগুলোর যে কোনো একটি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করে জাবপোকা দমন করা যায়।

খ. ফল ছেদক মাজরা : পূর্ণবয়স্ক মথ মাঝারি আকৃতির এবং ডানার বিস্তৃতি ৩০-৪৪ মিলিমিটার। এ পোকার গায়ের রঙ গাঢ় বাদামি। সম্মুখের পাখনা দুটির রঙ সবুজ থেকে হালকা বাদামি এবং পাখনার উপর গাঢ় বাদামি রঙের গোলাকার দাগ দেখে এ পোকাকে সহজে শনাক্ত করা যায়।

বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর মশুর আবাদী অন্যান্য দেশে মশুরের ফল ছেদক পোকা ফসলের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এটি একটি বহুভূক পোকা। মশুর ছাড়া অন্যান্য ডাল ফসলও এগুলো আক্রমণ করে থাকে।

ক্ষতির ধরন : ফল ছেদক পোকার শূককীট প্রথমে পাতার সবুজ অংশ তারপর কুঁড়ি, ফুল এবং শুঁটি আক্রমণ করে থাকে। শূককীট শুঁটি ছিদ্র করে কুরে কুরে বীজ খায়।

স্ত্রী মথ মশুর গাছের পাতার কিনারার, ফুলের কুঁড়ি ও শুঁটির উপর ৫০০-৩০০০টি হলুদ বা সাদা রঙের ডিম পাড়ে। ডিম ২-৪ দিনে ফুটে শূককীট বেরিয়ে আসে। এরা কচি পাতা, ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও শুঁটি খেয়ে ফেলে। হলুদ, গোলাপি, বাদামি বা কালো রঙের শূককীটগুলো লম্বায় ৪০ মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মূককীট ১৫-২৪ দিনে মূককীটে পরিণত হয় এবং গাছের গোড়ায় বা মাটিতে অবস্থান করে। পরবর্তীকালে শূককীট থেকে পূর্ণ-বয়স্ক মথ বেরিয়ে আসে। এদের জীবনকাল অতিবাহিত করতে সর্বোচ্চ ২৮ দিন সময় লাগে।

নিয়ন্ত্রণ : প্রতি গাছে দুটি বা ততোধিক শূককীট দেখা দিলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। সিমবুশ ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার অথবা নুভাক্রন ৪০ ডব্লিউ এস সি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার পরিমাণে মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

গ. শুসড়ি পোকা : শুসড়ি পোকা দেখতে গোলাকার এবং গাঢ় বাদামি রঙের। সম্মুখের দিকটা ক্রমশ সরু এবং মাথায় সিরেট বা করাতের মতো দুটি শুঁড় আছে। পূর্ণবয়স্ক শূককীট দেখতে ক্রিম-সাদা রঙের এবং লম্বায় ৬-৭ মিলিমিটার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে গুদামজাতকৃত ডাল শস্যে শুসড়ি পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য আমেরিকাতেও এ পোকার উপদ্রব দেখা যায়।

ক্ষতির ধরন : শুসড়ি পোকার একটি প্রজাতি মাঠে ও গুদামে ডাল শস্যকে আক্রমণ করতে পারে এবং অন্যটি শুধু গুদামে আক্রমণ করে থাকে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা শস্য পরিপক্ব হওয়ার সময় শুঁটির উপর ডিম পারে। ডিম ফুটে শূককীট বের হয় এবং শুঁটি ছিদ্র করে

ভেতরে ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে। শুঁটির ভেতরেই এগুলো মূককীটে পরিণত হয় এবং অবশেষে পূর্ণবয়স্ক পোকা বের হয়ে আসে। গুদামে অন্য প্রজাতির স্ত্রী পোকা প্রতিটি বীজে দুই বা ততোধিক ডিম পাড়ে যা ফুটে পরিবর্তিত শূককীট বের হয় এবং বীজ ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সব বীজ পাউডারে পরিণত হয়।

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীপোকা গুদামের বীজের উপর অথবা শস্য পরিপক্ব হওয়ার সময় শুঁটির উপর ডিম পাড়ে। স্ত্রী পোকা একবার ৩৪-১১৩ টি গোলাকৃতির ছোট ছোট ডিম দিয়ে থাকে। ডিমগুলো ৪-৬ দিনে ফুটে শূককীট বের হয় এবং মশুর বীজ ছিদ্র করে খায়। বীজের ভেতরেই ১০-৩৮ দিনের মধ্যে এগুলো মূককীটে পরিণত হয়। মূককীট থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হতে এগুলো ৪-২৮ দিন সময় লাগে। গুদামে ডালজাতীয় শস্যে এ পোকা সারা বছরই আক্রমণ করে থাকে। তবে শীতকালের তুলনায় বর্ষাকালে এগুলোর প্রকোপ বেশি হয়ে থাকে। মশুর ছাড়াও এ পোকা ছোলা, খেশারি, মুগডাল, মাশকলাই, অড়হর, মটর, ফেলন, শিম ইত্যাদি ডালজাতীয় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : মাঠে শুঁসড়ি পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি, সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ফলিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার কীটনাশক মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বীজ ভালভাবে শুকিয়ে ঠাণ্ডা অবস্থায় বায়ু-নিরোধক পাত্রে রাখলে গুদামজাত পোকার আক্রমণ কম হয়। বীজের পরিমাণ কম হলে প্রতি কেজি বীজে ৫ মিলিলিটার নিম তেল মিশিয়ে গুদামজাত করা যেতে পারে। বেশি পরিমাণ বীজ গুদামজাত করতে হলে প্রতি টন বীজের জন্যে ৩টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

১৯. মশুরের রোগ দমন

ক. মশুরের গোড়াপঁচা রোগ : গাছ আক্রান্ত হলে পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। মাটি ভেজা থাকলে গাছের গোড়ায় সরিষার দানার মতো স্ক্লেরোশিয়াম দেখা যায়। ভেজা স্যাঁতসেতে মাটি রোগ বিস্তারে সহায়ক।

দমন পদ্ধতি

(১) ফসলের পরিত্যাক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

(২) অধিক পরিমাণ পচা জৈব সার ব্যবহার করতে হয়।

(৩) শস্য পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

(৪) ভিটাভ্যাক্স-২০০ বা বাইটান ১০ ডি এস ০.২৫% দ্বারা (০.২৫%) বীজ শোধন করতে হয়।

খ. মশুরের মরিচা রোগ : গাছে মরিচা রঙের গুটি দেখা যায়। পরবর্তীকালে তা গাঢ় বাদামি ও কালো রঙ ধারণ করে। কাণ্ডেও এ রকম লক্ষণ দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগের প্রকোপ বেশি হয়।

দমন পদ্ধতি

(১) ফসলের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করে ফেলতে হয়।

(২) রোগ প্রতিরোধী জাত বারি মশুর ২, ৩ ও ৪ ব্যবহার করতে হয়।

(৩) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

(৪) টিল্ট-২৫০ ইসি (০.০৪%) ১২ থেকে ১৫ দিন পর পর তিন বার স্প্রে করা প্রয়োজন।

গ. **স্টেমফাইলাম ব্লাইট রোগ ;** আক্রান্ত গাছের পাতায় সাদা সাদা ছত্রাক জালিকা দেখা যায়। দূর থেকে আক্রান্ত ক্ষেত আগুনে ঝলসানো মনে হয়। আক্রমণের শেষ পর্যায়ে গাছ বাদামি থেকে কালো রঙ ধারণ করে ও নুইয়েপড়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

বীজ, বিকল্প, পোশাক, বায়ু প্রভৃতির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

দমন পদ্ধতি

(১) ফসলের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করে ফেলতে হয়।

(২) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।

(৩) আক্রমণ দেখা দেওয়া মাত্র রুভরাল ৫০ ডব্লিউ পি (০.২%) ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হয়।

মশুরের রোগ ও প্রতিকার (সারমর্ম)

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট	পাতায় সাদা ছত্রাক জালিকা থাকে এবং গাছ নুয়ে পড়ে	রুভরাল স্প্রে, ৫০ ডিপি ০.২
মরিচা রোগ	গাছের কাণ্ড ও পাতায় মরিচা দাগ পড়ে। পাতার নিচের দিকে দাগ বেশি থাকে।	(১) বীজ শোধন কাপ্টান বা থিরাম, প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম থেকে ৩ গ্রাম। বা ০.২% ডাইথেন এম-৪৫। বা টিল্ট ২৫০ ইসি (০১) বা কেলিসিন এম (০.২%)। (২) স্প্রে-জিনেব (০.২%) বা ডাইথেন এম-৪৫ বা সালফার স্প্রে।
গোড়া পচা ও নুয়ে পড়ে।	চারা গাছের গোড়া নরম হয়ে গাছ নেতিয়ে পড়ে।	বীজ শোধন : ভিটাভেক্স-২০০ বা থিরাম প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ থেকে ৩ গ্রাম।

২০. **মশুরভিত্তিক ফসল বিন্যাস :** কয়েকটি মশুরভিত্তিক ফসল বিন্যাস সংক্ষিপ্তভাবে নিচে উপস্থাপিত হলো−

ক. *মশুর বা ছোলা + আখ* **আন্তঃফসল**

আখের উপযুক্ত জাত ও সঠিক রোপণ পদ্ধতিতে আখ চাষ।

মশুরের জাত : এল- ৫ বা উৎফলা

ছোলার জাত : নবীন

বীজ বপন সময় : অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি।

বীজ বপন : উভয় পাশের আখের সারি থেকে ৩০ সেন্টিমিটার দূরে তিন সারি মশুর সমান দূরত্বে রোপণ করতে হয়।

বীজের হার : মশুর-১৫ থেকে ১৮ কেজি/হেক্টর

ছোলা ২০ থেকে ২৫ কেজি/ হেক্টর

ফসল পর্যায় : বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে মশুর চাষে শস্যপর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। প্রচলিত শস্য পর্যায়গুলো নিম্নরূপ :

(১) *আউশ-পতিত-মশুর*

(২) *পাট- পতিত- মশুর*

(৩) *আমন- মশুর- পতিত*

(৪) *পতিত- মশুর- আউশ*

(৫) *আউশ- মশুর- পতিত*

খ. *মশুর + ছোলা আন্তঃফসল*

মশুর বা ছোলা + আখ আন্তঃফসলে নিম্নলিখিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	১৫-২০
টিএসপি	৪৫-৫০
এমপি	২৫-৩০
জিপসাম	৩৫-৪৫
জিঙ্ক সালফেট	৮-৯
বরিক অ্যাসিড	৩-৪

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : বীজ বপনের আগে দুই সারি আখের মাঝখানের জায়গায় সকল সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

২১. মশুর উৎপাদনের মাঠ সমস্যা ও সমাধান

ক. লবণাক্ততা : দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাসমূহে কিছুটা লবণাক্ত সমস্যা দেখা যায়। সেচের পানিতে যদি লবণের পরিমাণ ১০০০ পিপিএম-এর বেশি হয়, তবে লবণাক্ততা দেখা যাবে। অসমান উঁচু নিচু জমিতে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ

(১) অতিরিক্ত লবণাক্ততায় মশুর গাছ গজায় না; গজালেও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং গাছ হলুদাভ হয়ে যায়।

(২) গাছের শিকড়ে নডিউল খুবই কম হয় অথবা হয় না

(৩) লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পাতা ঝরে পড়ে।

নিয়ন্ত্রণ

(১) যদি জানা থাকে যে, জমিতে লবণাক্ততা আছে, তবে সে জমিতে মশুর চাষ না করাই ভাল।

(২) অল্প লবণাক্ত জমিতে উচ্চ সারি করে বীজ বপন করা যেতে পারে।

(৩) ভূ-গর্ভস্থ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করেও অল্প লবণাক্ত জমিতে মশুর চাষ করা যেতে পারে।

(৪) লবণাক্ততা সহনশীল জাত ব্যবহার করা।

খ. **জলাবদ্ধতা :** জলাবদ্ধতা মশুরের চারা অবস্থাসহ প্রায় সকল অবস্থায়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যেসব জমি অসমান অর্থাৎ কোথাও উঁচু কোথাও নিচু আবার যেসব জমিতে বৃষ্টিজনিত কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় সেসব জমিতে মশুর চাষ করা উচিত নয়। জলাবদ্ধতার কারণে মাঠে মশুর গাছের সংখ্যা কমে যায়, ফলে ফলনও কমে যায়।

লক্ষণ

(১) অসমান জমির নিচু জায়গায় সাধারণত জলাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

(২) জলাবদ্ধতায় মশুর গাছ হলুদ হয়ে যায়।

(৩) গাছ দুর্বল হয় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

(৪) জলাবদ্ধতা দীর্ঘ সময় ধরে থাকলে গাছ মারা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) জমিকে সমান করে তৈরি করা যাতে উঁচু নিচু না থাকে।

(২) অতিবৃষ্টিজনিত কারণে পানি জমলে তাড়াতাড়ি নিকাশনের ব্যবস্থা করা।

(৩) জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত ব্যবহার করা। যদিও এখন পর্যন্ত এ জাতীয় কোনো জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়নি। তবে ICARDA হতে প্রাপ্ত সারিগুলোর মধ্যে FLIP-84-512 এবং 74TA264 সারি দুটি জলাবদ্ধতা সহনশীল। স্থানীয় উন্নত জাতের সাথে এ সব সারির সঙ্করায়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত অবমুক্ত করা সম্ভব।

২২. আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ ও প্রতিকার

গাছের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান হলো মোট ১৭টি, যার অভাবে গাছ বাঁচতে পারে না। যদিও সব উপাদান সব গাছের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। মশুরের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস, জিঙ্ক, পটাসিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ ও বোরনের অভাবজনিত লক্ষণ ও তার প্রতিকার সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. **নাইট্রোজেন :** জলাবদ্ধতা ও অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে এবং শক্তিশালী নাইট্রোজেন সংবন্ধন (fixing) ব্যাকটেরিয়া (*Rhizobium leguminosarum*)-এর অভাবে মশুর গাছে নাইট্রোজেন স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো পোকার লার্ভা বা শূককীট যেমন *Sitona* sp. গাছের শিকড়ের গুঁটি নষ্ট করে, ফলে মশুর গাছে নাইট্রোজেনের অভাব বৃদ্ধি পায়।

অভাবজনিত লক্ষণ

(১) নাইট্রোজেনের অভাবে গাছ হালকা সবুজ রঙ ধারণ করে।
(২) নিচের পাতা হলুদ হয়ে শেষ পর্যন্ত হালকা বাদামি রঙ ধারণ করে শুকিয়ে যায়।
(৩) কাণ্ড ছোট ও সরু হয়ে যায়।
(৪) শেষ পর্যায়ে গাছের পাতা ঝরে যায় এবং ফুল ফল কম হয়।
(৫) গাছ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান গাছ অপেক্ষা তাড়াতাড়ি পরিপক্ব হয়।
(৬) কাণ্ড ছোট ও সরু হয়ে যায়।

প্রতিকার

(১) বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন স্বাভাবিক মাত্রায় না আসা পর্যন্ত ১৫-২০ কেজি/হেক্টর হিসাবে অজৈব নাইট্রোজেন (ইউরিয়া) সার প্রয়োগ করতে হয়।
(২) তরল নাইট্রোজেন ০.৫% মাত্রায় পাতায় স্প্রে করেও এ সমস্যা দূর করা যায়।
(৩) জমিতে বপনের পূর্বে হেক্টর প্রতি ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে এ সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

খ. ফসফরাস : বেলে অথবা ক্ষয়ীভূত মাটি (eroded soil) ও অতিরিক্ত ক্ষারীয় মাটিতে সাধারণত ফসফরাসের অভাব দেখা দেয়। কম সহজলভ্য ফসফরাস (৪.০ পিপিএম) সমৃদ্ধ মাটিতে মশুর বপন করলে ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। শুষ্কতা ও শস্যের নিবিড়তার কারণেও ফসফরাসের অভাব দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ

(১) ফসফরাসের অভাবে গাছ গাঢ় সবুজ থেকে লাল অথবা বেগুনি হয়ে যায়।
(২) পাতার আকার ছোট হয় এবং শাখা-প্রশাখা খুব কম থাকে।
(৩) পুরানো পাতা হলুদাভ হয়ে যায় এবং শেষে শুকিয়ে সবুজ বাদামি অথবা কালো হয়ে যায়।
(৪) ফুল ফল ও পরিপক্বতা দেরিতে আসে। এছাড়াও ফলের সংখ্যা কম হয়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) পাতায় ১-২% তরল টিএসপি স্প্রে করে এ সমস্যা দূর করা যায়।
(২) জমিতে বপনের পূর্বে ৮০-৮৫ কেজি/হেক্টর টিএসপি সার প্রয়োগ করলে এ সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

গ. জিঙ্ক : দেশের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে যশোর, মেহেরপুর, চুয়াডাঙা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মাগুড়া জেলাসমূহে ইদানিং কিছু সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফসফরাসের মতোই অতিরিক্ত ক্ষারীয় মাটিতে জিঙ্কের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত রাসায়নিক সারের ব্যবহার বিশেষ করে ফসফরাস সারের ব্যবহারের ফলে মাটিতে জিঙ্ক স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। মশুরের জমিতে যদি জিঙ্কের পরিমাণ ০.৫ পিপিএম এর কম থাকে তাহলে জিঙ্ক স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষণ

(১) গাছের পুরানো পাতাতে সাধারণত জিঙ্ক স্বল্পতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।
(২) পাতা হলুদ হয়।

(৩) পাতায় ছোট ছোট নেক্রোসিস (necrosis) দাগ পরিলক্ষিত হয় যা খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে থাকে।

(৪) পাতার আকার ছোট এবং আন্তঃপর্বের দৈর্ঘ্যও কমতে থাকে। ফলে গাছ মরা মরা (rosette) দেখায়।

(৫) নিম্ন তাপমাত্রায় পত্রগুলো দর্শনীয় রক্তাভ হয়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৪-৫ কেজি তরল জিঙ্ক সালফেটের সাথে ২-২.৫ কেজি চুন মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করে এ সমস্যা দূর করা যায়।

(২) সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, যেসব জমিতে জিঙ্ক স্বল্পতা রয়েছে সেসব জমিতে মশুর বপনের পূর্বে হেক্টর প্রতি ১৫-২৫ কেজি জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা।

ঘ. **পটাশিয়াম :** সাধারণত অম্লীয় মাটিতে পটাশ স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে কোনো কোনো অঞ্চলে পটাশ স্বল্পতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

লক্ষণ

(১) পটাশের অভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের নিচের পুরানো পাতায় ক্লোরোসিস (chlorosis) দেখা যায়।

(২) শেষ দিকে নেক্রোসিস দেখা যায়।

(৩) শিকড়ে নডিউল উৎপাদন কমে যায়।

(৪) জমিতে নাইট্রোজেন স্বল্পতা থাকলে গাছে পটাশিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। সাথে সাথে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) পটাসিয়াম নাইট্রেট অথবা পটাসিয়াম সালফেট ০.৩-.০৫% হারে পাতায় স্প্রে করে পটাসিয়ামের অভাব দূর করা যায়।

(২) মশুর বপনের পূর্বে মশুরের জমিতে হেক্টর প্রতি ৩০-৩৫ কেজি পটাসিয়ামযুক্ত (MP) সার ব্যবহার করলে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হয় না।

ঙ. **লোহা :** উচ্চ pH যুক্ত ক্যালকেরিয়াস মাটিতে লোহার স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে মশুর চাষে এ সমস্যাটি ততোটা প্রকট নয়।

লক্ষণ

(১) গাছের উপরিভাগের নতুন পাতা ও কুঁড়িতে প্রথমে লোহার অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

(২) এ সমস্ত অংশ হলুদ হয়ে যায়।

(৩) পাতার আকার ছোট হয়ে যায়।

(৪) কাণ্ড সরু ও ছোট হয়ে যায়।

(৫) শেষের দিকে পুরানো পাতায় এ লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং শাখা-প্রশাখার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) লক্ষণ প্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ২% ফেরাস সালফেট দ্রবণ স্প্রে করে গাছের লোহা স্বল্পতা দূর করা যায়।

(২) মশুর বপনের পূর্বে জমিতে বেশি করে জৈব সার প্রয়োগ করে এ সমস্যা দূর করা যায়।

ছ. বোরন : সাধরণত ক্যালক্যারিয়াস বা অতিরিক্ত চুনযুক্ত মাটিতে pH বেড়ে যাওয়ার ফলে মাটিতে বোরন স্বল্পতা দেখা যায়। শুষ্কতার কারণে অর্থাৎ মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলেও বোরন স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষণ

(১) বোরনের অভাবে গাছের শীর্ষ মুকুল বা নতুন পাতা বিবর্ণ হয় এমনকি মারাও যেতে দেখা যায়।
(২) পরিপক্ক পাতায় ক্লোরোসিস দেখা যায়।
(৩) পত্রফলক বিকৃত আকার ধারণ করে।
(৪) মুকুল, ফুল ও ফল ঝরে পড়ে এবং ফলন কমে যায়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহে বীজ বপনের সময় হেক্টর প্রতি ১.৫ কেজি বোরন প্রয়োগ করলে মশুরের ভাল ফলন পাওয়া যায়।
(২) হেক্টর প্রতি ০.৫-২.০ কেজি বোরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করেও এ সমস্যা দূর করা সম্ভব।
(৩) এছাড়াও মাটিতে pH নিয়ন্ত্রণ করে এ সমস্যা দূর করা যায়।

জ. ম্যাঙ্গানিজ : ম্যাঙ্গানিজের স্বল্পতা এবং অতিরিক্ততা উভয়ই গাছের জন্যে ক্ষতিকর। উচ্চ pH ও অতিরিক্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতে সাধারণত ম্যাঙ্গানিজ স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে এ সমস্যা ততোটা প্রকট নয়।

অভাবজনিত লক্ষণ

(১) ম্যাঙ্গানিজ স্বল্পতাজনিত লক্ষণ নতুন পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে।
(২) নতুন পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলুদ দাগ যুক্ত ক্লোরোসিস দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ

(১) হেক্টর প্রতি ০.৫-১.৫ কেজি তরল ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ($MnSO_4$) স্প্রে করে মশুরের জমিতে ম্যাঙ্গানিজ স্বল্পতা দূর করা যায়।
(২) মশুরের জমিতে বীজ বপনের পূর্বে হেক্টর প্রতি ৫-১০ কেজি ম্যাঙ্গানিজ সালফেট ($MnSO_4$) ছিটিয়ে এ সমস্যা দূর করা যায়।

অতিরিক্ততাজনিত লক্ষণ

(১) গাছে মৌসুমের শুরুতেই অতিরিক্ত ম্যাঙ্গানিজের লক্ষণ প্রকাশিত হয়।
(২) গোড়ার পাতা কালচে বাদামি রঙ ধারণ করে।
(৩) পরীক্ষা করলে দেখা যায় স্বাভাবিক গাছের পাতা অপেক্ষা এসব গাছের পাতায় প্রায় ২-৩ গুণ বেশি ম্যাঙ্গানিজ থাকে।

নিয়ন্ত্রণ

মাটির pH স্বাভাবিকের কাছাকাছি (৭ এর কাছাকাছি) আনতে পারলে ম্যাঙ্গানিজের অভাবজনিত সমস্যা সমাধান করা যায়।

২৩. জীবাণু সার ও তার ব্যবহার পদ্ধতি

যে কোনো ফসলের অধিক ফলনের জন্যে প্রয়োজন উর্বর মাটি। উর্বর মাটি বলতে বোঝায় এমন মাটি যাতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় প্রায় ১৭টি মৌলিক পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে, সঠিক আকারে ও সঠিক অনুপাতে সরবরাহের ক্ষমতা রয়েছে। এই পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে গাছ বায়ু থেকে কার্বন, পানি থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সহজেই গ্রহণ করতে পারে। আর নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, মলিবডেনাম, বোরন, ক্লোরিন, কোবাল্ট ইত্যাদি মাটি থেকে গাছ গ্রহণ করে। মাটিতে এই পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাব হলে গাছের ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তাই ফসল উৎপাদনে এই পুষ্টি উপাদানগুলো গ্রহণযোগ্য আকারে সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার।

জমিতে অব্যাহতভাবে ও উচ্চ ফলনশীল দানাজাতীয় ফসল চাষের ফলে জমির উর্বরা শক্তি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ডালজাতীয় ফসল চাষে মাটি উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। (Satter, 1997) নিচে বিভিন্ন লিগিউম শস্যের জমিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধন

শস্য	নাইট্রোজেন সংবন্ধনের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া সমতুল্য (কেজি/হেক্টর)
মশুর	১১৫	২৫৬
ছোলা	১০৫	২৩৩
মাশকলাই	১০০	২২২
মুগ	১০০	২২২
খেশারি	৯৫	২১১
মটর	১১০	২৪৪
অড়হর	২০০	৪৪৪
বরবটি	১০০	২২২
চীনাবাদাম	১৫০	৩৩৩
সয়াবিন	২১০	৪৬৭
ধৈঞ্চা	৮৪ (৭০ দিনে)	১৮৭

সূত্র : Satter, 1997

মাটিতে উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদানসমূহের অভাব ঘটলে কৃত্রিমভাবে তৈরি করে সেসব মৌলিক উপাদান প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফসলের পুষ্টি

উপাদানসমূহের ঘাটতি পূরণে যেসব দ্রব্য প্রয়োগ করা হয় সেগুলোকে সার বলা হয়। উচ্চ ফলন পাওয়ার আশায় মাটিতে রাসায়নিক সার, জৈব সার, জীবাণু সার ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। নিচে জীবাণু সার ও তার ব্যবহার পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জীবাণু সার : জীবাণু যখন মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর নিমিত্তে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে জীবাণু সার বলা হয়। অন্য কথায়, জীবাণু যখন সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে জীবাণু সার বলে।

ব্যবহার পদ্ধতি : দু'ভাবে জীবাণু সার ব্যবহার করা হয়–

(১) প্রথমে আঠালো তরল বস্তু (যেমন-চিটাগুড়, ভাতের মাড়, Gum Arabic) জীবাণু সারের সাথে মিশিয়ে নেয়া হয়। পরবর্তীকালে পরিমাণমতো বীজ এই আঠালো দ্রবণে মেশানো হয়। এতে জীবাণু বীজাবরণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। তরল বস্তুটির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে বীজ ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিয়ে (ঝুরঝুরে করে) জমিতে বপন করা হয়. জীবাণু সার মেশানো বীজ রোদে শুকানো উচিত নয়, কারণ এতে জীবাণু মারা যায়। এভাবে মেশানো জীবাণু আচ্ছাদিত বীজে চুন বা ফসফরাসজাতীয় সারের আরও একটি প্রলেপ দিলে জীবাণু সারের কার্যকারিতা বেড়ে যায় বলে জানা যায়

(২) এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজ চিটাগুড়ের সাথে মেশানো হয় এবং পরে জীবাণু সার চিটাগুড় মিশ্রিত লালচে বীজে মেশানো হয়। পদ্ধতিটি সহজতর ও সুবিধাজনক বিধায় এর বিভিন্ন ধাপ (এক কেজি মশুর বীজের জন্য) পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

(১) বীজ : সুস্থ, সতেজ ও শুকনা ১ (এক) কেজি।

(২) চিটাগুড় : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩-৫%, বড় বীজে ২-৩%)।

(৩) জীবাণু সার : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩-৫%, বড় বীজে ২-৩%)।

জীবাণু সারের ব্যবহার বিধি

(১) সুস্থ ও সতেজ শুকনো বীজে সঠিক পরিমাণ চিটাগুড়ে মিশিয়ে নিতে হয়, যাতে বীজগুলো আঠালো হয়।

(২) চিটাগুড়ের অভাবে ভাতের ঠাণ্ডা মাড় বা পানি ব্যবহার করা যায়।

(৩) আঠালো বীজগুলোর সাথে জীবাণু সার ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়, যাতে প্রতিটি বীজে একটি কালো প্রলেপ পড়ে যায়

(৪) একবারে পুরো জীবাণু সার না ঢেলে দু'বারে মেশালে ভালভাবে মেশানো হয়।

(৫) কালো প্রলেপযুক্ত বীজ ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকে।

(৬) বেশি শুকালে জীবাণু সারের কার্যকারিতা কমে যায়।

(৭) জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রোদবিহীন বা খুবই অল্প রোদে বপন করতে হয়।

(৮) সঙ্গে সঙ্গে বপনকৃত বীজগুলোকে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

(৯) কীটনাশক বা রোগনাশক ওষুধমিশ্রিত বীজে জীবাণু সার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়।

(১০) তবে উক্ত বীজগুলোকে ভালভাবে ধুয়ে জীবাণু সার ব্যবহার করা যায়।

(১১) ঠাণ্ডা, শুকনো ও রোদমুক্ত জায়গায় জীবাণু সার এবং জীবাণু সারমিশ্রিত বীজ রাখতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

মুগকলাই চাষ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে ডাল ফসলের মধ্যে মুগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক থেকে মুগকলাই ডাল ফসলের মধ্যে পঞ্চম স্থান দখল করে আছে। সব জেলাতেই কম-বেশি মুগকলাই চাষ হয়ে থাকে। তবে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। প্রায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৫৫ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৩২ হাজার টন।

বাংলাদেশে ডাল হিসেবে মুগ অত্যন্ত জনপ্রিয়। এতে আমিষের পরিমাণ ২৪% ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ ৪%। মুগ গাছ অনেক সময় গবাদি পশুর খাবার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সবুজ সার হিসেবেও কচি মুগের গাছ ব্যবহার হয়ে থাকে। গবাদি পশুর খাবার হিসেবেও মুগের খোসা ও খড় ব্যবহৃত করা যায়।

দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় আমন ধান কাটার পর রবি মৌসুমে ব্যাপক ভিত্তিতে মুগের চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহ যথা- যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরে সরিষা বা অন্যান্য রবিশস্য কাটার পর বপনপূর্ব সেচ দিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল বারিমুগ-২ (কান্তি) জাতের চাষ হয়ে থাকে যা স্থানীয়ভাবে 'ইরি মুগ' নামে পরিচিত।

দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাসমূহ বাদে দেশের প্রায় সর্বত্রই খরিফ-২ মৌসুমে মুগের চাষ হয়ে থাকে। অর্থাৎ ডাল ফসলের মধ্যে একমাত্র মুগকলাই প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়। অন্যান্য ডাল ফসলের তুলনায় মুগকলাই চাষে সময়ও কম লাগে (৫৫ থেকে ৭৫ দিন)। ফলে মুগকলাই সহজেই শস্য বিন্যাসে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। এছাড়াও মুগকলাই অন্যান্য ডাল ফসল অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত খরা ও আর্দ্রতা সহিষ্ণু। সময়মতো বপন করতে পারলে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

১.১. বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক মুগ ডাল উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
এলাকা	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন
বান্দরবান	২৫	১০	২৫	১০	২০	১০
চট্টগ্রাম	২০৪০	৫৫০	২১১০	৫৬০	২১৮০	৫৮০
কুমিল্লা	৩২১৫	৮০০	৩২৬০	৮৬৫	৩২৩০	৮৩৫
খাগড়াছড়ি	৬০	১০	৬০	১০	৬৫	১৫

নোয়াখালী	১৮৪৫৫	৫৫১০	১৮২৮৫	৫৬১০	১৮৪৬৫	৫৬১৫
রাঙ্গামাটি	–	–	–	–	–	–
সিলেট	৫৫	১৫	৫৫	১৫	৫৫	১৫
ঢাকা	২৪৯৫	৫৩৫	২৬৪০	৫৭৫	২৬০৫	৫৬০
ফরিদপুর	১১৬৮০	৩৪০০	১১৪৫০	২৫৭০	১১৪৭০	২৫৭০
জামালপুর	২৭০	৭৫	২৮০	৯৫	২৭৫	৯৫
কিশোরগঞ্জ	৪৫০	১৪০	৪৫৫	১৩৫	৪৫০	১৩৫
ময়মনসিংহ	৬৬৫	২১৫	৬৫০	২১০	৬৫৫	২১৫
টাঙ্গাইল	২৫০	৬০	২৪৫	৬০	২৪৫	৬০
বরিশাল	৪০২২০	৫০৬৫	৪১১২৫	৬৭৭০	৪০৭৬০	৬৯৩০
যশোর	৫০৯০	১৫৬৫	৫০৮৫	১৫৬০	৪৯২৫	১৪৩০
খুলনা	১৯৬৫	৫২০	১৯৪৫	৫৬৫	২১৭৫	৫৯০
কুষ্টিয়া	৫৩৫৫	১৮১০	৫৫৬৫	১৮৩৫	৫৭৯৫	১৮৬০
পটুয়াখালি	৩৭৮৮০	১০৪১৫	৩৬৯৩৫	১০৮৯৫	৩৭০৩৫	১১৪৪৫
বগুড়া	৮৫	২০	৯০	২০	৮০	২০
দিনাজপুর	৪০৫০	১০৮৫	৪১৪৫	১১১০	৪১২০	১১০০
পাবনা	৩২৫	৭৫	৩৩৫	৮০	৩৩০	৮০
রাজশাহী	২৯৫	৬৫	২৯৫	৬৫	৩০০	৭০
রংপুর	৬০০	১৬৫	৬১৫	১৭০	৬২৫	১৭৫
বাংলাদেশ	১৩৫৪১৫	৩২০৭৫	১৩৬৩৫০	৩৩৭৮৫	১৩৫৮৬০	৩৪৪০৫

২. মুগকলাইয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব

মুগকলাই গাছের উদ্ভিদতত্ত্ব সংক্ষেপে নিচে বর্ণনা করা হলো–

(১) মুগ এক ধরনের ছোট লতানো গাছ।

(২) লম্বায় ১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

(৩) এর প্রধান মূল বেশ লম্বা।

(৪) মুগের ফুলের গুচ্ছ পাতার গোড়ায় অথবা গাছের আগায় জন্মাতে পারে।

(৫) ফুলের থোকাতে ১০ থেকে ২০টি ফুল থাকে।

(৬) বীজ গজানোর পর বীজপত্র মাটির উপরে থাকে।

(৭) মুগ গাছের বৃদ্ধি প্রথম দিকে কম থাকে।

(৮) বীজ গজানোর ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ পর গাছের দ্রুত বৃদ্ধি হয়।

(৯) ফুল উৎপাদন নিচের চার গিঁট থেকে আরম্ভ হয়।

গোত্র : Leguminosae

উপগোত্র : Papillionaceae

গণ : *Vigna*

প্রজাতি : *Vigna radiata*

৩. মুগকলাই জাত

মুগের দেশী, স্থানীয় উদ্ভাবিত ও বিদেশী জাত রয়েছে। এখানে বিভিন্ন জাতের বর্ণনা দেওয়া হলো।

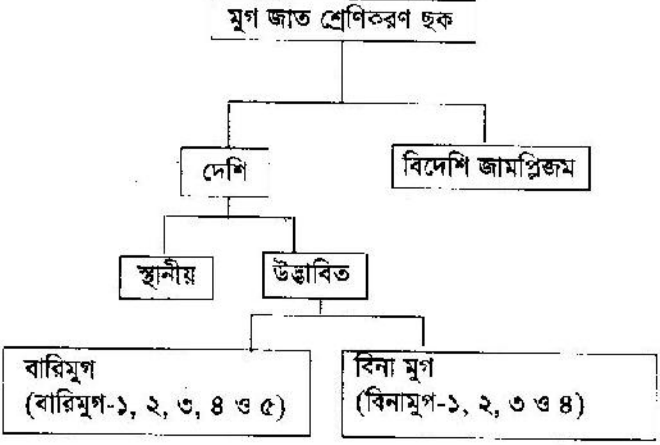

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগের উন্নত জাতসমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক. বারি মুগ-২ (কান্তি) : ফিলিপাইন থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে এ প্রজাতিটি নির্বাচন করা হয়। ১৯৮৭ সালে এ জাতটি সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৪০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার।
(২) চারার গোড়ায় পিগমেন্ট আছে।
(৩) বীজের রঙ সবুজ মসৃণ।
(৪) হাজার বীজের ওজন ২৫ থেকে ২৬ গ্রাম।
(৫) জাতটি সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহিষ্ণু।
(৬) খরিফ-১, খরিফ-২ ও নাবী রবি মৌসুমে চাষ করা যায়।
(৭) জীবনকাল ৬০ থেকে ৬৫ দিন।
(৮) হেক্টর প্রতি ফলন ১.০ থেকে ১.২ টন।
(৯) দানার পরিমাণ ৮৮%।
(১০) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৭৬%।
(১১) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১৫ মিনিট।
(১২) পানিতে দ্রবীভবণ ৫২%।
(১৩) পানিশোষণ ২.২ গ্রাম।

(১৪) বীজে আমিষের পরিমাণ ২১%-২৩%।

(১৫) শর্করার পরিমাণ ৪৬%।

খ. **বারি মুগ-৩ :** সঙ্করায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

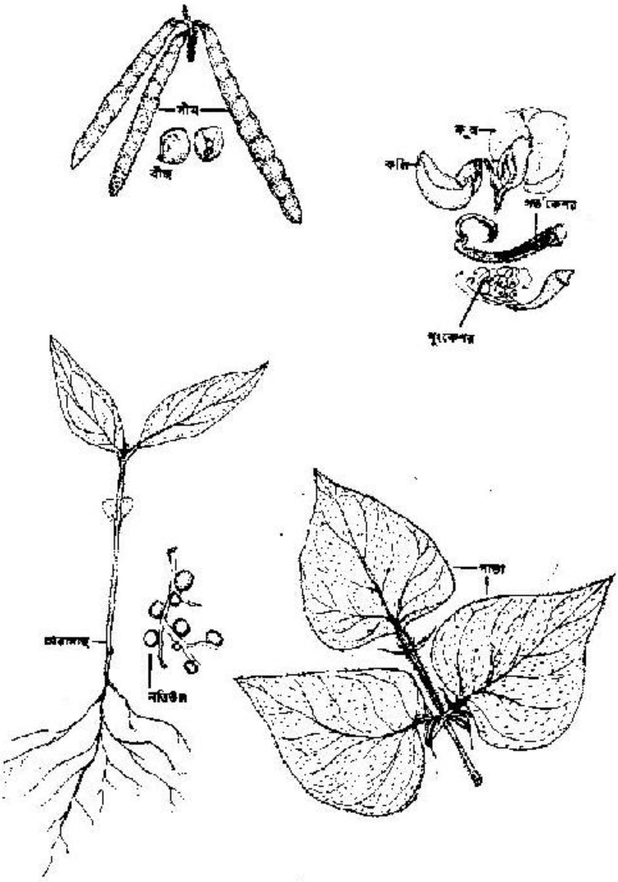

চিত্র ১ : মুগ উদ্ভিদ ও তার বিভিন্ন অংশ

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৫০ থেকে ৫৫ সেন্টিমিটার।

(২) বীজ মসৃণ ও রঙ বাদামি সবুজ।

(৩) হাজার বীজের ওজন ২৮ গ্রাম থেকে ২৯ গ্রাম।

(৪) খরিফ-১, খরিফ-২ ও রবি মৌসুমে বিলম্বে আবাদ করা যায়।

(৫) জীবনকাল ৬০ থেকে ৬৫ দিন।
(৬) হেক্টর প্রতি ফলন ১.২ থেকে ১.৩ টন
(৭) জাতটি সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহিষ্ণু।
(৮) দানার পরিমাণ ৮৯%।
(৯) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৬৭%।
(১০) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১৫ মিনিট।
(১১) রান্নার পর পানিতে দ্রবীভবণ ৪৯%।
(১২) পানি পরিশোষণ ২.৫ গ্রাম।
(১৩) বীজে আমিষের পরিমাণ ২০%-২১%।
(১৪) শর্করার পরিমাণ ৫০%।

বারিমুগ-৩ এর প্রজেনি

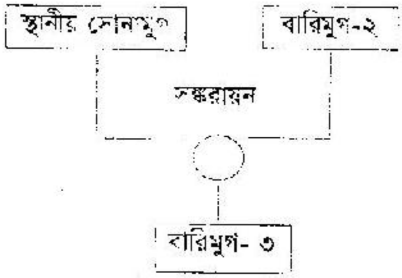

গ. **বারিমুগ-৪** : এ জাতটি সঙ্করায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৫০ থেকে ৫৫ সেন্টিমিটার।
(২) বীজ মসৃণ এবং রঙ সবুজ।
(৩) হাজার বীজের ওজন ৩০ গ্রাম থেকে ৩২ গ্রাম।
(৪) খরিফ-১, খরিফ-২ ও রবি মৌসুমেও বিলম্বে বপন করা যায়।
(৫) জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
(৬) জীবনকাল ৬০ থেকে ৬৫ দিন।
(৭) হেক্টর প্রতি ফলন ১.২ থেকে ১.৪ টন।
(৮) জাতটি সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহিষ্ণু।
(৯) দানার পরিমাণ ৮৯%।
(১০) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৬৮%।
(১১) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১৭ মিনিট।
(১২) রান্নার পর পানিতে দ্রবীভবণ

(১৩) পানিশোষণ ২.৫০ গ্রাম
(১৪) বীজে আমিষের পরিমাণ ২৩%
(১৫) শর্করার পরিমাণ ৫১%।

বারি মুগ-৪ এর প্রজেনি

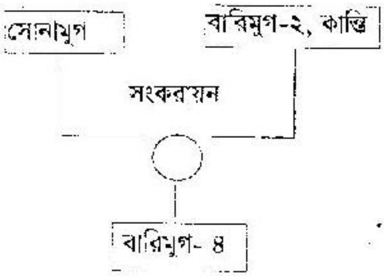

ঘ. বারি মুগ-৫ : AVRDC এর সহায়তায় অগ্রবর্তী সারি হিসেবে উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি ১৯৯৭ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেন্টিমিটার।
(২) ফল এক সাথে পাকে।
(৩) চারায় কোনো পিগমেন্ট নেই।
(৪) গাছের পাতা, ফুল ও বীজ আকারে বেশ বড়।
(৫) বীজের রঙ গাঢ় সবুজ।
(৬) হাজার বীজের ওজন ৪০ গ্রাম থেকে ৪২ গ্রাম।
(৭) ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১৮মিনিট।
(৮) জাতটি পাকতে ৫৫ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে।
(৯) হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১.১ থেকে ১.৩ টন।
(১০) জাতটি সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহিষ্ণু।
(১১) দানার পরিমাণ ৮৯%।
(১২) আস্ত ডাল উৎপন্ন ৬৮%।
(১৩) পানিতে দ্রবীভবন ৪৫%
(১৪) পানিশোষণ ২.২ গ্রাম।
(১৫) আমিষের পরিমাণ ২০% -২১%।
(১৬) শর্করার পরিমাণ ৫০%

বারিমুগ-৫ এর প্রজেনি

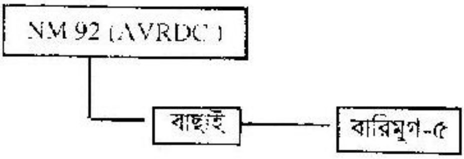

ঙ. **বিনা মুগ-১** : বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture, BINA) কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগের উন্নত জাতসমূহের বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি শীতকালীন মুগ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ১৯৯২ সালে অনুমোদন লাভ করে।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৪০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার।
(২) বীজের রঙ চকচকে হলদে সোনালি।
(৩) হাজার বীজের ওজন ৩০ গ্রাম থেকে ৩৫ গ্রাম (১০% আর্দ্রতায়)।
(৪) জীবনকাল ৯০ থেকে ৯৫ দিন।
(৫) সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহিষ্ণু।
(৬) হেক্টর প্রতি ফলন ৮৫০ থেকে ৯৫০ কেজি।
(৭) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১১ মিনিট (১৫ পাঃ চাপে)
(৮) আমিষের পরিমাণ ২৩%–২৪%।

বিনামুগ-১ এর প্রজেনি

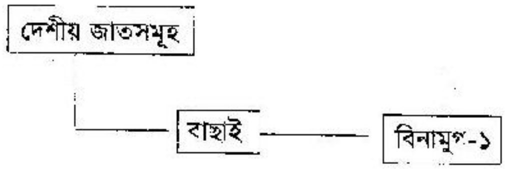

চ. **বিনামুগ-২** : বিনামুগ-২ গ্রীষ্মকালীন মুগকলাইয়ের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড থেকে সংগৃহীত একটি জাতের বীজ গামারশ্মি প্রয়োগ করে এমবি-৫৫-৪ নামক একটি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। এ সারিটির সাথে AVRDC থেকে সংগৃহীত একটি সারির সঙ্করায়ণের পর নির্বাচন করা হয়। সারিটি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য ১৯৯৪ সালে 'বিনামুগ-২' নামে অনুমোদিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) এ জাতের ফলের সংখ্যা বেশি, তবে বীজ ছোট।
(২) গ্রীষ্মকালেও চাষের উপযোগী।
(৩) গাছের উচ্চতা ৬০ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার।
(৪) সবগুলো ফল এক সাথে পরিপক্ব হয়।
(৫) বীজের রঙ হাল্কা সবুজ এবং আকারে বড়।
(৬) হাজার বীজের ওজন ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম.
(৭) জীবনকাল ৭০ থেকে ৮০ দিন।
(৮) হেক্টর প্রতি ফলন ১০০০ থেকে ১২০০ টন।

(৯) হলুদ মোজাইক ভাইরাস ও সারকোস্পোরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।
(১০) দানার পরিমাণ ৮৬%।
(১১) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১২ মিনিট (১৫ পাঃ চাপে)
(১২) বীজে আমিষের পরিমাণ ২২%।

বিনামুগ-২ এর প্রজেনি

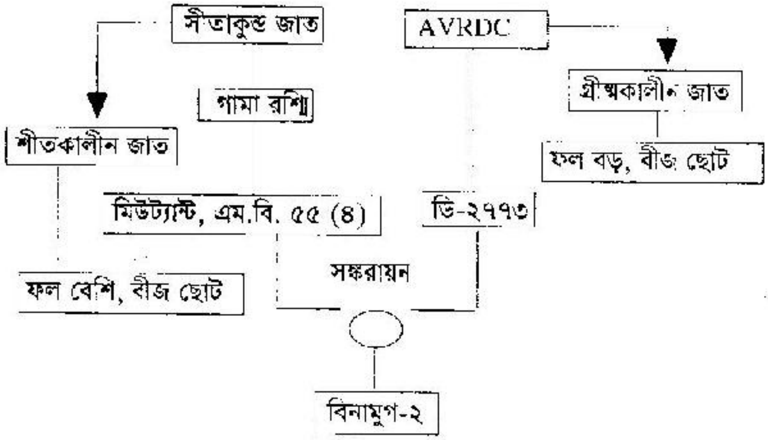

ছ. **বিনামুগ-৩ :** স্থানীয় একটি জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে একটি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। তারপর AVRDC হতে সংগৃহীত একটি শীতকালীন উন্নত সারির সঙ্গে সঙ্করায়ন করা হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর একটি সারি বাণিজ্যিকভাবে শীতকালে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ১৯৯৭ সালে 'বিনামুগ-৩' নামে অনুমোদিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের গড় উচ্চতা ৩০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার।
(২) বীজের রঙ হাল্কা সবুজ।
(৩) বীজের আকার বড়.
(৪) হাজার বীজের ওজন ৩৫ গ্রাম থেকে ৪০ গ্রাম (১০% আর্দ্রতায়)।
(৫) সবগুলো ফল এক সাথে পরিপক্ক হয়।
(৬) জীবনকাল ৮০ থেকে ৮৫ দিন।
(৭) হেক্টর প্রতি ফলন ১.০ থেকে ১.১ টন।
(৮) এ জাতটিতে সারকোস্পোরা রোগ হয় না
(৯) হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ খুবই কম হয়।
(১০) দানার পরিমাণ ৮৮%।
(১১) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১৩ মিনিট (১৫ পাঃ চাপে)
(১২) আমিষের পরিমাণ ২২%-২৩%।

বিনামুগ-৩ এর প্রজেনি

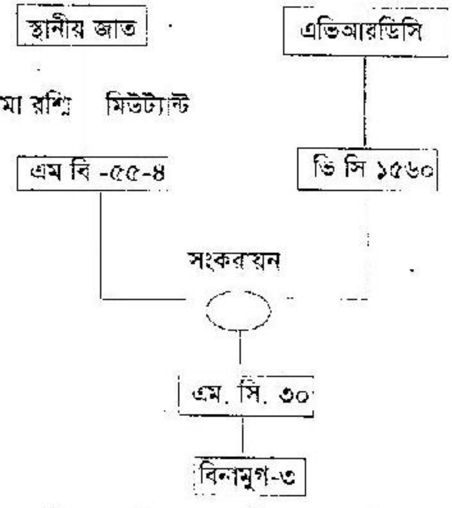

ঞ. বিনামুগ-৪ : স্থানীয় একটি জাতের বীজে গামারশ্মি প্রয়োগ করে একটি মিউট্যান্ট উদ্ভাবন করা হয়। তারপর AVRDC হতে সংগৃহীত একটি শীতকালীন উন্নত সারির সাথে উক্ত মিউট্যান্টের সঙ্করায়ন করা হয় এবং চাষাবাদের জন্য ১৯৯৭ সালে 'বিনামুগ-৪' নামে অনুমোদিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ২৮ থেকে ৩২ সেন্টিমিটার।
(২) বীজের রঙ হাল্কা সবুজ ।
(৩) বীজের আকার বড়।
(৪) হাজার বীজের ওজন ৩৫ গ্রাম থেকে ৪০ গ্রাম (১০% আর্দ্রতায়)
(৫) সমস্ত ফল এক সাথে পাকে।
(৬) পরিপক্ক হওয়ার পর ফলের রঙ কুচকুচে কালো হয়।
(৭) জীবনকাল ৭৫ থেকে ৮০ দিন।
(৮) হেক্টর প্রতি ফলন ১.০ থেকে ১.১ টন।
(৯) এ জাতটি সারকোস্পোরা রোগ ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
(১০) দানার পরিমাণ ৮৮%।
(১১) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ১৩ মিনিট (১৫ পাঃ চাপে)।
(১২) বীজে আমিষের পরিমাণ ২৩%।

বিনামুগের তিনটি জাতের বৈশিষ্ট্যের তুলনা

বৈশিষ্ট্য	বিনামুগ-১	বিনামুগ-৩	বিনামুগ-৪
হেক্টরে প্রতি গড় ফলন (কেজি)	৯০০	১০২৫	১০৭৫
গাছের উচ্চতা (সেন্টিমিটার)	৩৫-৫০	৩০-৩৫	২৮-৩২
জীবনকাল (দিন)	৯০-৯৫	৮০-৮৫	৭৫-৮০

বিনামুগ-৪ এর প্রজেনি

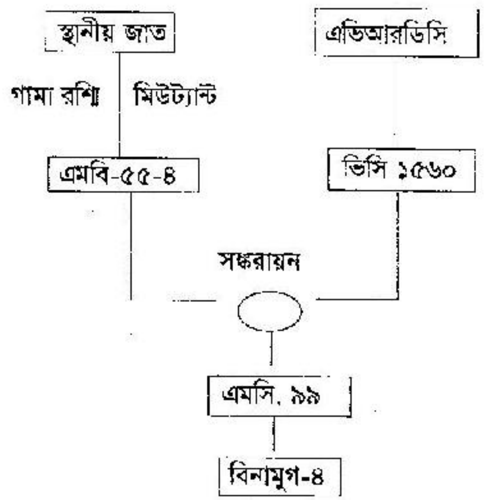

৪. বিনামুগ জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি

পরিবেশ গত চাহিদা : সব ধরনের মাটিতেই মুগকলাই চাষ করা যেতে পারে। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটিতে এই ফসল ভাল জন্মে থাকে। যদি পানি জমে না থাকে, তবে এঁটেল মাটিতেও এর চাষ করা যেতে পারে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত মাটিতেও এর চাষ করা যেতে পারে।

মুগ সাধারণত উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ভাল জন্মে থাকে। মুগ চাষের জন্য উত্তম তাপমাত্রা হলো ২৫°-৩০° সেঃ। বাতাসের তাপমাত্রা ২০° সেঃ এর কম হলে মুগকলাইয়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০°-২২° সেঃ এবং ভাল ফলনের জন্য ২৮°-৩১° সেঃ।

এই ফসলকে কিছুটা খরাসহিষ্ণু ফসল বলা হয়ে থাকে। তবে মুগকলাই উজ্জ্বল রোদ ও অপেক্ষাকৃত কম অর্দ্রতাপূর্ণ পরিবেশে ভাল জন্মে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মুগকলাই সহ্য করতে পারে না। মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশি কমে গেলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফুল ও ফল (শুঁটি) কম হয়ে থাকে। জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ জমিতে এই জাত বপনে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বৃষ্টি বা অন্য কারণে পানি জমে গেলে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়।

বীজ বপন সময় : সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হয়। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

ঋতুভিত্তিক ও অঞ্চলভেদে বছরের ৩টি সময়ে বাংলাদেশে মুগকলাই বপন করা হয়।

(১) **দক্ষিণাঞ্চল**

নাবী রবি : জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

(২) **উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল**

খরিফ-১ : ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

(৩) দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল

খরিপ-২ : আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

মুগকলাই প্রধানত ছিটিয়ে বোনা হয়। বপনের পর ভালভাবে মই দিয়ে বীজগুলো ঢেকে নিতে হয়

জমি তৈরি : তিন চারটি চাষ ও মই দিয়ে সাধারণভাবে জমি তৈরি করে বীজ বপন করতে হয়। দুটি চাষ দেওয়ার পর নির্ধারিত পরিমাণ টিএসপি এবং এমপি সার ছিটিয়ে দিতে হয়। জমিতে রসের অভাব হলে একটি হাল্কা সেচ দেওয়া যায়।

জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে সারের মাত্রার তারতম্য করা যেতে পারে। মুগকলাই চাষাবাদে দেখা যায় যে, বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জমি চাষ করা ছাড়া শুধু ছিটিয়ে বপন করলে বীজ কম নষ্ট হয় এবং ঝুঁকি কম থাকে। সুতরাং জমির উর্বরতা, জমিতে আবাদকৃত পূর্বের ফসল এবং বৃষ্টিপাতের অবস্থা বিবেচনা করে জমি চাষ দেওয়া এবং সার প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কাদা জমিতে চাষ ছাড়াই বীজ বপন করা যায়। তবে উঁচু জমিতে চাষ দিয়ে বপন করতে হয়।

বীজ বপন : বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করতে হয়। সারিতে বপন করলে এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টিমিটার।

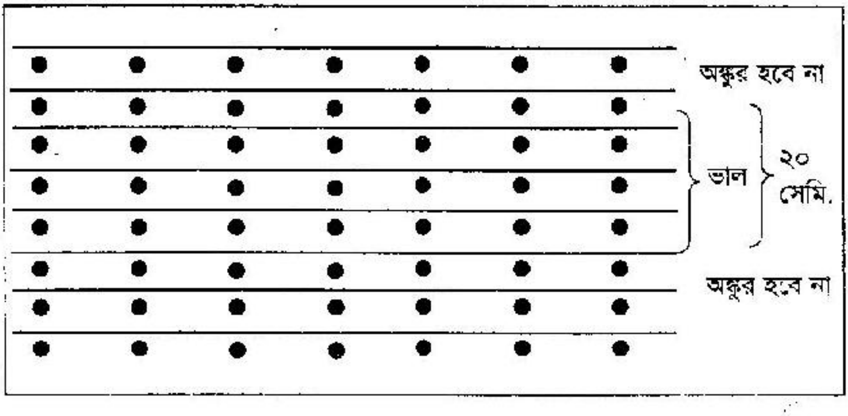

চিত্র ২ : মুগ বীজ বপন নকশা

বিনামুগ-৪ এর ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার। প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ টি। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেন্টিমিটার হলে ফলন ভাল হয়। বীজ কিছুটা গভীরতায় বপন করলে অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয়। এতে পাখি দ্বারা বীজ নষ্ট কম হয়। মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলে জমির উপরিভাগ হতে কমপক্ষে ৫ সেন্টিমিটার নিচে বীজ বপন করতে হয়। বীজ সঠিকভাবে বপন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বীজ বপন যন্ত্র তৈরি করেছে। বীজ বপন করার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করলে সময় ও বীজ তুলনামূলকভাবে কম লাগে এবং গভীরতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বিনামুগ- ১,২ ঃ ২৫-৩০ কেজি	ছিটিয়ে বপন করলে বীজ আরও ১০ কেজি
বিনামুগ- ৪ ঃ ৩০-৩৫ কেজি	বাড়িয়ে দিতে হয়।

বীজের পরিমাণ : বীজের আকার ও বপন পদ্ধতিভেদে বীজের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। ছিটানো পদ্ধতিতে সারি করে বপন পদ্ধতির চেয়ে বেশি বীজ লাগে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার রেখে বীজ বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। ছিটানো পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৪৫ থেকে ৫০ কেজি প্রয়োজন। প্রতি বর্গমিটারে ৩০ থেকে ৪০টি গাছ থাকে। অধিক ঘনত্বে চারা লাগালে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। গাছের সংখ্যা প্রতি হেক্টরে ৪,৫০,০০০টি রাখতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব। যেসব জাতের বীজ আকারে বড় সেসব জাতের বীজ পরিমাণে বেশি লাগে। যেমন- বারিমুগ-২ জাতের বীজ যেখানে হেক্টর প্রতি ৩০ থেকে ৩৫ কেজি লাগে সেখানে বারিমুগ-৫ জাতের বীজ প্রয়োজন হেক্টর প্রতি ৪৫ থেকে ৫০ কেজি।

বীজ বপন হার : বীজের আকার ও বপন পদ্ধতিভেদে বীজের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। ছিটানো পদ্ধতিতে বীজ সারি করে বপন পদ্ধতির চেয়ে বেশি লাগে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার রেখে বীজ বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। ছিটানো পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি থেকে ৫০ কেজি বীজ লাগে। জমিতে গাছের ঘনত্ব কম হলে ফলন কমে যায়। লাগানোর সময় এমন পরিমাণ বীজ ব্যবহার করতে হয় যেন প্রতি বর্গমিটারে ৩০ থেকে ৪০টি গাছ থাকে। মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলে শিকড় চারা অবস্থায় মাটির গভীরে প্রবেশ করে।

সার প্রয়োগ : শুঁটিজাতীয় ফসল হওয়ায় মুগকলাই বাতাসের নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এর ফলে মুগকলাই চাষে ইউরিয়া সার কম লাগে। তবে জমিতে চারা স্থায়ী হওয়া ও নাইট্রোজেন আহরণে সক্ষম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সার প্রয়োজন। হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১০০ কেজি টিএসপি এবং ৫৮ কেজি এমপি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করে ফলন বৃদ্ধি করা যায়।

আগাছা দমন : মুগকলাইয়ের ভাল ফলন পেতে হলে ফসল বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাতেই আগাছা দমন করতে হয়। আগাছা দমন না করলে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ২৭% থেকে ৯৫% পর্যন্ত মুগের ফলন কমে যায়। আগাছার বৃদ্ধি ফসলের বৃদ্ধির চেয়ে দ্রুত হয়। আগাছার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে মুগকলাইয়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ছিটানো পদ্ধতিতে বপন করা মুগে আগাছা দমন বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে, ফলে যদি বর্ষা মৌসুমে অঙ্কুরোদগমের পর থেকে ৫ সপ্তাহ এবং শুষ্ক মৌসুমে ৩ সপ্তাহ মুগ এর জমিকে আগাছামুক্ত রাখা যায় তাহলে ভাল হয়। ভাল ফলন পেতে হলে অঙ্কুরোদগমের ১৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করতে হয়।

পানি সেচ, নিকাশ ও বিশেষ পরিচর্যা : মুগ কিছুটা খরাসহিষ্ণু ফসল। ফসল গভীরমূলী বলে জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি মাটির গভীর থেকেও টেনে নিতে পারে। মাটিতে বীজ বপনের সময় যদি পানির পরিমাণ কম থাকে, তাহলে অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করার জন্য বপনের পূর্বে একটি হালকা সেচ দিতে হয়।

কান্তি জাতের ছোট আকারের বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্যে জমিতে যে পরিমাণ আর্দ্রতা থাকা দরকার বড় আকৃতির বারিমুগ-৫ জাতের বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য তদপেক্ষা দ্বিগুণেরও

বেশি আর্দ্রতার প্রয়োজন। অতএব বারিমুগ-৫ জাতের বীজ ব্যবহার করলে জমিতে বপনের পরপরই একটি হালকা সেচ প্রদান উপকারি হতে পারে। সেচ দেয়ার কয়েকদিন পর নিড়ানি বা খুরপি দিয়ে উপরের শক্ত স্তর ভেঙে দিতে হয়।

অতিবৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। মুগকলাইয়ের জন্য অতিরিক্ত খরা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই এ ফসলের জন্য ক্ষতিকর।

বিশেষ পরিচর্যা

(১) চারা গজানো পরে জমিতে আগাছা দেখা গেলে ১৫ থেকে ২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়।

(২) মুগকলাই চাষাবাদের জন্য সাধারণ অবস্থায় পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে জমিতে পানির অভাব হলে একবার পানি সেচ দেওয়া ভাল।

(৩) ছত্রাকজনিত রোগের বেশি আক্রমণ হলে ডায়থেন এম-৪৫ (প্রতি লিটারে ২ গ্রাম) বা অন্য ছত্রাকনাশক ফসলী জমিতে স্প্রে করা উচিত।

(৪) প্রতি কেজি বীজ ১.৫ ব্যাভিস্টিন দ্বারা শোধন করতে হয়।

(৫) পোকা আক্রমণ হলে ডাইমেক্রন ১০০ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ইত্যাদি কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করতে হয়।

৫. ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ

বিনামুগ-১, বিনামুগ-৩ ও বিনামুগ-৪, এর ফল এক সাথে পরিপক্ব হয় এবং একসাথে সংগ্রহ করা সম্ভব। ফসল কাটার সময় কাঁচি দিয়ে গোড়া থেকে গাছগুলো কেটে নিতে হয়। এরপর গাছ ভালভাবে শুকিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত বীজ রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার করে মাটি বা টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়।

৬. বারি মুগকলাই চাষ পদ্ধতি

জমি নির্বাচন ও তৈরি : বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ জমিতে এ জাত বপনে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বৃষ্টি বা অন্য কারণে জমিতে পানি জমে গেলে দ্রুত নিকাশনের ব্যবস্থা করতে হয়। জমিতে জো মতো ২-৩টি চাষ মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। সাথে সাথে মাটির ঢেলা ভেঙে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। বর্ষার শেষে নরম মাটিতে বীজ বুনলে জমিতে চাষ না দিলেও চলে। তবে সেক্ষেত্রে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয় এবং ফলন কম হয়।

চাষ দেওয়ার পর নির্ধারিত পরিমাণ ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমপি সার ছিটিয়ে দিতে হয়। জমিতে রসের অভাব হলে একটি হালকা সেচ দেওয়া ভাল।

বীজ বপন : ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম থেকে মধ্য মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বীজ বপন সম্পন্ন করতে হয়। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

বপন পদ্ধতি : মুগকলাই প্রধানত ছিটিয়ে বোনা হয়। বপনের পর ভালভাবে মই দিয়ে বীজগুলো ঢেকে দিতে হয়।

বীজের হার : মতভেদে হেক্টর প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ কেজি বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়। সারিতে বপন করলে এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হয় ৩০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়।

সাধারণ সার প্রয়োগ : মুগকলাই চাষের জন্য সার পরিমাণে কম লাগে। শুঁটিজাতীয় ফসল হওয়ায় মুগকলাই বাতাসের নাইট্রোজেন গ্যাস আহরণ করে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এর ফলে মুগকলাই চাষে ইউরিয়া লাগে। তবে জমিতে চারা স্থায়ী হওয়া ও নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সক্ষম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ইউরিয়া সার প্রয়োজন হয়।

প্রতি হেক্টরে সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ	প্রয়োগের সময়
জৈব সার	২ থেকে ৩ টন	জমি তৈরির সময়
ইউরিয়া	৪০ থেকে ৫০ কেজি	"
টিএসপি	৯০ থেকে ১১০ কেজি	"
এমপি	৫০ থেকে ৬০ কেজি	"
ডলোচুন	৪০০–৭০০ কেজি	"
জিপসাম	৫০ থেকে ৭০ কেজি	কেবল ঘাটতিপূর্ণ জমিতে
জিঙ্ক সালফেট	১৫ থেকে ২০ কেজি	প্রয়োজনে স্প্রে

মুগকলাইয়ের জন্য উর্বরতাভিত্তিক বিএআরসি এর মাধ্যমে অনুমোদিত সুপারিশমালা উল্লেখ করা হলো। এই সুপারিশ থেকে মাটির উর্বরতা বিষয়ক বিশ্লেষণ তথ্য ও ফলন মাত্রাভিত্তিক নির্দিষ্ট সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়।

বিএআরসি অনুমোদিত সার সুপারিশ

সকল জাতের ক্ষেত্রে ফলন লক্ষ্যমাত্রা : গড় ফলন

ভূমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	B
উত্তম	০-৬	০-৪	০-৫	০-৩	-	-
মধ্যম	৭-১২	৫-৮	৬-১০	৪-৬	০-.৬	০-.৩
কম	১৩-১৮	৯-১২	১১-১৫	৭-৯	.৭-১.২	.৪-.৬
খুব কম	১৯-২৪	১৩-১৬	১৬-২০	১০-১২	১.৩-২	.৭-১

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনবোধে দস্তা ও বোরন সার স্প্রে করা যায়।

৭. মুগের ফসল বিন্যাস

মুগকলাই মূলত একটি শুষ্ক সময়ের ফসল। মাঝারি উঁচু ও উঁচু জমিতে প্রায় সারা বছর অন্যান্য ফসল বিন্যাসের সাথে খাপ খাইয়ে চাষাবাদ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব প্রধান প্রধান ফসল বিন্যাস মুগকলাই চাষাবাদে হয় তার উল্লেখ করা হলো।

(১) বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠি অঞ্চল :

আউশ-রোপা আমান-মুগ।

(২) যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল :
রবি ফসল (সরিষা)- মুগডাল-রোপা আমন/তুলা।

(৩) বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল :
মুগ-রোপা আমন-পতিত এবং
বোনা আউশ-রোপা আমন-মুগ।

(৪) পাবনা, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল
পাট-মুগ-ছোলা/মশুর/গম আউশ/পাট-মুগ-রবিশস্য।

(৫) ঢাকা, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চল
পাট-মুগ-রবিশস্য।

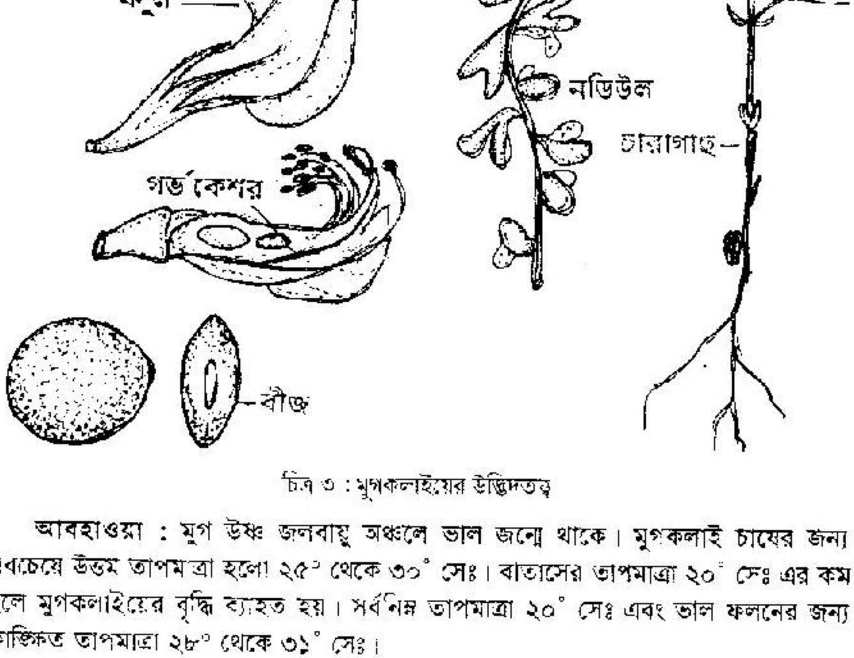

চিত্র ৩ : মুগকলাইয়ের উদ্ভিদতত্ত্ব

আবহাওয়া : মুগ উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে ভাল জন্মে থাকে। মুগকলাই চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম তাপমাত্রা হলো ২৫° থেকে ৩০° সেঃ। বাতাসের তাপমাত্রা ২০° সেঃ এর কম হলে মুগকলাইয়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০° সেঃ এবং ভাল ফলনের জন্য কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রা ২৮° থেকে ৩১° সেঃ।

এ ফসলকে কিছুটা খরা সহিষ্ণু ফসল বলা হয়ে থাকে। তবে মুগকলাই উজ্জ্বল রোদ ও অপেক্ষাকৃত কম আর্দ্রতাপূর্ণ পরিবেশে ভাল জন্মে।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মুগকলাই সহ্য করতে পারে না। মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশি কমে গেলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এর ফুল ও ফল কম হয়। জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলেও ফুল ধরা কমে যায়।

বপনের সময় : ঋতুভিত্তিক ও অঞ্চলভেদে বছরের ৩টি সময়ে বাংলাদেশে মুগকলাই বপন করা হয়ে থাকে।

(১) **দক্ষিণাঞ্চল : বিলম্ব রবি** : জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

(২) **উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল : খরিফ-১** : ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

(৩) **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল : খরিফ-২** : আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত।

ফসল বিন্যাসভেদে জমি তৈরি

বপন ও মাটির প্রকারভেদের উপর জমি নির্ভর করে। একক ফসল হিসেবে মুগকলাইয়ের চাষ করা হলে ২-৩টি চাষ ও ৪ থেকে ৫ বার মই দিয়ে জমি তৈরি করলে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বাড়ে। ফসলের বৃদ্ধিও ভাল হয়। দানাজাতীয় ফসলের জন্য তৈরি করলেই চলে। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৪টি চাষ ও উত্তম রূপে মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি : বাংলাদেশে মুগ-এর চাষ একক, আন্তঃ মিশ্র ও সাথী ফসল হিসেবে করা হয়ে থাকে। এদেশে একক ফল হিসেবে এর বপন পদ্ধতি দু' ধরনের যথা- ছিটানো ও সারি পদ্ধতি।

(১) সারি করে মুগ চাষ করলে ছিটানো পদ্ধতির চেয়ে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

(২) সারিতে বীজ বপন করলে প্রতিটি গাছ সমানভাবে বেড়ে উঠতে পারে।

(৩) গাছের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যেমন- সূর্যালোক, পুষ্টি উপাদান ও পানি সমানভাবে পেতে পারে। ফলে ফলন বৃদ্ধি পায়।

(৪) সারি পদ্ধতির সুবিধা-সারি করে বপন করলে মাঠে অর্ন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, রোগ, পোকা, স্প্রে ইত্যাদি সঠিকভাবে করা যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার, এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেন্টিমিটার হলে ফলন বেশি হয়।

বীজ বপন গভীরতা : বীজ কিছুটা গভীরতায় বপন করলে অঙ্কুরোদগম ভাল হয়। মাটির আর্দ্রতা পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকলে জমির উপরিভাগ হতে কমপক্ষে ৫ সেন্টিমিটার নিচে বপন করতে হয়। বীজ সঠিকভাবে বপন করার জন্য বীজবপন স্প্রে ব্যবহার করলে সময় ও বীজ তুলনামূলকভাবে কম লাগে। তাতে বীজ বপন গভীরতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মুগ-এর বীজ বপন করার সময় খেয়াল রাখতে হয় যে, বীজগুলো যাতে মাটির কিছুটা অভ্যন্তরে পৌছে। এভাবে বীজ বপন করলে, বীজের অপচয় কম হয় এবং অঙ্কুরোদগম ভাল হয়।

৮. বারি মুগকলাইয়ের উৎপাদন প্রযুক্তি (সারমর্ম)

মৃত্তিকা : বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ।

বীজ বপন সময় : জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি; আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর (দক্ষিণাঞ্চল)

বীজ হার : ২৫-৩৫ কেজি/হেক্টর।

সারি থেকে সারির দূরত্ব : ২৫ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার।

গাছ থেকে গাছের দূরত্ব : ৪ থেকে ৭ সেন্টিমিটার।

প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা : ৩৫ থেকে ৪৫।

পরিচর্যা : বীজ বপনের ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করতে হয়।

পোকা দমন : ফল মাজরা, জাবপোকা ও সাদা মাছির আক্রমণ হলে তা দমনের ব্যবস্থা করতে হয়।

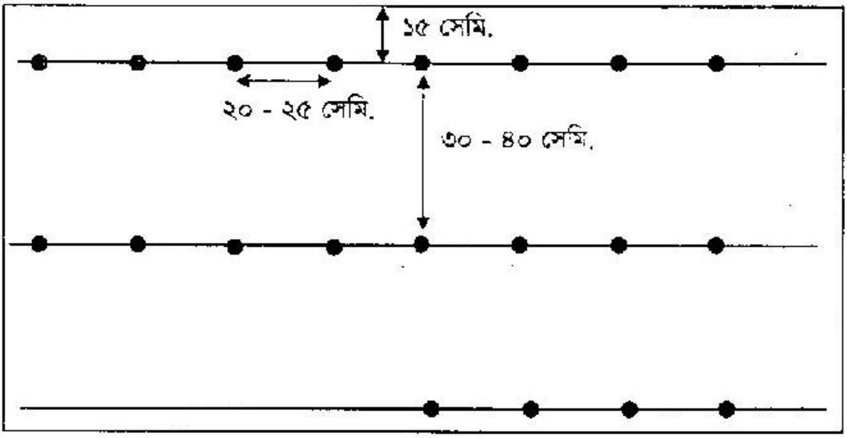

চিত্র ৪ : মুগকলাইয়ের বীজবপন গভীরতা

রোগ দমন : সারকোসপোরা পাতায় দাগ, এনথ্রাকনোজ, মরিচা রোগ, শুকনা পচা রোগ, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতায় দাগ ও হলদে মোজাইক ভাইরাস দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

৯. সমন্বিত রোগ-পোকা দমনের কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা

মুগকলাই চাষাবাদে রোগ ও পোকা আক্রমণ গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত ফসলের অনেক রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে মাঠের ফসল আক্রমণকারী ১০টি প্রধান রোগ এবং গুদামজাত অবস্থায় আক্রমণকারী ৩টি রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। এখানে প্রধান প্রধান রোগের কৃষিতাত্ত্বিক ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনাসমূহ আলোচনা করা হলো :

১০. রোগ দমন

ক. হলুদ মোজাইক রোগ : হলুদ মোজাইক মুগকলাইয়ের মারাত্মক ভাইরাসজনিত সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। মুগ আবাদী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব ক'টি দেশেই এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক গাছ পর্যন্ত ফসলের যে কোনো অবস্থায়ই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। তবে আক্রমণ আট সপ্তাহ বা বেশি বয়সের মুগ ক্ষেতে তেমন কোনো ক্ষতি করে না। এর কম বয়সের ফসলে ৮৫% পর্যন্ত ফলন কমে যেতে

পারে। এমনকি এক থেকে দুই সপ্তাহ বয়সের মুগ ফসল আক্রান্ত হলে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ ফলন বিনষ্ট হতে পারে। এই রোগের আক্রমণকারী ভাইরাস সাদা মাছি দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

আক্রান্ত পাতার রঙ সবুজ হলদে মিশ্র রঙ এ রোগের প্রধান লক্ষণ। জাতভেদে এ রোগের লক্ষণের কিছুটা তারতম্য হলেও এরূপ হলুদ হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতির হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা, ফুল ও ফল কুঁকড়ে যায় এবং ফলের আকার ছোট হয়। বীজ অপুষ্ট ও কোঁকড়ানো হয়। বেশি আক্রান্ত গাছে ফুল ফল মোটেই ধরে না বা খুবই কম ধরে থাকে।

দমন পদ্ধতি : এ রোগটির ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিরোধী কোনো জাতের উদ্ভাবন করা যায়নি। মুগের জাত কান্তি (বারিমুগ-২), বারিমুগ-৪ এবং বারিমুগ-৫ জাতসমূহ রোগটির প্রতি মোটামুটি সহনশীল।

এপ্রিল মাসে বপনকৃত ফসলে সেপ্টেম্বর মাসে বপনকৃত ফসলের তুলনায় এ রোগের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কম হতে দেখা যায়।

খ. পাতার সারকোস্পোরা দাগ রোগ : সারকোস্পোরা দাগ মুগকলাই পাতার একটি খুবই অনিষ্টকারী রোগ। এই রোগ অনুকূল আবহাওয়ায় মুগের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এ রোগ "*Cercospora cruenta*" বা *Cercospora canascens* নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। ছত্রাক জীবাণু আক্রান্ত ফসলের পরিত্যক্ত আবর্জনার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট পানি ভেজা আলপিনের মাথার সমান দাগের আকারে প্রকাশ পায়। পরে এই দাগগুলো বাদামি বা লালচে বাদামি রঙ ধারণ করে ক্রমশ বড় হতে থাকে। একাধিক দাগ এক সাথে মিশে বড় দাগের সৃষ্টি হতে পারে। চারদিকে বাদামি রঙ বলয়যুক্ত এবং কেন্দ্রের কিছুটা অংশ সাদা হয়। খুব বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হলে গাছের পাতা ঝরে যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) রোগের জীবাণু ফসলের আক্রান্ত অংশে বেঁচে থাকতে পারে বিধায় আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা যাতে ভালভাবে পচে যায় সে ব্যবস্থা করতে হয় অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

(২) মুগের জাত কান্তি, বারিমুগ-৩, বারিমুগ-৪ ও বারিমুগ-৫ রোগে কম আক্রান্ত হয়। এসব জাতের চাষ উৎসাহিত করতে হয়।

(৩) তীব্র অবস্থায় রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে বেভিস্টিন-৫০ ডব্লিউপি নামক ওষুধ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম অর্থাৎ ০.১% হারে মিশিয়ে ৭ থেকে ১২০ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

পাউডারি মিলডিউ রোগ : ছত্রাকজনিত পাউডারি মিলডিউ মুগ ও মাশকলাই উভয় ফসলকেই আক্রমণ করে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মুগ ও মাশকলাইতে এ রোগ আক্রমণ করে থাকে।

পাউডারি মিলডিউ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে মুগের একটি প্রধান রোগ হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশে এ রোগটি খরিফ-২ আবাদ মৌসুমে বেশি আক্রমণ করে। এটি বেশি দেরিতে রোপিত ফসলের বেশি ক্ষতি করে থাকে। এই রোগের জীবাণু *Erysiphe polygony* বা *Oidium* sp. নামক ছত্রাক। প্রধানত বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয়ে থাকে।

এ রোগ সর্বপ্রথম পাতার উপরে ছোট ছোট সাদা হাল্কা পাউডার দাগের আকারে প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে এ দাগ থেকে আরো অসংখ্য অনুরূপ পাউডারি দাগের সৃষ্টি হয় এবং পাতার উপরের পুরো অংশ আক্রান্ত হয়ে যায়।

পরে পাতা থেকে কাণ্ড ও ফল-ফুল প্রভৃতি অংশেও আক্রমণ বিস্তার লাভ করে। পাতার উপরের সাদা পাউডার ক্রমে ছাই রঙ ধারণ করে এবং পরিশেষে তা কালো বা গাঢ় বাদামি রঙের পাউডারে পরিণত হয়। পাতার সবুজ রঙ পরিবর্তিত হয়ে ছাই রঙে পরিণত হয়।

দমন পদ্ধতি : এ রোগের প্রতিরোধী কোনো জাতের উদ্ভাবন এখনো করা যায়নি। তবে আগাম বোনা ফসলে এ রোগের আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। আক্রমণ বেশি হলে ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেও এ রোগ দমন করা যায়। টিল্ট-২৫০ ইসি.০২% অথবা থিওভিট ৮০ ডব্লিউ, পি ০.২% হারে পানিতে মিশিয়ে রোগের আক্রমণের শুরু থেকে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করলে এই রোগ দমন করা যায়।

পাতা পচা রোগ : সাম্প্রতিককালের মুগ ফসলে ছত্রাকজনিত এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের জমিতেও এর আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

এ রোগের আক্রমণের শুরুতে পাতার উপর পানিতে ভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। উষ্ণ ও মেঘলা আবহাওয়ায় দাগের আকারে বৃদ্ধি পেয়ে পাতার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। শুকনা দিনে আক্রান্ত পাতাগুলো শুকিয়ে বাদামি রঙ ধারণ করে। শুকনা আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম দেখা যায় এবং পরে বিভিন্ন আকারের স্কেরোশিয়াম তৈরি হয়। স্কেরোশিয়াম প্রথমে সাদা রঙের থাকে এবং পুরোমাত্রায় পরিপক্কতা আসলে গাঢ় বাদামি বা কালো রঙ ধারণ করে।

এ রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক *Sclerotinia sclerotium* মাটিতে থাকে। আক্রান্ত গাছের উপর ছত্রাকের স্কেরোশিয়াম তৈরি করে। স্কেরোশিয়াম মাটির সাথে মিশে মাটিতে থেকে যায়। উপযুক্ত আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত হয়ে অ্যাস্কোকার্প তৈরি করে। পরিপক্ক অ্যাস্কোকার্প বিস্ফোরিত হয়ে জীবাণু শস্যকে আক্রমণ করে।

দমন পদ্ধতি : রোগ দমনের জন্য জমিতে আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা এবং স্কেরোশিয়াসমূহ পরিপক্ব হয়ে পড়ে যাওয়ার পূর্বে পরিষ্কার করা দরকার।

১১. পোকা দমন

বাংলাদেশে মুগ ফসল আক্রমণকারী অনেক প্রজাতির অনিষ্টকারী পোকা শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে দশটি প্রজাতি মাঠ পর্যায়ে আক্রমণ করে। মাঠে আক্রমণকারী পোকার মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিকর হলো বিছাপোকা ও শুঁটি মাজরা পোকা। বিছাপোকার আক্রমণে হেক্টরে প্রতি ১৮৫ থেকে ৬৫০ কেজি পর্যন্ত ফলন কম হতে পারে।

বিছাপোকা : পূর্ণবয়স্ক মথ মাঝারি আকৃতির। গায়ের রঙ ঈষৎ সবুজ বর্ণের এবং সামনের পাখনায় কালো দাগ আছে। পূর্ণাঙ্গ শূককীটের গায়ে অসংখ্য লোম থাকায় এগুলো বিছাপোকা নামে পরিচিত। বিছার গায়ের রঙ কমলা এবং দেহের দু'প্রান্ত কালো। পুরুষ এবং স্ত্রী মথ দেখতে একই রকমের, তবে পুরুষ মথ স্ত্রী মথের চেয়ে আকারে ছোট। একটি স্ত্রী মথের ডানার বিস্তৃতি ৫০ মিলিমিটার। পূর্ণবয়স্ক বিছাপোকা ৪০ থেকে ৫০ মিলিমিটার লম্বা হয়ে থাকে।

কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা : বিছাপোকা অনেক উপায়ে দমন করা সম্ভব। পরজীবী পোকা *(Adanteles obliqua)* এবং পলিএড্রাল ভাইরাস দিয়ে এই পোকা দমন করা যায়। অনেক রকম দেশি গাছ-গাছড়া যেমন নিম, ধুতরা, বিষকাটালি প্রভৃতির রস বিছাপোকার উপর ছিটালে পোকা দমন হয়। এ ছাড়া নিম্নলিখিত উপায়ে বিছাপোকা দমন করা যায়।

(১) আক্রমণের প্রথম অবস্থায় যখন পোকা দলবদ্ধভাবে একটি পাতায় থাকে তখন পোকাসহ পাতাটি ছিড়ে পায়ে দলে মেরে ফেলতে হয়।

(২) শূককীটকে নিয়ন্ত্রণ করা বেশ কষ্টকর। এ সময় শূককীটগুলো বেশি চলাচল করে এবং ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে। তখন ক্ষেতের চারদিকে নালা তৈরি করে তার মধ্যে কেরোসিন মিশিয়ে রাখলে চলাচলের সময় ডুবে মারা যায়।

(৩) ডায়াজিনন ৫০ ইসি বা নুভাক্রন ৪০ ডব্লিউ এস সি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি লিটার শুধু মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে এ পোকা দমন করা যায়।

(৪) জরুরিভিত্তিতে বিছাপোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক যেমন- নগস ১০০ ইসি অথবা ডিডিভিপি ১০০ ইসি অথবা ভেপনা ১০০ ইসি অথবা ডাইক্লোরোভস ১০০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার মিশিয়ে ব্যবহার করলে পোকা দমন হয়।

ইপিলেকনা বিটল *(Epilachna)* **:** গাছের পাতা ও কচি বোঁটার রস চুষে খায়। পোকা দমন বিছাপোকার অনুরূপ ওষুধ প্রয়োগ ও হাতে বাছাই।

ফল মাজরা পোকা (Pod borer) : পূর্ণবয়স্ক মথ গাঢ় বাদামি রঙের। ডানার বিস্তৃতি ২৫ থেকে ৩০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। সামনের পাখনায় হাল্কা অর্ধচক্রাকারে সাদা দাগ দেখা যায়। পিছনের পাখনা ধূসর সাদা এবং মাথায় হাল্কা বাদামি দাগ আছে। মূককীটের দেহ ময়লা অথবা হলুদাভ সাদা। দেহে ঘন দাগ আছে। শূককীট লম্বায় ১৮ থেকে ২০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের সবুজ শুঁটি ও ফুলের কুঁড়ি ছিদ্র করে খেয়ে থাকে।

ক্ষয়-ক্ষতির লক্ষণ : পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী কুড়ি, ফুল ও শুঁটির উপর একটি একটি করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বের হয়ে পুষ্পমঞ্জরি খেতে থাকে। এগুলো ফল ছিদ্র করে ভিতরের কচি বীজ খেয়ে থাকে।

কৃষিতাত্ত্বিক দমন পদ্ধতি

(১) এই পোকা অনেক ডাল ফসলের মুখ্য পোকা। এজন্য একটি জমিতে সারা বছর ডাল ফসল বপন না করাই ভাল।

(২) কীটনাশক ব্যবহার আবহাওয়া দূষণ করে। এজন্য যতোটা সম্ভব পোকা প্রতিরোধী জাত বপন করা প্রয়োজন।

(৩) ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে এ পোকা দমন করা সম্ভব।

(৪) সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের রিপকর্ড ১০ ইসি, অথবা সিমবুশ ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি লিটার ওষুধ মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

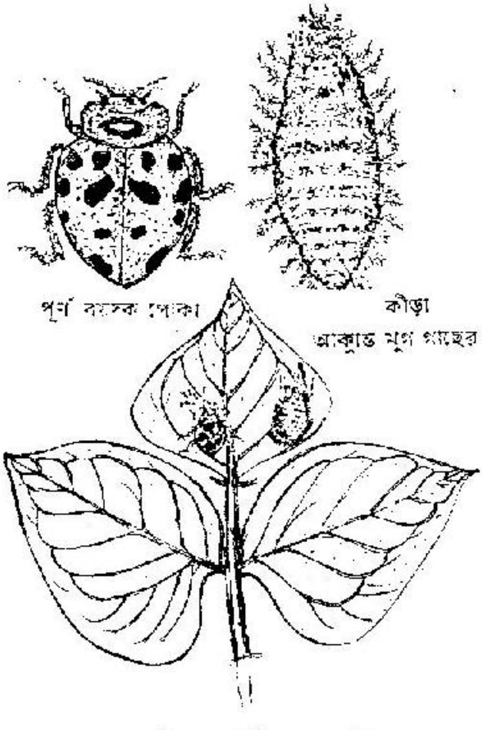

চিত্র ৫ : ইপিলেক না বিটল

ফল শোষী পোকা : মৌসুমের শেষ দিকে ফল ও পাতার রস চুষে খায়। বংশ বিস্তার খুব দ্রুত হতে পারে। ফল উৎপাদনের পর পরই আক্রমণ হলে ফলন দ্রুত কমতে পারে। প্রতিকার ফল মাজরার অনুরূপ।

ব্রুকিড (Bruchid) পোকা : এই পোকা দেখতে গোলাকার এবং গাঢ় বাদামি রঙের। মুখের দিকে ক্রমশ সরু গাঢ় বাদামি রঙের দুটি শুঁড় আছে। করাতের মতো লম্বা শুঙও আছে। পূর্ণবয়স্ক শূককীট ক্রিম-সাদা রঙের এবং ৬ মিলি মিটার লম্বা হয়ে থাকে।

গুদামজাত অবস্থায় আক্রমণকারী বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। কেবল মুগকলাইতে নয় সব ধরনের গুদামজাত ডাল ফসলেই এই পোকা আক্রমণ করে থাকে।

পূর্ণবয়স্ক পোকা গুদামের বীজের উপরিভাগে ডিম পাড়ে। এগুলো বীজ ছিদ্র করে খায় এবং বীজের ভিতরেই মূককীটে পরিণত হতে এগুলোর ১০ থেকে ৩৮ দিন সময় লাগে।

দমন পদ্ধতি

(১) ফসল কাটার পর খুব ভালভাবে রোদে শুকিয়ে ডাল ড্রামে রেখে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(২) অল্প পরিমাণ ডাল বীজ গুদামে রাখতে হলে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫ মিলি লিটার নিমের তেল বীজের সাথে মিশিয়ে দিলে ৩ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত রাখা যায়।

(৩) বীজের পরিমাণ বেশি হলে ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রতি টন খোলা বীজের জন্য ৩ থেকে ৬টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হয়। বস্তা ভর্তি বীজের জন্য টন প্রতি ৩টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করলে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৪) মাঠে এ পোকার আক্রমণ দেখা গেলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ফলিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার মিশিয়ে ছিটিয়ে দিলে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

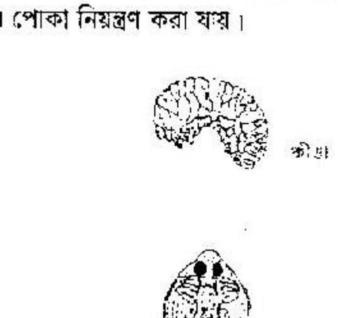

চিত্র ৬ : ব্রুকিড পোকা

১২. ডাল ফসলে জীবাণু সার ও তার ব্যবহার

জীবাণু যখন মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর নিমিত্তে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে জীবাণু সার বলা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি : দু'রকমভাবে জীবাণু সার ব্যবহার করা হয়।

(১) প্রথমে আঠালো তরল বস্তু (যেমন-চিটাগুড়, ভাতের মাড়) জীবাণু সারের সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে পরিমাণমতো বীজ এই আঠালো দ্রবণে মেশানো

হয়। এতে জীবাণু বীজ বরণের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। তরল বস্তুটির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে বীজ ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বপন করা হয়। জীবাণু সার মিশানো বীজ রোদে শুকানো উচিত নয়, কারণ এতে জীবাণু সার উবে যায়।

(২) এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজ চিটাগুড়ের সাথে মেশানো হয় এবং পরে জীবাণু সার চিটাগুড় মিশ্রিত লালচে বীজে মেশানো হয়। পদ্ধতিটি সহজতর ও সুবিধাজনক বিধায় এর বিভিন্ন ধাপ (এক কেজি মুগ বীজের জন্য) পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো:

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

(১) বীজ : সুস্থ সতেজ ও শুকনো ১ (এক) কেজি।
(২) চিটাগুড় : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩ – ৫% বড় বীজ ২ – ৩%)
(৩) জীবাণু সার : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩ – ৫% বড় বীজে ২ – ৩%)।
(৪) পলিথিন ব্যাগ/গামলা/ছোট বালতি : ১টি।
(৫) পরিবেশ রোদবিহীন/ছায়াময় পরিবেশ।

ব্যবহার পদ্ধতি

(১) পলিথিন ব্যাগে ১ কেজি বীজে ৫০ গ্রাম চিটাগুড় মিশিয়ে নিতে হয়।
(২) চিটাগুড়ের অভাবে ভাতের ঠাণ্ডা মাড় ব্যবহার করা যায়।
(৩) আঠালো বীজগুলোর সঙ্গে জীবাণু সার ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়– যাতে বীজে একটি কালো প্রলেপ পড়ে যায়।
(৪) প্রথম বার অর্ধেক জীবাণু সার দিয়ে মিশিয়ে অবশিষ্ট জীবাণু সার দ্বিতীয় বার মেশালে মিশ্রণ ভাল হয়।
(৫) এতে বীজে কালো প্রলেপ সমভাবে পড়ে।
(৬) জীবাণু সার মিশানো বীজ দলা হয়ে থাকলে ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকে।
(৭) বেশি শুকালে বীজ থেকে জীবাণু সার পড়ে যায় এবং বীজ প্রতি জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়।
(৮) জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রোদহীন বা খুব অল্প রোদে বপন করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বপনকৃত বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।
(৯) ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও রোদমুক্ত স্থানে জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রাখতে হয়।
(১০) কীটনাশক বা রোগনাশক ওষুধ মিশ্রিত বীজে জীবাণু সার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়, তবে উক্ত বীজ ভালভাবে ধুয়ে জীবাণু সার ব্যবহার করা যায়।
(১১) জীবাণু সার উৎপাদনের ৯০ দিনের মধ্যে তা ব্যবহার করতে হয়।

১৩. মুগকলাই কর্তন, শুকানো, মাড়াই ও ব্যবস্থাপনা

শুঁটি বা পড বাদামি বা কালো রঙ হলে বুঝতে হয় পরিপক্ব হয়েছে। সমস্ত ফসল বা শুঁটি এক সাথে পাকে না। ২ থেকে ৩ বারে শুঁটি সংগ্রহ করতে হয়। সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। ডালজাতীয় ফসল বিলম্বে কর্তন করলে দানা ঝরে যায়। নিচে ডালের সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

(১) পরিপক্ক ফল জমিতে অধিক সময় না রেখে সময়মতো সংগ্রহ করে সরাসরি মাড়াই স্থানে নেওয়া দরকার।

(২) ফসল সংগ্রহের জন্য কর্তনের পরপরই কর্তনকৃত ফসল ব্যাগে অথবা দানা পড়ে না যায় এরূপ পাত্রে মাঠ থেকে সংগ্রহ করে মাড়াই স্থানে নেওয়া প্রয়োজন।

(৩) পরিপক্ক ফসল যাতে ইঁদুর বা পাখি নষ্ট না করে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

মাড়াই ও শুকানো স্থান পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাড়াই ও শুকানোর জন্য পলিথিন শিট, পাকা ফ্লোর বা মাটির উপর গোবরের প্রলেপ ব্যবহার করা যেতে পারে। মাড়াই ও শুকানোর স্থান অবশ্যই জীবাণু মুক্ত হতে হয়। মাড়াই স্থানের পোকা মেরে ফেলতে হয়।

মাড়াই : মুগকলাইয়ের ফল লাঠির আঘাতে মাড়ানোই উত্তম। হাতের তালুতে ফসলের ছড়া নিয়ে ঘষা দিলে মচ মচ শব্দ হলেই বুঝতে হয় যে মাড়াইয়ের সময় হয়েছে। অধিক পাকলে দানা ঝরে যায়। লাঠি দ্বারা খুব সাবধানে পিটিয়ে মাড়াই করতে হয়।

দানা পরিষ্কারকরণ : দানা পরিষ্কারকরণে নিম্নলিখিত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যেমন–

(১) দানা সবসময় পরিষ্কার স্থানে শুকানো দরকার।

(২) প্রবল বাতাসে দানা ঝাড়াই উচিৎ নয়।

(৩) ঝাড়াই কাজে বাঁশের কুলা ব্যবহার করাই উত্তম।

(৪) সঠিক মাপের চালুনি দিয়ে দানা চেলে নিতে হয়।

গুদামজাতকরণ : গুদাজাতকরণে নিম্নলিখিত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যথা–

(১) মাড়াইকৃত বীজ পরিষ্কার করে সূর্যের তাপে শুকিয়ে গুদামজাত করতে হয়।

(২) শুকনো বীজ দাঁতের সাহায্যে পরীক্ষা করে বোঝা যাবে উত্তমরূপে শুকানো হয়েছে কি-না।

(৩) শুকানোর সময় হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ক্ষতি এড়াতে পলিথিন শিট ব্যবহার করা উত্তম।

(৪) আর্দ্র বীজ ছড়িয়ে রাখা উচিত।

(৫) বৃষ্টির পর বীজ পুনরায় শুকিয়ে নিতে হয়।

গুদামজাতকরণের পাত্র : আর্দ্রতা নিরোধক পাত্রে শুকনা বীজ গুদামজাত করা উচিত। মাটির পাত্র, ধাতব টিন বা ড্রাম ব্যবহার করা উত্তম। আর্দ্রতা বেড়ে ও পোকার আক্রমণে যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ, চটের ব্যাগ বা কাঠের বাক্সও ব্যবহার করা যায়। তবে কোনো ভাবেই যাতে পোকার আক্রমণ না ঘটে সে দিকে নজর রাখতে হয়।

গুদামজাতের জন্য আর্দ্রতা সংরক্ষণ : বীজ ৮% থেকে ৯% আর্দ্রতার নিচে দিয়ে চিবিয়ে শক্ত মনে হলে বুঝতে হয় যে বীজের আর্দ্রতা সঠিক পরিমাণে রয়েছে।

গুদামে পোকা দমন : পালস্ বিটল সবচেয়ে ক্ষতিকর পোকা। পোকার আক্রমণ কমানো বা বন্ধ করার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা নেওয়া যায়–

(১) গুদামজাতকরণের পূর্বে ভালভাবে বীজ পরীক্ষা করতে হয়। ১০ গ্রাম ওজনের তিনটি নমুনা বিভিন্ন স্থান থেকে নিয়ে দেখতে হয় পোকা ও পোকাজনিত ক্ষতির

কোনো লক্ষণ আছে কি-না– সে হিসেবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোনো পোকা না পাওয়া গেলে মাটির বা ধাতব পাত্রে মজুদ করতে হয়।

(২) বীজ ৮% থেকে ৯% আর্দ্রতায় বায়ু ও আর্দ্রতা নিরোধক পাত্রে গুদামজাত করতে হয়।

(৩) বীজের নমুনায় ২টি পূর্ণাঙ্গ পোকা বা ৪টি ডিম পাওয়া গেলে যথাশীঘ্র দমন ব্যবস্থা নিতে হয়।

(৪) গুদামের প্রতি শস্যের জন্য ৮ মিলি নিম তেল শুকনা বালিসহ পাত্রের উপরের অংশে ঢেলে পাত্র/ব্যাগের মুখ বন্ধ করে দিতে হয়।

(৫) অনুমোদিত মাত্রায় প্রিমিফস মিথাইল ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

গুদামে ছত্রাক দমন : মুগকলাইয়ে সহজেই ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে। অধিক গরম ও আর্দ্রতা ছত্রাকের জন্য সহায়ক। ছত্রাক স্বাদ ও পুষ্টি হ্রাস করে এবং টক্সিন উৎপন্ন করে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ছত্রাক দমনের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) গুদামজাতের পূর্বে ভালভাবে ঝেড়ে ভাঙ্গা দানা ও আবর্জনা আলাদা করতে হয়।

(২) অনুমোদিত আর্দ্রতায় (৮% থেকে ৯%) আর্দ্রতা নিরোধক পাত্রে গুদামজাত করতে হয়।

(৩) গুদামজাত পাত্র সবসময় ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হয়।

গুদাম পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ : এ কাজের নিম্নলিখিত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যথা–

(১) গুদামজাতকৃত শস্য নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করতে হয়।

(২) আর্দ্রতা ও পোকা নিরোধক পাত্রে বীজ রাখলে পোকার আক্রমণ ও আর্দ্রতা যাতে না বাড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

(৩) গুদামে পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য মাঝে মাঝে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক ছিটাতে হয়।

(৪) বীজের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে পুনরায় বীজ শুকিয়ে গুদামজাত করতে হয়।

১৪. মুগকলাইয়ের ফসল বিন্যাস

মুগকলাই চাষের প্রধান প্রধান ফসল বিন্যাস হচ্ছে–

বারিমুগ-১

মুগ-আউশ-রবিফসল
মুগ-পাট-রবিফসল
বীজ বপন সময় : মার্চ-এপ্রিল

বারিমুগ-২

আউশ-মুগ-রবিফসল
পাট-মুগ-রবিফসল
বীজ বপন সময় সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর (দেশের দক্ষিণাঞ্চল)
রোপা আমন-মুগ-আউশ
বীজ বপন সময় : জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

১৫. মুগাঙ্কুর সবজি

বাংলাদেশে মুগের প্রধান অংশ 'ডাল' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে উৎপাদিত মুগের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশে ডাল ফসলের মধ্যে মুগের মূল্য সবচেয়ে বেশি।

মুগ বীজ থেকে তৈরি মুগের অঙ্কুর চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, তাইওয়ানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে একটি উপাদেয় সবজি। এই দেশগুলোতে মুগাঙ্কুর উৎপাদন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমের দেশগুলোর খাদ্যে মুগাঙ্কুরের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে খাদ্য হিসেবে এখনও এর ব্যবহার যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেনি।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'মুগাঙ্কুর' একক খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মুগাঙ্কুর থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাবার তৈরিসহ মাছ মাংস ও অন্যান্য সবজি ঘাটতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে মুগ বীজ থেকে ঘরে তৈরি 'মুগাঙ্কুর' সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে মুগাঙ্কুর একটি রপ্তানিমুখী বাণিজ্য সামগ্রী হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুগাঙ্কুর তৈরি : মুগাঙ্কুর উৎপাদন একটি অতি সহজ পদ্ধতি। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য সূর্য রশ্মি বা মাটির প্রয়োজন হয় না। যার ফলে এটি মৌসুম বা আবহাওয়া নির্ভর নয়। পুরো পদ্ধতি সম্পন্ন হতে ৭ থেকে ৮ দিন সময় লাগে। এর জন্য শুধু মুগ বীজ, অঙ্কুরোদগমের পাত্র ও পানির প্রয়োজন। তবে উৎকৃষ্ট মানের অঙ্কুর পেতে হলে বিশুদ্ধ পানি, পরিষ্কার বীজ ও পাত্র ব্যবহার করা আবশ্যক।

বীজ থেকে অঙ্কুর বের হওয়ার পর ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণ হতে পারে– তাতে অঙ্কুরের গুণগত মান হ্রাসের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ থাকতে হয়।

উৎপাদনের সম্পূর্ণ পদ্ধতিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে। নিচে তা দেখানো হলো -

(১) মুগবীজ বাছাই ও পরিষ্কারকরণ-পাত্রে বীজ ভিজানো-অঙ্কুরোদ্গাম।
(২) মুগাঙ্কুর-প্যাকিং-অঙ্কুর ধৌতকরণ-অঙ্কুর সংগ্রহকরণ-৪/৫ ঘন্টা পরপর বিশুদ্ধ পানি ছিটানো।

মুগবীজ বাছাই ও প্রস্তুতকরণ : মাঝারি ধরনের মসৃণ খোসাযুক্ত বীজ মুগাঙ্কুর তৈরির জন্য উপযুক্ত। ভাঙা, কুঁচকানো বীজ ব্যবহার করা ঠিক নয়। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় রক্ষিত বীজের অঙ্কুরোদ্গাম ভাল হয়।

এক্ষেত্রে ১০° সেঃ বা তার কম তাপমাত্রা এবং শতকরা ৮৫ ভাগ আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষিত উন্নতমানের অঙ্কুর পাওয়া যায়।

পাত্রে অঙ্কুরোদ্গমের জন্য পূর্বেই বীজ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হয়। বড় পাত্রে পানিতে বীজ নিয়ে বীজ ঘষতে হয়।

পানিতে ভাসমান সব বীজ ফেলে দিতে হয়। যতক্ষণ পাত্রে বীজগুলো পরিষ্কার না হয়, ততোক্ষণ পানি পরিবর্তন করে বীজ ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

বীজ ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হয়।

পাত্রে বীজ স্থাপন : মুগবীজ পানি থেকে উঠিয়ে মূল পাত্রে রাখতে হয়। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য তলায় ছিদ্রযুক্ত পাত্র আবশ্যক।

পাত্রের ধারণ ক্ষমতার অর্ধেকের কিছু বেশি পরিমাণ বীজ রাখতে হয়। মূল পাত্রে বীজ রাখার পর বীজের উপরিভাগ ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে অন্ধকার স্থানে রাখতে হয়।

গরমকালে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা ও শীতকালে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা পর সমভাবে পানি ছিটিয়ে অঙ্কুরের আর্দ্রতা ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এক চামচ 'ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট' ১২ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি রাতে ছিটিয়ে দিতে হয়।

অঙ্কুর বৃদ্ধির ধাপ : নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

(১) ৮ ঘণ্টা ভেজানোর পর বীজ ফুলে উঠে।

(২) বীজ ভেজানোর একদিন পর অঙ্কুরোদ্গম শুরু হয়।

(৩) ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার অঙ্কুরের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

(৪) ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে ৩ থেকে ৪ সেন্টিমিটার অঙ্কুর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

(৫) ৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুর প্রায় ৫ থেকে ৬ সেন্টিমিটার লম্বা হয়।

(৬) এ সময় থেকে অঙ্কুর সংগ্রহ করে খাবারে ব্যবহার শুরু করা যেতে পারে।

(৭) ৬ থেকে ৮ দিনের মধ্যে ৮ থেকে ৯ সেন্টিমিটার দীর্ঘ অঙ্কুর পাওয়া যেতে পারে।

অঙ্কুর সংগ্রহ : মূল পাত্র থেকে অঙ্কুরসমূহ বড় আকারের পাত্রে স্থানান্তরিত করতে হয়। অঙ্কুর নরম হওয়ায় খুব সাবধানে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।

অঙ্কুরের ভগ্নাংশ, মূল ও অন্যান্য আবর্জনা ফেলে দিতে হয়। অঙ্কুর পরিষ্কার পানিতে ৩ থেকে ৪ বার ধুয়ে নিতে হয়।

ভালভাবে ধোয়ার পর মুগাঙ্কুরসমূহ খাবারের জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। বাজারজাতকরণের জন্য অঙ্কুর প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগে প্যাকিং করে সরবরাহ করা যেতে পারে। সাধারণত এক কেজি বীজ থেকে ৮ থেকে ৯ কেজি মুগাঙ্কুর উৎপন্ন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাশকলাই চাষ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচলিত ডাল ফসলগুলোর মধ্যে মাশকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। দেশে মোট উৎপাদিত ডালের ১০% থেকে ১৫% মাশকলাই থেকে আসে। দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাই নাবাবগঞ্জে মাশকলাইয়ের চাষ হয়ে থাকে। এদেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য এটি একটি প্রিয় ডাল।

মাশকলাই এ দেশে একটি উল্লেখযোগ্য ডাল। এতে আমিষের পরিমাণ ২৪%। মাশকলাইয়ের গাছ গবাদি পশুর খাবার ও সবুজ সার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রায় জমিতেই মাশকলাইয়ের চাষ হয়।

২. মাশকলাই গাছের উদ্ভিদতত্ত্ব

(১) মাশকলাই ছোট আকারের রোমশ লতার মতো গাছ। লম্বায় ৩০ থেকে ৮০ সেন্টিমিটার।

(২) গাছ প্রায় মাটিতেও বেয়ে যায়।

(৩) ফুলের গুচ্ছ ৫ থেকে ৮টি ফুল ফোটে।

(৪) বীজ গজানোর পর এর বীজপত্র মাটির উপরে থাকে।

৩. মাশকলাই জাত

বাংলাদেশে দুই ধরনের মাশকলাই দেখা যায়। একটি হলো বড় জাতের ও কালো রঙের বীজ। আর দ্বিতীয়টি হলো ছোট জাতের ও গাঢ় বাদামি রঙের বীজ। দেশী জাতের মধ্যেও দু'রকমের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

(১) ফল একসাথে পরিপক্ব হয় (Synchronus)।

(২) ফল পর্যায়ক্রমে পাকে (Asynchronus)।

দেশিয় জাত : দেশী জাতের মধ্যে দুই জাতকে বেশি ফলনের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে, এগুলোর নাম রাজশাহী ও সাধুহাটী। এই দুই স্থানীয় জাতের বীজ গজানো থেকে ফসল পরিপক্ব হতে ৯৫-১০৩ দিন সময় লাগে।

গত কয়েক বছর ধরে দুটি উন্নত জাতও বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলোর নাম বারমাসী এবং নং ২১৪০।

এই দুটি জাতই সম্পূর্ণরূপে দিন নিরপেক্ষ। এজন্য এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসের যে কোনো সময় বোনা যায়।

এগুলোর ফল পরিপক্ব হতে ৬০ থেকে ৭০ দিন সময় লাগে। প্রতি হেক্টরে ১৩০০ থেকে ১৫০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।

মাশকলাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাত হচ্ছে 'ম্যাক' এটির রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজন করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক মাশকলাই উৎপাদন ধারা (১৯৯৯৫-৯৮)

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
এলাকা	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন
বান্দরবান	১৩০	৪৫	১৩০	৪৫	১৩০	৪৫
চট্টগ্রাম	২৭৫	৯০	২৭৫	১০০	২৭০	১১৫
কুমিল্লা	২১৮৫	৬০০	২১৮৫	৫৭০	২১৮০	৬৪৫
খাগড়াছড়ি	৪৫	১০	৩৬	১০	৫০	১৫
নোয়াখালী	৪৪২০	১১৫০	৪২১০	১১৩০	৪৪২৫	১২৫০
রাঙ্গামাটি	২৫	০৫	২০	০৫	১৫	০৫
সিলেট	৪৭৫	১৮০	৬০৫	২২০	৬৪০	২৭৫
ঢাকা	১০১২০	৩১৪৫	১০১৪০	৩১৯৫	১০৬৬৫	৩৫৬০
ফরিদপুর	৭৩০৫	২০৬৫	৭১৩৫	২০২০	৬৯২৫	২১৯৫
জামালপুর	২৯০০	১০২৫	৩০৯৫	১১৫০	৩৩১০	১১৩০
কিশোরগঞ্জ	৬৮৬৫	২৩০০	৬৯৪৫	২৩৭৫	৬৪৮০	১৬৮৫
ময়মনসিংহ	৬৯৭৫	২৪২৫	৬৮৭৫	২৩৮৫	৬৯২৫	২৪১০
টাঙ্গাইল	১৪০০০	৫০৫৫	১৪৬৩০	৫০৪৫	১৪২৩৫	৩৬৮৫
বরিশাল	৩২০	১০০	২৫০	৮৫	১৯৫	৬০
যশোর	১৩২১০	৪৬৫০	১৩৬৬০	৫৪৩৫	১২৮২০	৫০১৫
খুলনা	৪১৫	১২০	৫০০	১৭৫	৫৫৫	২০৫
কুষ্টিয়া	৭১২৫	২১৩৬	৭৫১০	২২৮৫	৭৩২০	২২৬০
পটুয়াখালী	-	-	-	-	-	-
বগুড়া	২৯১৫	৯৫৫	৩১৬০	১০৬০	৩২৭০	১১০৫
দিনাজপুর	১১৩৬৫	৩১৯৫	১১৫৭৫	৩২৫০	১১৮৭০	২৯৫৫
পাবনা	১৩৫৩০	৪৫৬০	১২০২৫	৩৫৮৫	১১৬৯০	৪০৪৫
রাজশাহী	৪৮৯১০	১৩৯৪০	৪৭৩৭৫	১৩৬৯০	৪৭৩৮০	১৩৪৫৫
রংপুর	৭০৮০	২৪৩৫	৭০০০	২৩৮৫	৭৪১০	২৪৫০
বাংলাদেশ	১৬০৫৯০	৫০২২৫	১৫৯৩৩৫	৫০২০০	১৫৮৭৬০	৪৮৫৬৫

৫. পরিবেশগত চাহিদা

তাপ (Temperature) : মাশকলাই গরম আবহাওয়ার ফসল এবং বেশ কিছুটা তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এই ফসলের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে ২৫° থেকে ৩৫° সেঃ। ৪২° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা এই গাছ সহ্য করতে পারে।

বৃষ্টিপাত (Rainfall) : যেসব জায়গায় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৫০ মিমি-এর কম সেখানেও এই ফসলের চাষ হতে পারে। মাশকলাইয়ের চাষ খরিফ ও রবি দুই মৌসুমেই হতে পারে। তবে বাংলাদেশে যেসব জাতের চাষ হয় তার বেশিরভাগই হলো 'ছোট দিনের' ফসল।

মাটি (Soil) : বিভিন্ন ধরনের মাটিতে মাশকলাইয়ের চাষ করা যায় যেমন– দোআঁশ, বেলে, পলি ও এঁটেল মাটি। তবে কিছুটা এঁটেল ধরনের মাটিতে এর ফলন বেশি হয়।

৬. উৎপাদন এলাকা

বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা এবং ফরিদপুর এলাকায় মাশকলাইয়ের চাষ বেশি হয়।

৭. সাধারণ চাষ পদ্ধতি (Common cultivation practices)

জমি নির্বাচন ও তৈরি : সাধারণত দু'বার চাষ মই দেওয়ার পর বীজ বোনা যায়। ধানের পরপরই বোনা হলে বীজ ধানের জমিতে ছিটিয়ে বোনা হয়। সেক্ষেত্রে কোনো রকম জমি তৈরির প্রয়োজন হয় না।

বীজ বপন : বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের নিজেদের ক্ষেত থেকেই বীজ সংগ্রহ করে থাকে। ভাল করে রাখতে পারলে বীজ গজানোর ক্ষমতা প্রায় দুই বছর পর্যন্ত থাকতে পারে।

বাংলাদেশে রবি ফসল হিসেবে নভেম্বরে মাশকলাই বোনা হয়। এই রবি ফসলের ফলন কম হয়। দিন নিরপেক্ষ জাত এখন দেশে পাওয়া যাচ্ছে, এজন্য এই জাত দিয়ে মার্চ থেকে এপ্রিল মাসেও এখন মাশকলাইয়ের চাষ করা সম্ভব।

বীজের হার (Seed rate) : মাশকলাই একক ফসল হিসেবে চাষ করা হলে বীজের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে ১০ থেকে ১৮ কেজি লাগে। অন্য ফসলের সঙ্গে মিশিয়ে বোনা হলে ৫ থেকে ১০ কেজি প্রতি হেক্টরে লাগে।

বপন পদ্ধতি : জমি তৈরির পর মাশকলাই ছিটিয়ে বোনা হয়। তারপর মই দিয়ে বীজ ঢেকে দেওয়া হয়। রোপা আমন অথবা ছিটা আমনের পর বোনা হলে ধান কাটার ২ থেকে ৩ সপ্তাহ আগে জমিতে ছিটিয়ে বোনা যায়। দেশের কোনো কোনো জায়গায় বিশেষ করে চট্টগ্রামে মাশকলাই ক্ষেতের আইল, রাস্তা ও বাঁধের উপর বোনা যায়।

পরিচর্যা : মাশকলাই চাষের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর ৩ সপ্তাহের মধ্যে নিড়ানি এবং অন্যান্য যত্নের প্রয়োজন। ১ থেকে ২ বার আগাছা দমন করতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

মাশকলাই ক্ষেতে আগাছা দমনের জন্য ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে। এলাক্লোর–১ কেজি প্রতি হেক্টরে অথবা প্রতি হেক্টরে হারে নাইট্রোফেন-২ (Nitrofen) কেজি প্রতি হেক্টরে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশে একক ফসল হিসেবেই মাশকলাইয়ের চাষ হয়ে থাকে। আখ, পাট, ভুট্টা, কাউন ও অড়হর ফসলের সাথেও মাশকলাইয়ের চাষ হতে পারে।

পানি সেচ ও নিকাশ : বাংলাদেশে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করেই মাশকলাইয়ের চাষ করা হয়।

৮. সার প্রয়োগ

প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন (N) এবং ৩০ কেজি ফসফরাস (P_2O5) । প্রয়োগ করলে ফলন বেশি হয়। ভাল ফল পাওয়ার জন্য এসিড মাটিতে চুন ব্যবহার করা হয়। প্রতি হেক্টরে ১ থেকে ৩.৫ টন চুন ব্যবহার করতে হয়।

সাধারণ সুপারিশ হিসেবে মাশকলাইয়ে ব্যবহারের জন্যে গড় সার মাত্রা নিচে উপস্থাপিত হলো।

মাশকলাইয়ের সার সুপারিশ

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ
ইউরিয়া	৪০-৫০	মূল সার
টিএসপি	৬০-৭০	মূল সার
এমপি	২৫-৩০	মূল সার
ডলোচুন পরিমিত	৪০০-৭০০	অম্লীয় মাটিতে
জিপসাম	২০-২৫	ঘাটতি এলাকা
দস্তা সার	৮-১১	প্রয়োজনে স্প্রে
বোরন সার	৪-৭	প্রয়োজনে স্প্রে
সুষম জৈব সার	১-২ টন	প্রয়োজনে স্প্রে
অণুজীব সার	সারের নির্দেশনা অনুসারে	প্রয়োজনে
ডলোমাইট	৩০-৪৫	অম্লীয় মাটি

এতদসঙ্গে বিএআরসি সুপারিশকৃত মৃত্তিকা উর্বরতা ও ফলন মাত্রাভিত্তিক সার প্রয়োগ নির্দেশনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

বিএআরসি অনুমোদিত রাসায়নিক সার প্রয়োগ : সকল জাতের ক্ষেত্রে গড় ফলন লক্ষমাত্রা - ১.০ টন/হেক্টর

ভূমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	B
উত্তম	০-৫	০-৪	০-৫	০-৩	-	-
মধ্যম	৬-১০	৫-৮	৬-১০	৪-৬	-	-
কম	১১-১৫	৯-১২	১১-১৫	৭-৯	-	-
খুব কম	১৬-২০	১৩-১৬	১৬-২০	১০-১২	-	-

৯. ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

মাশকলাইয়ের ফসল তোলাও বেশ জটিল। এদেশে দু'ধরনের মাশকলাই চাষ করা হয়। এক ধরনের মাশকলাইয়ের ফল একসঙ্গে পরিপক্ব হয়, কাজেই ফল একবারেই তোলা হয়।

অনেক মাশকলাইয়ের ফল একসঙ্গে পরিপক্ব হয় না। ফলে ২ থেকে ৩ বারে জমি থেকে তুলতে হয়।

ফল পরিপক্ব হলে এর বাইরের খোসা অথবা গাঢ় খয়েরি রঙের হয়ে যায়। ফসল তোলার পর ৭ থেকে ৮ দিন রোদে শুকালে ফল মচমচে হয়। তারপর ফসল মাড়িয়ে ও ঝেড়ে দুই একদিন রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

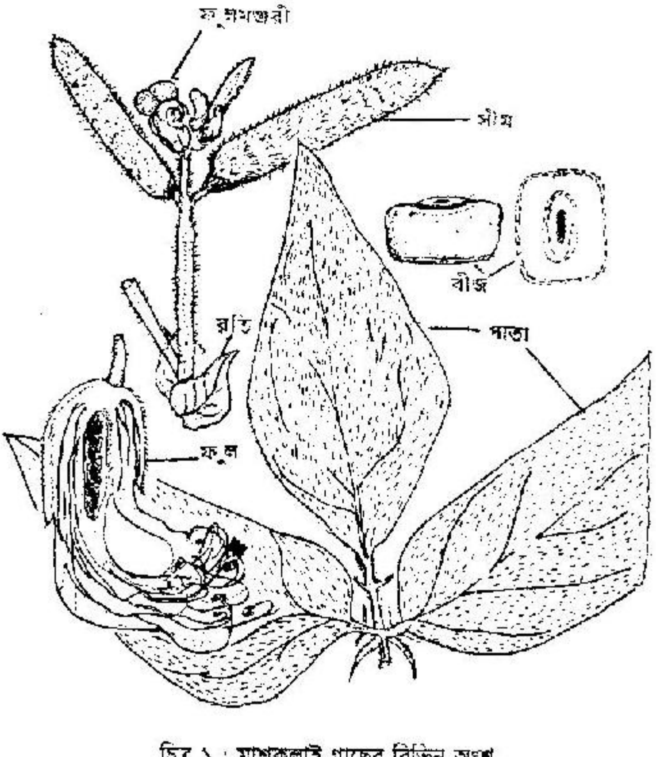

চিত্র ১ : মাশকলাই গাছের বিভিন্ন অংশ

ফলন : বাংলাদেশের মাশকলাইয়ের ফলনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৬০০ থেকে ৭০০ কেজি। এর থেকে বেশি ফলন পেতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হয়–

(১) উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা
(২) পরিমাণ মতো সার ব্যবহার করা।
(৩) পোকা ও রোগ দমন করা।
(৪) ভালভাবে পরিচর্যা করা।

এসব পরিচর্যা মেনে চললে মাশকলাইয়ের নিম্নরূপ ফলন পাওয়া যেতে পারে।

দেশি জাত : রবি : ৬০০-৭০০ কেজি
খরিফ : ৪০০-৬০০ কেজি

উফশী জাত : বারি, বিনা, বিদেশি
রবি – ১০০০-১২০০ কেজি

১০. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

মাশকলাই মাটির উর্বরা শক্তি জোরদার করার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য শিমজাতীয় ফসল। মাশকলাই মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এক হেক্টর মাশকলাইয়ের জমিতে ৭০ থেকে ৮০ কেজি নাইট্রোজেন বাতাস থেকে মাটিতে সংযোজন হতে পারে।

এজন্য মাশকলাই গাছ জমি থেকে না উপড়িয়ে গোড়ায় কেটে আনলে নডিউল মাটিতে থেকে যায়। এই নডিউল মাটিতে পচে গিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবন্ধন

ফসল	সংবন্ধনের পরিমাণ (কেজি নাইট্রোজেন/হেক্টর)	ইউরিয়া সমতুল্য (কেজি ইউরিয়া/হেক্টর)
মাশকলাই, মুগ, বরবটি	১০০	২২২
মশুর, মটর, ছোলা	১১০	২৪৫
খেশারি	৯৫	২১১
অড়হর, সয়াবিন	২০০	৪৪৫
চীনাবাদাম	১৫০	৩৩৩
ধৈঞ্চা (৭০ দিনে)	৯০	২০০

১১. মাশকলাইয়ের উন্নত জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো।

বারোমাসী মাশকলাই : বাংলাদেশে এলাকাভেদে অনেক ধরনের মাশকলাই রয়েছে। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন জাত বাছাই করে বারোমাসী মাশকলাই নামে একটি জাতের অনুমোদন দিয়েছে। এ জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

(১) পাতাগুলো লম্বাটে।
(২) পাতার শীর্ষভাগ সরু।
(৩) বীজের রঙ কালচে বাদামি।
(৪) বীজের আকার বড়।
(৫) হাজার বীজের ওজন ৪২ গ্রাম থেকে ৪৫ গ্রাম।
(৬) গাছের উচ্চতা ৩২ থেকে ৩৬ সেন্টিমিটার।
(৭) জীবন কাল ৭০ থেকে ৭৫ দিন
(৮) বছরে ২ থেকে ৩ মৌসুমে চাষ করা যায়।
(৯) হলুদ পাতা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
(১০) ফলন ১.৭-২ টন/হেক্টর।

ম্যাক মাশকলাই : বিদেশ থেকে আনীত ও উদ্ভাবিত জাত। ফলন বেশি, তবে গ্রীষ্মকালে চাষ করলে রোগ পোকার আক্রমণ বেশি হয়। দানা বড়, রঙ কালচে, সুস্বাদু।

বারিমাশ-১ : পান্থ ৩০ নামে এ জাতটি ১৯৮১ সালে বিদেশ থেকে আনা হয়। পরবর্তীকালে অগ্রবর্তী পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চফলনশীল হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ১৯৯০ সালে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের উচ্চতা ৩২ থেকে ৩৬ সেন্টিমিটার।
(২) এ জাতের বীজের রঙ কালচে বাদামি।
(৩) চারায় খয়েরি পিগমেন্ট আছে।
(৪) বীজের আকার বড়।
(৫) ৫ ফসল লম্বা, শীর্ষ সরু।
(৬) গাছের উপরিভাগ লতানো হয় না।
(৭) ফলের গায়ে ঘন শুং আছে।
(৮) পাকা ফলের রঙ বাদামি।
(৯) হাজার বীজের ওজন ৩৮ গ্রাম থেকে ৪০ গ্রাম।
(১০) জাতটি দিন নিরপেক্ষ হওয়ার ফলে খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে আবাদ করা যায়।
(১১) জীবনকাল ৬৫ থেকে ৭০ দিন।
(১২) হেক্টর প্রতি ফলন-১.৪ থেকে ১.৫ টন।
(১৩) হলুদ ভাইরাস ও পাতার দাগ রোগসহিষ্ণু।
(১৪) দানা ৮৫%।
(১৫) আস্ত ডাল ৭২%।
(১৬) রান্নার জন্য সময় প্রয়োজন ৩২%।
(১৭) রান্না পানিতে দ্রবীভবন ৩৬%।
(১৮) রান্নার সময় পানি শোষণ ১.৯ গ্রাম।
(১৯) আমিষ ২১-২২%।
(২০) শর্করা ৪৮%।

বারিমাস-২ : এ জাতটি ১৯৮৭ সালে বিএমএ-২১৪১ এবং বিএমএ-২১৪০ সারির মধ্যে সঙ্করায়ণ করে উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

(১) গাছের আকার মধ্যম, উচ্চতা ৩৩ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার।
(২) চারায় খয়েরি পিগমেন্ট আছে।
(৩) স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয় না।
(৪) পত্র ফলকগুলো মাঝারি সরু, স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয় না।
(৫) পাকা ফলের রঙ কালো।
(৬) ফলগুলো খাড়া, গায়ে শুঙ আছে।
(৭) বীজের রঙ কালচে ধরনের।

(৮) বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশ বড়।
(৯) হাজার বীজের ওজন ৩২ গ্রাম থেকে ৩৪ গ্রাম। (৮% আর্দ্রতায়)
(১০) জীবন কাল ৭০ থেকে ৭৫ দিন।
(১১) গড় ফলন হেক্টর প্রতি ১.৫-১.৭ টন।
(১২) জাতটি দিন নিরপেক্ষ।
(১৩) কৌলিকভাবে হলুদ মোজাইক ভাইরাস ও পাতার দাগ রোগসহিষ্ণু।
(১৪) দানা ৮৬%।
(১৫) আস্তদানা ৭২%।
(১৬) দ্রবীভবন ২৭%।
(১৭) পানিশোষণ ১.৮ গ্রাম।
(১৮) আমিষের পরিমাণ ২৩%
(১৯) শর্করার পরিমাণ ৪৭%।

বারি মাশ-২-এর প্রজেনি

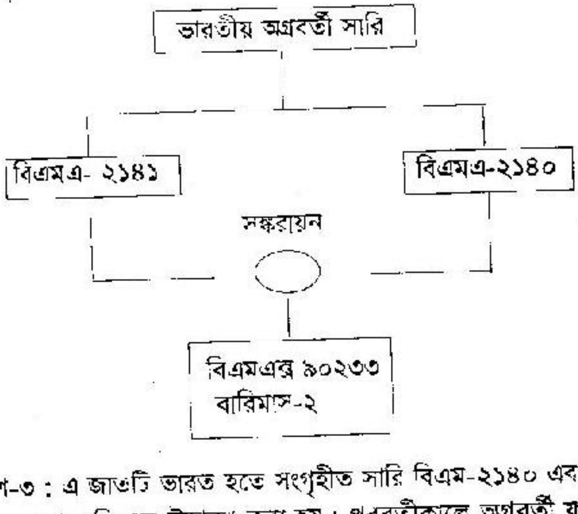

বারিমাশ-৩ : এ জাতটি ভারত হতে সংগৃহীত সারি বিএম-২১৪০ এবং বিএমএ-২০৩৮ এর মধ্যে সঙ্করায়ণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীকালে অগ্রবর্তী ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে কৃষক পর্যায়ে অবমুক্ত করা হয়

বৈশিষ্ট্য

(১) গাছের আকার মধ্যম।
(২) চারায় খয়েরি পিগমেন্ট আছে।
(৩) গাছের উচ্চতা ৩৫ থেকে ৩৮ সেন্টিমিটার।
(৪) স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয়।
(৫) ফল পাকলে কালো হয় এবং এতে ঘন শুঙ আছে।
(৬) বীজের রঙ কালচে।

(৭) বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশ বড় ।
(৮) হাজার বীজের ওজন ৪১-৪৩ গ্রাম ।
(৯) জীবন কাল ৭০ থেকে ৭৫ দিন ।
(১০) ফলন হেক্টর প্রতি ১.৬ থেকে ১.৮ টন ।
(১১) হলুদ মোজাইক ভাইরাস ও পাতায় দাগ রোগসহিষ্ণু ।
(১২) দানা ৮৬% ।
(১৩) আস্ত ডাল ৭৩% ।
(১৪) দ্রবীভবন ৩১% ।
(১৫) পানিশোষণ ১.৯ গ্রাম ।
(১৬) আমিষ ২৩% ।
(১৭) শর্করা - ৪৭% ।

বারিমাশ–৩ এর প্রজেনি

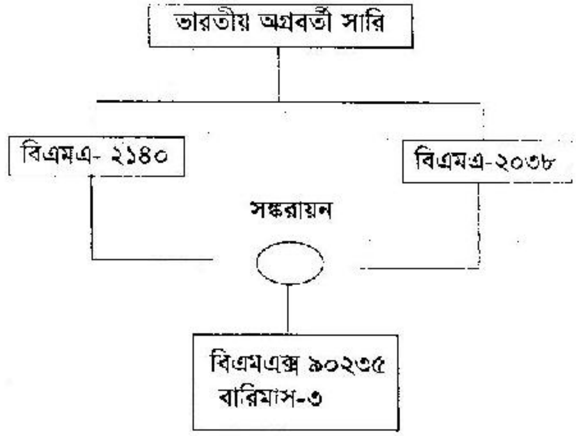

বিনামাশ-১ : বাংলাদেশে আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতসমূহ সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো ।

স্থানীয় জাতের (স্থানীয় মাতৃজাত : রাজশাহীর স্থানীয় জাত) বীজে গামা রশ্মি প্রয়োগ করে এবং মাঠ পর্যায়ে একক গাছ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে । সারাদেশে চাষাবাদের জন্য ১৯৯৪ সালে বিনামাস-২ নামে জাতটি অনুমোদিত হয় ।

বৈশিষ্ট্য

(১) বিনামাশ-১ এর কাণ্ড শক্ত ও খাড়া ।
(২) গাছের উচ্চতা ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার ।
(৩) মাতৃজাত (বি-১০) হতে ফলন ৩০% বেশি ।
(৪) বীজের রঙ কালো, মাতৃজাত থেকে শুভ্র কম ।
(৫) আমিষের পরিমাণ ২৫% থেকে ২৬% ।

(৬) বীজ বপন থেকে কাটা পর্যন্ত ৮০ থেকে ৮৫ দিন সময় লাগে।
(৭) সবগুলো ফল একই সাথে পরিপক্ক হয়।
(৮) হলদে পাতা ও পাতা পচা রোগ সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন।
(৯) হেক্টর প্রতি ফলন ৯০০ থেকে ১১০০ কেজি।

বিনামাশ–১ এর প্রজেনি

স্থানীয় জাত (রাজশাহী)

→ গামা রশ্মি → বাছাই → বিনামাশ-১

১২. বিনামাশ চাষ পদ্ধতি

জমি ও মাটি : সকল প্রকার জমিতে বিনামাস-১ বপন করা যায়। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এরকম জমি নির্বাচন করা উত্তম।

দু-তিনটি চাষ ও মই দিয়ে বীজ বপন করতে হয়। বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা হয়। নিচু এলাকায় বন্যায় পানি নেমে গেলে নরম মাটির উপর ছিটিয়েও বীজ বোনা যেতে পারে।

বপনের সময় : এলাকাভেদে আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ বপন করা চলে। বিলম্বে বীজ বপন করলে ফলন হ্রাস পায়।

মাশকলাই চাষবাদে লক্ষ্য করা যায় যে, বৃষ্টিপাতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জমি চাষ ছাড়া শুধু ছিটিয়ে বপন করলে নষ্ট কম হয়– এতে ঝুঁকি কম থাকে। আর্দ্র এঁটেল মাটির জমিতে চাষ ছাড়াই বপন করা যায়। তবে শুষ্ক এবং উঁচু জমিতে চাষ দিয়ে বপন করা হয়।

১৩. সার প্রয়োগ

যে জমিতে পূর্ববর্তী ফসল ধান বা পাট লাগানো হয়েছিল এবং সুষম হারে সার প্রয়োগ করা হয়েছিল তাতে বিনামাশ-১ এর বীজ বপনের সময় কোনো সার প্রয়োজন হয় না।

অন্যথায় জমিতে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া, ৫০ কেজি টিএসপি এবং ৪০ কেজি এমপি সার দিলে ফলন ভাল হয়।

জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে সারের মাত্রার তারতম্য করা যেতে পারে। অম্লীয় মাটিতে বিনামাশ চাষ করতে হলে জমি প্রস্তুতের সময় হেক্টর প্রতি ৪০০-৬০০ কেজি ডলোচুন দিলে ফলন ভাল হয়। অবশ্য এ চুন জমির পরবর্তী রবি ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।

কোনো জমিতে পূর্ববর্তী ফসলে বা পূর্ববর্তী বছরের ডাল ফসলে কোনো পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দিলে তা পরিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর মধ্যে বোরন ও দস্তার ঘাটতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মাঠে ফসল থাকা অবস্থায় বোরন ও দস্তার ঘাটতি দেখা দিলে সেক্ষেত্রে স্প্রে করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বীজ ফসল উৎপাদনে এসব পুষ্টির সুষ্ম সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অধিক যত্নবান হতে হবে।

বীজের হার : প্রতি হেক্টরে ৩৫ থেকে ৪০ কেজি বীজ প্রয়োজন।

প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা বীজ বোনার সময় ২.৭-৩.৩ লক্ষ রাখা ভাল।

১৪. আগাছা দমন

চারা গজানোর পরে জমিতে আগাছা দেখা দিলে ১৫ থেকে ২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। এতে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

মাশকলাই জমির প্রধান প্রধান আগাছার মধ্যে রয়েছে, দন্দকলস, মুথা, চাপড়া, ক্ষেদাইস, দুর্বাসহ অন্যান্য ঘাস ও লিগিউম উদ্ভিদ।

১৫. পোকা দমন : মাশকলাই চাষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পোকার নাম নিচে দেওয়া হলো-

(১) বিছাপোকা
(২) ফল মাজরা পোকা
(৩) শিমের মাছি পোকা
(৪) সাদা মাছি পোকা
(৫) জাবপোকা
(৬) ক্রিকিড পোকা

পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে ডাইমেক্রন ১০০ ইসি বা মালথিয়ন ৫৭ ইসি ইত্যাদি কীটনাশক মাত্রা অনুযায়ী স্প্রে করা হলে সুফল পাওয়া যায়।

মাশকলাই ফসলে বিভিন্ন আক্রমণকারী পোকা

বাংলা ও ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	আক্রমণের সময়	প্রকৃতি
বিছাপোকা Hairy caterpillar	*Spilosoma obiliqua*	এপ্রিল-আগস্ট	মুখ্য
ফল ছেদক পোকা 1. Hair streak butterfly 2. Spotted pod borer 3. Pod borer 4. Limabean pod borer	 *Euchrysopa enijus* *Maruca testutalis* *Helicoverpa armigera* *Etiellaz inckerella*	সারা বছর	মুখ্য
লিফ বিটল (Leaf beetles)	*Madurasia obscurella*	সারা বছর	গৌণ
কাণ্ডের মাছি Bean stem fly	*Ophiomyia physeoli*	ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি	মুখ্য
জাবপোকা Aphid	*Aphis craccivora*	ঐ	গৌণ
পাতা ফড়িং Leaf hopper	*Emposasca kerri*	মার্চ-অক্টোবর	গৌণ
সাদা মাছি White fly	*Bemisia tabaci*	সারা বছর	গৌণ

সবুজ গান্ধি পোকা Green stink bug	*Nezara viridula*	এপ্রিল-আগস্ট	গৌণ
লিফ ওয়েবার Leaf webber	*Laprosoma indicata*	এপ্রিল-আগস্ট	গৌণ
পাতা সুরঙ্গকারী পোকা Leaf miner	*Liriomyzae cicerina*	এপ্রিল-আগস্ট	গৌণ
থ্রিপস্ Thrips	*Magalurothrips usitatus*	এপ্রিল-আগস্ট	গৌণ
ইপিলেকনা বিটল Epilachna beetle	*Epilachna* spp	সারা বছর	গৌণ
পাতার বিটল Leaf beetle	*Monolepta signata*	সারা বছর	গৌণ
বাদামি গান্ধি পোকা Brown bug	*Riptertus pedestris*	এপ্রিল-আগস্ট	গৌণ

বিছাপোকা : বাংলাদেশে মাশকলাইয়ের বিছাপোকা (*Spilosoma obliqua*) বর্ষাকালে বেশি দেখা যায়। বিশেষ করে পাট কাটার পরপরই মাঠে অন্য ফসল না থাকলে এগুলো সরাসরি মাশকলাইকে আক্রমণ করে। মাশকলাই মাঠে পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় মথই দেখা যায়। স্ত্রী মথের ডানার বিস্তৃতি ৫০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। পুরুষ মথ একটু ছোট। মথের পায়ের রঙ কিছুটা পীত বর্ণের। মথের সামনের পাখনায় কালো দাগ দেখে এগুলোকে শনাক্ত করা যায়। ক্ষতিকারক শুঁয়াপোকা বা বিছপোকার দেহ অসংখ্য কালো লোমে আবৃত থাকে। বিছাপোকা লম্বায় ৪-৫ সেন্টিমিটার হয়।

জীবন চক্র : মাশকলাই বীজ থেকে চারা বের হবার ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যেই স্ত্রী মথ পাতার উল্টো পৃষ্ঠে উজ্জ্বল সবুজ রঙের ৪০০-১২০০টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলো ফোটার পর ৫/৬ দিন পর্যন্ত শূককীটগুলো দলবদ্ধভাবে থাকে। এ অবস্থায় এগুলো পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে জালিকার মতো করে ফেলে। বিছাপোকা দেহের গুটি খোলস ও লোম দিয়ে গুঁটি তৈরি করে এবং সেই গুঁটি ভিতর গ্রীষ্মকালে ২০ দিন এবং শীতকালে ৩৫ দিন পর্যন্ত। বিছাপোকা বছরে একাধিকবার বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : বিছাপোকা মাঠে নানা রকম প্রাকৃতিক শত্রু যেমন *Apanteles, Eurytoma, Meteorus, Blepharilla, Cercilie, Pediobius* ইত্যাদি প্রজাতির পোকা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাছাড়া নিম, ধুতরা, বিষকাটালি প্রভৃতি গাছের রস ছিটিয়েও বিছাপোকা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে সহজলভ্য এবং উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) প্রাথমিক পর্যায়ে বিছাপোকাগুলো মাশকলাই পাতার নিচের পৃষ্ঠে দলবদ্ধভাবে থাকে বিধায় পোকাসহ পাতাটি ছিঁড়ে পায়ে দলে পোকা মেরে ফেলা যায়।

(২) নগস ১০০ ইসি, ডিডিভিপি ১০০ ইসি, ভেপোনা ১০০ ইসি, ডাইক্লোরোভস ১০০ ইসি ইত্যাদি কীটনাশকের যে কোনোটি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার

মিশিয়ে আক্রান্ত মাশকলাই মাঠে ছিটিয়ে বিছাপোকা দমন করা যায়। তাছাড়া ডায়াজিনন ৫০ ইসি অথবা নুভাক্রন ৪০ ডব্লিউ এসসি নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি মিশিয়ে বিছাপোকা আক্রান্ত গাছে ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।

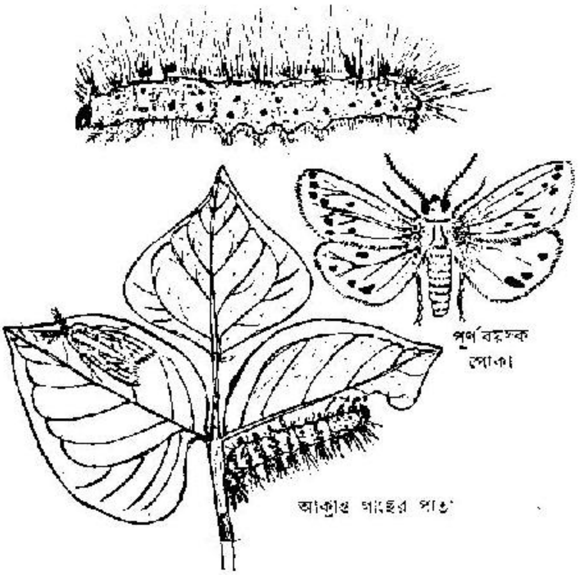

চিত্র ২ : পাতা খাওয়া বিছা পোকা

ফল মাজরা পোকা : ফলছেদক পোকা *(Maruca testulalis)* প্রায় সব ডালজাতীয় ফসলকে আক্রমণ করে, এজন্য সারা বছরই এগুলোকে দেখা যায়। বাংলাদেশে শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে এ পোকার আক্রমণ খুব বেশি।

শূককীটগুলো সবুজ ডগা, ফল ও ফুলের কুঁড়ি ছিদ্র করে খেয়ে থাকে। এগুলো পাতা, ফুলের কুঁড়ি এবং ফল একত্রে জালের সাহায্যে আবদ্ধ করে পাতায় বসে খায়। পূর্ণবয়স্ক পোকা বা মথ দেখতে গাঢ় বাদামি। পোকার সামনের পাখনায় হালকা অর্ধবৃত্তাকার সাদা দাগ রয়েছে। পাখনার বিস্তৃতি ২৫-৩০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। এগুলোর পিছনের পাখনা ধূসর এবং মাথায় হালকা বাদামি ফসলের অনিষ্টকারী শূককীটগুলো লম্বায় ১৮-২০ মিলিমিটার হয়ে থাকে। এদের গায়ের রঙ ময়লা হলদে সাদা।

জীবন চক্র : পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী মথ মাশকলাইয়ের কুঁড়ি, ফুল ও ফলের উপর একটি একটি করে প্রায় ১০-২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বের হয়ে পুষ্পমঞ্জরি খেতে থাকে। শূককীটগুলো কচি ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে কচি বীজ খেয়ে থাকে। শূককীটগুলো ৫ বার খোলস বদলায়। মূককীট অবস্থায় ৫-১৫ দিন থাকে এবং পরে পূর্ণবয়স্ক মথ হয়ে উড়ে যায়।

দমন পদ্ধতি

(১) এই পোকার প্রাকৃতিক শত্রু (যেমন *Braconidae*) গোত্রের পোকা ব্যবহার করে, এদের কিছুটা দমন করা যায়। যেসব জমিতে বার বার ডাল জাতীয় ফসল চাষ করা হয় সেসব জমিতে এদের প্রাদুর্ভাব বেশি এজন্য একই জমিতে বারবার ডাল চাষ করা উচিত নয়

(২) মাশকলাই ক্ষেতে প্রতি মিটার সারিতে একটি শূককীট পাওয়া গেলে কীটনাশক ব্যবহার করা দরকার।

(৩) সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের রিপকর্ড ১০ ইসি অথবা সিমবুস ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার মিশিয়ে আক্রান্ত মাশকলাই মাঠে ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

শুঁসড়ি পোকা : বাংলাদেশে সব ধরনের গুদামজাত ডালে শুঁসড়ি পোকার (*Callosobruchus maculatus*) আক্রমণ লক্ষ করা গেছে। শুসড়ি পোকা এবং শূককীট গুদামে ডালজাতীয় ফসল বীজ ছিদ্র করে খেয়ে থাকে।

শুঁসড়ি পোকা দেখতে গাঢ় বাদামি। দেহ মোটামুটি গোলাকার তবে মুখের দিকটা ক্রমশ সরু। শুঁসড়ি পোকার শূককীট ক্রিম সাদা। স্ত্রী পোকা পোকা মাঠে ফসল পরিপক্ব হওয়ার সময় শুঁটির উপর এবং গুদামে বীজের উপর ডিম পাড়ে।

জীবন চক্র : পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীপোকা মাঠে শুঁটির উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে শূককীট বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাশকলাইয়ের শুঁটি ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলে এবং শুঁটির ভিতরেই এগুলো মূককীটে পরিণত হয়। গুদামজাতকৃত মাশকলাইয়ে স্ত্রী পোকা প্রতিটি বীজে দুই বা ততোধিক ডিম পাড়ে। ডিম ৪-৬ দিনে ফুটে শূককীট বের হয়। শূককীটগুলো বীজ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে বীজ খেয়ে নষ্ট করে। শূককীট বীজের ভিতরেই থাকে।

গুদামে এই পোকা মাশকলাইকে সারা বছরই আক্রমণ করে থাকে তবে শীতকালে এগুলোর আক্রমণের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম। আমাদের দেশে জুন-জুলাই মাসে এগুলোর আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়।

দমন পদ্ধতি

(১) শুসড়ি পোকা দমনে পরজীবী পোকা যথা *Chalicid* spp. *Dinarmus laticips*, *Bruchocida vailletti* ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

(২) মাঠে এই পোকা দেখা দিলে ডায়াজিনন ৬০ ইসি, সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা ফলিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার মিশিয়ে ছিটিয়ে সহজে দমন করা যায়।

(৩) মাশকলাইয়ের বীজ খুব ভালভাবে রোদে শুকিয়ে বায়ু নিরোধক পাত্রে গুদামজাত করলে এই পোকার আক্রমণ হয় না।

(৪) বীজ অল্প হলে প্রতি কেজি বীজে ৫ মিলিলিটার নিমের তেল মিশিয়ে গুদামজাত করলে ৩ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত শুঁসড়ি পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।

(৫) বীজের পরিমাণ বেশি হলে প্রতি টন বীজের জন্য ৩ থেকে ৬টি ফসটক্সিন টেবলেট ব্যবহার করে শুঁসড়ি পোকার আক্রমণ থেকে বীজকে রক্ষা করা যায়।

(৬) ফসটক্সিন ব্যবহার করতে হলে বীজকে বায়ু নিরোধক করতে হয়। অর্থাৎ বীজ ফসটক্সিনসহ পলিব্যাগ, ড্রাম বা বায়ু নিরোধক কক্ষে রাখতে হয়।

১৬. রোগ দমন

বিনামাশ-১ এর জাতটি হলুদ পাতা পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। তাছাড়া এ জাতে পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম। তবে ছত্রাকের মারাত্মক আক্রমণ হলে ডায়থেন এম-৪৫ বা অন্য কোনো ছত্রাকনাশক স্প্রে আকারে প্রয়োগ করতে হয়।

রোগ দমনের পদ্ধতি : বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মাশকলাইয়ে ১৬টি রোগ চিহ্নিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে পাতায় দাগ রোগ, পাউডারি মিলডিউ এবং হলুদ মোজাইক এ ফসলের সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ।

মাশকলাইয়ের পাতায় দাগ রোগ : *Cercospora cruenta* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট বাদামি হতে লালচে বর্ণের গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে। আক্রান্ত অংশের কোষসমূহ শুকিয়ে যায় ও পাতার উপর ছিদ্র হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সম্পূর্ণ পাতাই ঝলসে যায়। পরিত্যক্ত ফসলের অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির ঝাপটার মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। শতকরা ৮০ ভাগের বেশি আর্দ্রতা ও ২৮° সেঃ এর বেশি তাপমাত্রায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

(১) ব্যাভিস্টিন (০.২%) নামক ছত্রাকনাশক ১২ থেকে ১৫ দিন পর পর তিনবার প্রয়োগ করতে হয়।

(২) রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হয়

পাউডারি মিলডিউ রোগ : *Oidium* প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। পাতার উপর পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ পড়ে। শুষ্ক মৌসুমে এ রোগের অধিক প্রকোপ দেখা যায়। বীজ, পরিত্যক্ত গাছের অংশ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। পাউডারি মিলডিউ মাশকলাই ও ডালের একটি প্রধান রোগ। বাংলাদেশে এ রোগটি খরিফ-২ মৌসুমে আবাদকৃত মাশকলাইয়ে বেশি আক্রমণ করে, বিশেষত দেরিতে বোনা ফসলের বেশি ক্ষতি করে থাকে। এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের জীবাণু ছত্রাক *Erysiphi polygoni* or *Oidium* sp. প্রধানত বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে রোগজীবাণু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয়।

রোগের আক্রমণের লক্ষণ : এ রোগ সর্বপ্রথম পাতার উপরে ছোট ছোট সাদা হালকা দাগ হিসেবে প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে এ দাগ থেকে আরো অসংখ্য অনুরূপ দাগের সৃষ্টি হয়। পরে পাতার উপরের পুরো অংশ আক্রান্ত হয়ে যায়। পাতা থেকে কাণ্ড, ফুল ও ফল প্রভৃতি অংশেও আক্রমণ বিস্তার লাভ করে। পাতার উপরের সাদা পাউডার ক্রমে ছাই রঙ ধারণ করে এবং পরিশেষে তা গাঢ় বাদামি বা কালো রঙের পাউডারে পরিণত হয়।

দমন পদ্ধতি

(১) আগাম বোনা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শুরু থেকে আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বোনা ফসলে এ রোগের আক্রমণের ফলে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়।

(২) টিল্ট ২৫০ ইসি ০.১% অথবা থিওভিট ৮০ ডব্লিউ. পি ০.২% হারে পানিতে মিশিয়ে আক্রমণের শুরুতেই ৭ থেকে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। বিকল্প পোষক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হয়। টিল্ট থিউভিট (০.২%) ১০ থেকে ১২ দিন পর পর তিনবার প্রয়োগ করতে হয়।

হলুদ মোজাইক রোগ : এক প্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত পাতার উপর হলুদ এবং গাঢ় সবুজ মোজাইকের মতো দাগ পড়ে। দূর থেকে সমগ্র আক্রমণ মাঠ হলুদ বলে মনে হয়। সাধারণ কচি পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত বীজ ও বায়ু মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।

প্রতিকার

(১) রোগ মুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হয়।
(২) সাদা মাছি নামক পোকা দমনের জন্য কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়।
(৩) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়ে ফেলতে হয়।

পাতা পচা রোগ : মাশকলাইয়ের পাতা পঁচা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগ একটি প্রধান রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

রোগের আক্রমণের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণের শুরুতে পাতার উপর পানিভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। মেঘলা আবহাওয়ায় দাগের আকার বৃদ্ধি পেয়ে পাতার প্রায় সম্পূর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে বাদামি রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম দেখা যায়। পরে বিভিন্ন আকারের স্ক্লেরোশিয়াম তৈরি হয়। স্ক্লেরোশিয়াম প্রথমে সাদা রঙের হয়ে থাকে এবং পরে বাদামি কালো রঙ ধারণ করে।

রোগ বিস্তার : এ রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক *Sclerotinia sclerotiorum* মাটিতে থাকে। রোগজীবাণু আক্রান্ত গাছের উপর ছত্রাকের স্ক্লেরোশিয়াম তৈরি করে। উক্ত স্ক্লেরোশিয়াম মাটিতে থেকে যায়। মেঘলা আবহাওয়ায় অঙ্কুরিত হয়ে অ্যাসকোকার্প তৈরি করে।

দমন পদ্ধতি : রোগ দমনের জন্য জমি থেকে আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা ভালভাবে পরিষ্কার করা দরকার। ছত্রাক জীবাণুর স্ক্লেরোশিয়াম পরিপক্ব হওয়ার আগেই অর্থাৎ আক্রমণ দেখা দেয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগের দমন ব্যবস্থা হিসেবে আক্রান্ত গাছের অংশ পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

১৭. ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ

বিনামাশ-১ এর ফল একই সাথে পরিপক্ব হয়। ফলে বীজ সংগ্রহ সুবিধাজনক। ফল থেকে গেলে কাঁচি দিয়ে গাছের গোড়া থেকে কেটে নিতে হয়। এতে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

গাছ ভালভাবে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। সংগৃহীত বীজ রোদে ভালভাবে শুকিয়ে পরিষ্কার করে মাটি বা টিনের পাত্রে মুখ বন্ধ করে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

১৮. **বারি উদ্ভাবিত জাতের মাশকলাই উৎপাদন প্রযুক্তি (সংক্ষিপ্ত)**

মৃত্তিকা : বেলে দো-আঁশ থেকে পলি দো-আঁশ, pH ৫ থেকে ৭.৫। লোনা মাটিতে ভাল হয় না।

জমি তৈরি : ২ থেকে ৩টি আড়াআড়ি চাষ ও প্রয়োজনীয় মই দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরি করতে হয়।

বীজ বপন সময় : মধ্য আগস্ট থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর।

বপন সময় : এলাকাভেদে বীজ বপন সময়ের তারতম্য দেখা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মার্চের মধ্যভাগ। খরিফ-২ মৌসুমে আগস্টের ১৫ হতে ৩১ আগস্ট। এ জাতগুলো মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে।

বীজ হার : ২০ থেকে ৩৫ কেজি/হেক্টর

সারি থেকে সারির দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার

গাছ থেকে গাছের দূরত্ব : ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার

প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা : ৪০ থেকে ৫০ টি

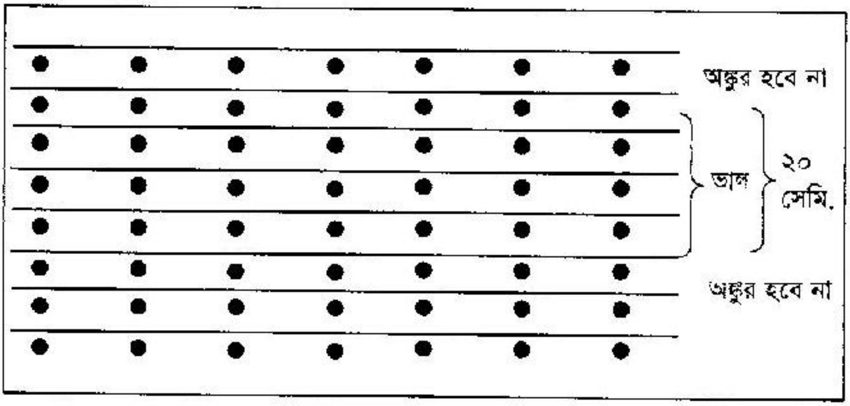

চিত্র ৩ : মাশকলাই বীজ বপন নকশা

সার প্রয়োগ : অনুর্বর জমিতে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৪৫ কেজি, টিএসপি ৯০ কেজি এবং এমপি ৩৫ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হয়। অপ্রচলিত এলাকায় আবাদের জন্য নির্দিষ্ট জীবাণু সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : বপনের ২০ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতি বৃষ্টিপাতের ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না পারে সে অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

১৯. **মাশকলাইয়ের ফসল বিন্যাস**

বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলে উঁচু জমিতে চাষযোগ্য বারিমাশের প্রধান প্রধান ফসল বিন্যাস প্রচলিত রয়েছে।

এসব ফসল বিন্যাসে ১৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমিতে মাশকলাই বুনতে হয়। নিচে দুটি ফসল বিন্যাস উল্লেখ করা হলো।

(১) *আউশ-বারিমাশ-রবি ফসল*

(২) *পাট-বারিমাস-রবিফসল*

মাটিতে আর্দ্রতা থাকলে রবি মৌসুমে সরিষা, গম বা মশুর ফসল কেটে মাশকলাইয়ের চাষ করা যায়। মাশকলাইয়ের পর সে জমিতে রোপা আমনের চাষ করা যায়। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত হারে বীজ ও সার দিতে হয়–

বীজ হার : ৩৫ থেকে ৪০ কেজি/হেক্টর

সার : ২০ ঃ ৪০ ঃ ২০ -$N-P_2O_5-K_2O$

মুগকলাই/মাশকলাই+তুলা আগাম ফসলে

মুগ/মাশকলাই : ২ সারি, সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার

তুলা : ২ সারি, সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার রক্ষা করতে হয়।

মাশকলাই একটি স্বল্প সময়ের ফসল হওয়ায় উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমিতে প্রায় সারা বছর যে কোনো ফসল ধারার সাথে খাপখাইয়ে চাষাবাদ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব প্রধান প্রধান ফসল ধারায় মাশকলাই চাষাবাদ হয় তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

নবাবগঞ্জ অঞ্চল

(১) *আউশ- মাশকলাই-পতিত*

(২) *পতিত-মাশকলাই-পতিত*

যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল

(১) *রবিফসল (সরিষা)- মাশকলাই -রোপা আমন/তুলা।*

(২) *পাট-মাশকলাই -ছোলা/গম*

বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চল

(১) *মাশকলাই -রোপা আমন- পতিত*

(২) *বোনা আউশ-রোপা আমন- মাশকলাই*

পাবনা, রাজশাহী, যশোর, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল

(১) *আউশ/পাট-মাশকলাই -রবিশস্য*

ঢাকা, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চল

(১) *পাট-মাশকলাই -রবিশস্য*

(২) *আউশ-মাশকলাই -গম*

বরিশাল, পটুয়াখালি ও ঝালকাঠি অঞ্চল

(১) *আউশ-পতিত-মাশকলাই*

(২) *আউশ-রোপা আমন-মাশকলাই*

২০. জীবাণু সার ব্যবহার

জীবাণু সার দু'রকমভাবে ব্যবহার করা হয়–

(১) প্রথমে আঠালো তরল বস্তু জীবাণু সারের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া হয়। পরবর্তীকালে পরিমাণমতো বীজ এই আঠালো দ্রবণে মেশানো হয়। এতে জীবাণু বীজাবরণের সাথে শক্তভাবে লেগে থাকে।

(২) এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজ চিটাগুড়ের সাথে মেশানো হয় এবং পরে জীবাণু সার চিটাগুড় মিশ্রিত কালচে বীজে মেশানো হয়। পদ্ধতিটি সহজতর ও সুবিধাজনক বলে এর বিভিন্ন ধাপ (এক কেজি মাশকলাই বীজের জন্য) পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো।

প্রয়োজনীয় সামগ্রী:

(১) বীজ : সুস্থ, সতেজ ও শুকনো ১ (এক) কেজি।

(২) চিটাগুড় : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩-৫%, বড় বীজে ২-৩%)।

(৩) জীবাণু সার : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩-৫%, বড় বীজে ২-৩%)।

(৪) পলিথিন ব্যাগ/গামলা/ছোট বালতি : ১টি।

(৫) রোদবিহীন / ছায়াময় পরিবেশ

ব্যবহার পদ্ধতি

(১) পলিথিন ব্যাগে ১ কেজি বীজে ৫০ গ্রাম চিটাগুড় মিশিয়ে নিতে হয়।

(২) চিটাগুড়ের পরিবর্তে ভাতের ঠাণ্ডা মাড় ব্যবহার করা যায়।

(৩) আঠালো বীজগুলোর সঙ্গে জীবাণু সার ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয় যাতে প্রতিটি বীজে একটি কালো প্রলেপ পড়ে।

(৪) প্রথম বার অর্ধেক জীবাণু সার দিয়ে মিশিয়ে অবশিষ্ট জীবাণু সার দ্বিতীয় বার মিশালে মিশ্রণ ভাল হয়।

(৫) এতে বীজে সমভাবে কালো প্রলেপ পড়ে যাতে বীজে জীবাণুর পরিমাণ যথাযথ হয়।

(৬) জীবাণু সার মিশানো বীজ জমাট বেঁধে থাকলে ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকে।

(৭) জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রোদবিহীন অবস্থায় বা খুবই অল্প রোদে বপন করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বপনকৃত বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে নিতে হয়।

(৮) ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও রোদমুক্ত স্থানে জীবাণু সার ও জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রাখতে হয়।

জমিতে অব্যাহতভাবে উচ্চ ফলনশীল দানাজাতীয় ফসল চাষের ফলে জমির উর্বরতা শক্তি দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ডালজাতীয় ফসল চাষে মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। নিচে বিভিন্ন লিগিউম ফসলের জমিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

২১. মাশকলাইয়ের পুষ্টি ও ব্যবহার

মাশকলাইয়ের শ্বেতসার, আমিষ, ভিটামিন এবং খনিজ লবণ বিশেষত লোহার একটি উৎকৃষ্ট উৎস। এতে প্রায় শতকরা ২২-২৬ ভাগ আমিষ পাওয়া যায়। মাশকলাইয়ের সাথে চাল ও আলু মিশিয়ে রান্না করলে আমিষের গুণগত মান বেড়ে যায়।

সপ্তম অধ্যায়

অড়হর চাষ

১. ভূমিকা

অড়হর বাংলাদেশে বেশ জনপ্রিয় ডালজাতীয় ফসল। দিন দিন এর চাষ বাড়ছে। গরুর খাবার হিসেবে অড়হরের বেশ চাহিদা রয়েছে। জমির উর্বরা শক্তি বাড়ানো ও মাটিক্ষয় বন্ধ করার জন্য অড়হর একটি উপকারী ফসল। অড়হর গাছের শুকনো ডাল-শাখা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২. উৎপাদন তথ্য

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে অড়হর চাষ হয়ে থাকে। মোট উৎপাদন প্রায় ৩ হাজার টন। গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ৫০০ কেজি। প্রধান প্রধান অড়হর উৎপাদনকারী এলাকা ও উৎপাদন তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো–

ক্রমিক সংখ্যা	জেলা	পরিমাণ
১.	কুষ্টিয়া	২২৩৫ হেক্টর (৩৭%)
২.	রাজশাহী	৭৬০ হেক্টর (১৩%)
৩.	কুমিল্লা	৬৬০ হেক্টর (১১%)
৪.	যশোর	৬৩৫ হেক্টর (১০%)
৫.	টাংগাইল	২৩৫ হেক্টর (৪%)
৬.	ফরিদপুর	১৬০ হেক্টর (২.৬%)
মোট		৪,৬৮৫ হেক্টর

সারা দেশের মধ্যে উল্লিখিত ৬টি জেলায় প্রায় ৭৮% অড়হর উৎপাদিত হয়।

৩. উদ্ভিদতত্ত্ব

অড়হর গাছ বেশ বড় হয় এবং এর অনেক শাখা-প্রশাখা জন্মায়। অড়হর একটি দীর্ঘমেয়াদি গাছ এবং এর শিকড় প্রায় ২ মিটার নিচে পর্যন্ত চলে যেতে পারে। বীজ গজানোর পর 'বীজ পত্র' মাটির নিচে থেকে যায়। অড়হর বীজ ৯° থেকে ২০° সেঃ এর ভিতর গজাতে পারে। তবে এর জন্য সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা হলো ২৯° থেকে ৩০° সেঃ পর্যন্ত।

অড়হরের প্রধান প্রজাতি ধরন দুটি যথা-

(১) *Cajanus cajan var. theovus* বা তুর (Tur)

(২) *Cajanus cajan var. bicolour* বা অড়হর।

অড়হর একটি ছোট দিনের ফসল। যখন মে থেকে জুন মাসে বড় দিনে এর চাষ করা হয়, তখন ফুল ও ফল পরিপক্ব হতে বেশ সময় লাগে যখন ছোট দিনের আবহাওয়ায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে চাষ হয় তখন ফুল বেশ তাড়াতাড়ি ফোটে, ফসলও তাড়াতাড়ি পরিপক্ব হয়ে যায়। এই ছোট দিনের আবহাওয়ায় গাছ বেশ ছোট হয়

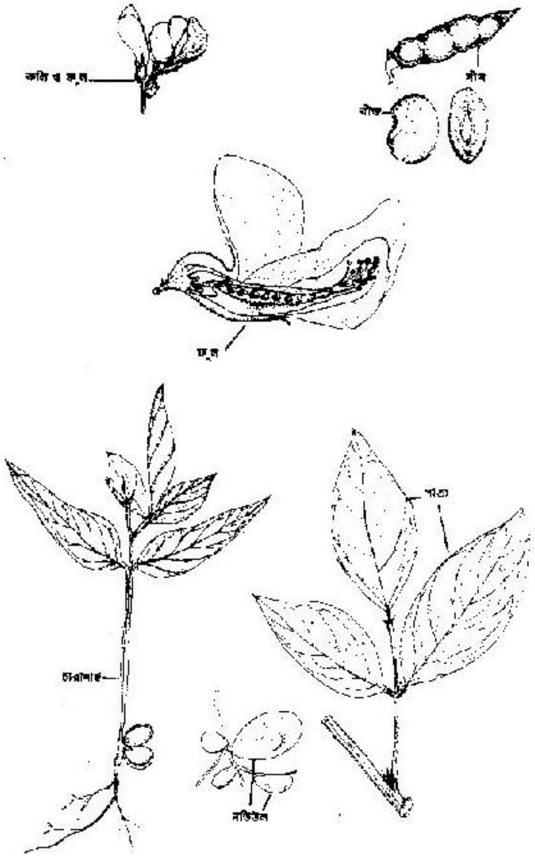

চিত্র ১ : অড়হর উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

৪. **উৎপাদন পদ্ধতি**

ক. জাত : বাংলাদেশে বড় দিনের আবহাওয়াতে অড়হর চাষ করা হয়। এতে বীজ গজানো থেকে ফসল পরিপক্ব হতে প্রায় ৩০০ দিন সময় লাগে। প্রচলিত দেশি জাতের ফলন বেশ কম হয়।

খ. আবহাওয়া ও জলবায়ু : অড়হর একটি গরম আবহাওয়ার ফসল। এর খরা সহ্য করার ক্ষমতা একটি বড় গুণ। এই ফসলের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা ১৮° থেকে ২৯° সেঃ।

গ. **জমি ও মাটি :** অনেক ধরনের মাটিতেই অড়হরের চাষ হতে পারে। যেমন– বেলে দোআঁশ, পলিমাটি ও এঁটেল মাটি। অল্প উর্বর ও কিছুটা লোনা মাটিতেও অড়হরের চাষ হতে পারে। অড়হরের জন্য উত্তম pH মান ৫-৭।

ঘ. **অড়হর চাষের প্রধান প্রধান এলাকা** বাংলাদেশের অনেক জায়গায় অড়হরের চাষ হচ্ছে। কুষ্টিয়া, রাজশাহী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, টাংগাইল ও যশোর অড়হরের চাষ বেশি হয়ে থাকে।

(১) কুষ্টিয়া : দৌলতপুর, মেহেরপুর, গাংনি, জীবননগর, মিরপুর ও ভেড়ামারা।
(২) রাজশাহী : নওয়াবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, গোমস্তাপুর ও মান্দা।
(৩) যশোর : ঝিনাইদহ ও কোতয়ালী।
(৪) কুমিল্লা : উঁচু এলাকা।
(৫) টাংগাইল : উঁচু এলাকা।
(৬) ফরিদপুর : উঁচু এলাকা।

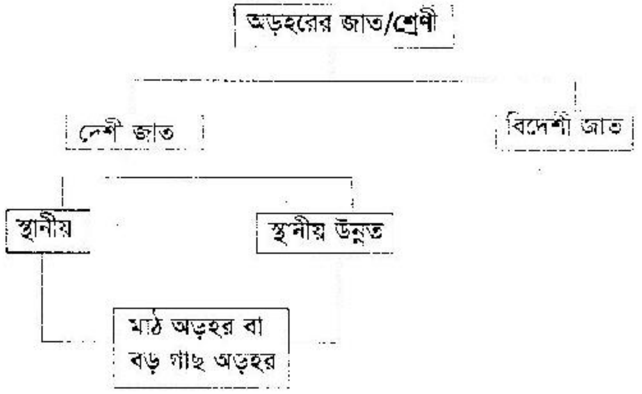

ঙ. **জমি নির্বাচন :** অড়হরের জন্য খুব উত্তমরূপে জমি তৈরির তেমন দরকার হয় না। সাধারণত ১ থেকে ২ বার চাষ ও মই দিতে হয়। বাংলাদেশে আউশ ধানের সাথে অড়হর চাষ হয়। জমি তৈরির সময় জমিকে ভালভাবে সমান করা উচিত।

৫. **বীজ বপন**

ক. **বীজের প্রকার :** আকার, আকৃতি ও বর্ণের ভিত্তিতে অড়হরের বীজ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এগুলোর সংশ্লিষ্ট চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

খ. **বীজ বপন :** বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের ক্ষেত থেকেই বীজ সংগ্রহ করে থাকে। বাজারেও ভাল অড়হর বীজ কিনতে পাওয়া যায়। ঠিকমতো বীজ রাখতে পারলে বীজ গজানোর ক্ষমতা ২ থেকে ৩ বছর পর্যন্ত থাকে।

বাংলাদেশে আউশ ধান বা পাটের সাথে অড়হরের চাষ হয়ে থাকে। মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে আগাম জাতের চাষ হয়ে থাকে (১২৫ দিন থেকে ২৩০ দিন) তবে এসব জমি বেশ

কিছুটা উঁচু হতে হয় যাতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকতে পারে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অড়হর চাষে প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে বোনা হলে বেশ ভাল ফলন পাওয়া যায়।

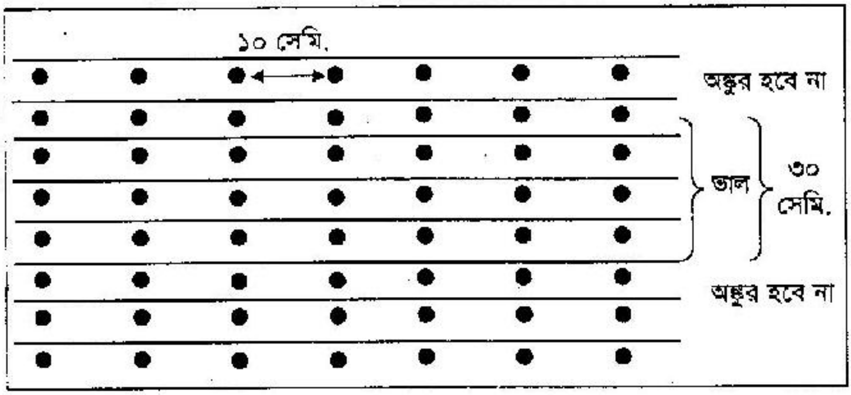

চিত্র ২ : অড়হর বপন নকশা

গ. বীজের হার : অড়হর অন্য ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনা হলে প্রতি হেক্টরে ৪ থেকে ৬ কেজি বীজ লাগে। আর যখন একক ফসল হিসেবে চাষ করা হয় তখন দীর্ঘমেয়াদি জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৮ থেকে ১০ কেজি, মধ্যমমেয়াদি জাতের জন্য ১০ থেকে ১২ কেজি এবং স্বল্পমেয়াদি জাতের জন্য ১২ থেকে ১৫ কেজি বীজ লাগে।

ঘ. বপন পদ্ধতি : একক ফসল হিসেবে যখন অড়হর চাষ হয় তখন বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। আর যখন অন্য ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনা হয় তখন সারি করে অড়হরের চাষ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বীজ ছোট ছোট গর্ত করে বোনা হয়।

ঙ. বীজ বপনের গভীরতা : ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাটির নিচে বীজ বোনা হয়ে থাকে। তবে জমিতে বেশি পানি থাকলে ১.৫ থেকে ২.৫ সেন্টিমিটার নিচে বীজ বোনা উচিত। এতে বীজ পচে যাওয়ার আশঙ্কা অনেক কমে যায়।

৬. অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

প্রথমদিকে অড়হর গাছের বৃদ্ধি বেশ অল্প হয় এবং গাছও বেশ দুর্বল থাকে। তাই এই অবস্থায় আগাছার সাথে পাল্লা দিয়ে অড়হর টিকে থাকতে পারে না। জমিতে খুব বেশি আগাছা হলে ফলনের পরিমাণ ৯০% পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে। এজন্য ভাল ফলন পেতে হলে বীজ বোনার ২০ দিন ও ৪৫ দিন পর ২ থেকে ৩ বার নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন।

পানিসেচ ও নিকাশ : অড়হরে সেচের প্রয়োজন হয় না। খরিফ মৌসুমেই এর চাষ হয়ে থাকে। এই গাছে শিকড় মাটির অনেক নিচু পর্যন্ত চলে যায়। এজন্য উপর স্তরের মাটি কিছুটা শুকনো থাকলেও মাটির অনেক নিচে থেকে গাছ পানি শুষে নিতে পারে।

৭. ফসল বিন্যাস

অড়হর অন্য ফসলের সাথেই বেশি বোনা হয়। তার কারণ হলো প্রথম অবস্থায় অড়হর গাছের বৃদ্ধি খুব কম হয়। তাই স্বল্পমেয়াদি ফসল কেটে নেওয়ার পর অড়হর গাছের বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলাতে আউশ ধান ও অড়হর এবং পাট ও অড়হর একসাথে বোনা হয়। বাংলাদেশে তিন রকম চাষ অবস্থায় লাভজনকভাবে অড়হর চাষ হতে পারে।

(১) ধান ও পাটের সাথে মিশিয়ে বোনা

(২) অড়হর ও মুগ এক মাসে বপন করা অড়হর ও কলাই একসাথে মার্চ ও এপ্রিল মাসে চাষ করা হয়। এতে মুগ মে মাসে কাটা যেতে পারে। সেপ্টেম্বর মাসে অড়হর কাটা যেতে পারে। এই জমিতে আর একটি রবি ফসল অর্থাৎ মশুর, ছোলা ও গমের সাথেও এর চাষ করা যেতে পারে।

(৩) আউশ ধান অথবা পাট একক ফসল হিসেবে বোনা ও কাটার পর সেপ্টেম্বর মাসে অড়হর ও স্বল্পমেয়াদি মুগ একসাথে বোনা যায়। এতে নভেম্বরের মধ্যে মুগ এবং মার্চ মাসে অড়হর কাটা যায়।

৮. সার প্রয়োগ

অন্যান্য ডাল ফসলের মতো প্রথম বিষয় হলো গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রতি হেক্টরে ২০ থেকে ২৫ কেজি নাইট্রোজেন (N) সার দেওয়া উচিত। বিশেষ করে বেলে মাটি বা অনুর্বর জমিতে এই সার দেওয়া প্রয়োজন। জমিতে দস্তার পরিমাণ কম থাকলে ভাল ফলনের জন্য প্রতি হেক্টরে ২০ থেকে ২৫ কেজি জিঙ্ক সালফেট দিতে হয়। আর যদি গাছে দস্তার অভাব দেখা দেয় তবে ০.৫% জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ পাতায় ছিটিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

অড়হর জমিতে ব্যবহারের জন্যে নিচে উল্লেখিতভাবে একটি গড় সারমাত্রা সুপারিশ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগ পদ্ধতি
ইউরিয়া	৪০-৫০	মূলসার
টিএসপি	৭০-৮০	মূলসার
এমপি	৩০-৪০	মূলসার
ডলো চুন	৪০০-৭০০	মূলসার
জিপসাম	২০-২৫	ঘাটতি এলাকা
দস্তা সার	১০-১৫	প্রয়োজনে স্প্রে
বোরন সার	১-৪	প্রয়োজনে স্প্রে
জীবাণু সার	কোম্পানির সুপারিশ অনুযায়ী	প্রয়োজনে স্প্রে
সুষম জৈব সার	১-২ টন (আর্দ্রতা ৮%)	প্রয়োজনে স্প্রে

গড় সুপারিশ ছাড়াও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়নের জন্য মৃত্তিকা বিশ্লেষণ তথ্য ও ফলন মাত্রার ভিত্তিতে অড়হরের জন্য বিএআরসি এর সুপারিশমালা এখানে উল্লেখ করা হলো।

সকল জাতের ক্ষেত্রে গড় ফলন : লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ টন/হেক্টর

ভূমির উর্বরতা	সার সুপারিশ (কেজি/হেক্টর)					
	N	P	K	S	Zn	B
উত্তম	০-৬	০-৯	০-১১	০-৬	-	-
মধ্যম	৭-১২	১০-১৮	১২-২২	৭-১২	০-১	০-.৩
কম	১৩-১৮	১৯-২৭	২৩-৩৩	১৩-১৮	১.১-২	.৪-.৬
খুব কম	১৯-২৪	২৮-৩৬	৩৪-৪৪	১৯-২৪	২.১-৩	.৭-১

৯. ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বছরের জন্য গাছগুলোকে রাখা হলে ফল পরিপক্ব হওয়ার পর তা হাত দিয়ে তুলে নেওয়া উচিত। আর যদি গাছ না রাখা হয় তবে গোড়া থেকে গাছ কেটে ফল সংগ্রহ করতে হয়। তারপর ফল রোদে শুকিয়ে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজকে রোদে ২ থেকে ৩ দিন ভাল করে শুকিয়ে গুদামে রাখা হয়।

ফলন : বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি হেক্টরে উৎপাদনের পরিমাণ ৭০০ থেকে ৮০০ কেজি। এটি অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ কম। প্রতি হেক্টরে ফলন বাড়াতে হলে, উন্নত জাতের বীজ, পরিমাণমতো সার ব্যবহার এবং পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমনের ব্যবস্থা করতে হয়।

১০. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

অড়হর অন্যান্য ডাল ফসলের চেয়ে মাটিতে অনেক বেশি নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে থাকে। *'Rhizobium'* ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে হেক্টর প্রতি ১৮০ থেকে ২২৪ কেজি নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এতে অনুর্বর জমিরও উর্বরা শক্তি বেশ বেড়ে যায়।

১১. অড়হর উৎপাদন প্রযুক্তি (সংক্ষিপ্ত)

মৃত্তিকা ; বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ, জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

বীজ বপন সময় : আগস্ট-সেপ্টেম্বর

বীজ হার : ৪০ থেকে ৫০ কেজি/হেক্টর

সারি থেকে সারির দূরত্ব : ৫০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার

গাছ থেকে গাছের দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার

বীজ বপন গভীরতা : ৪ থেকে ৬ সেন্টিমিটার

পরিচর্যা : বীজ বপনের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন।

রোগ ও পোকা : অড়হরে নিম্নলিখিত ধরনের পোকা ও রোগাক্রমণ ঘটতে পারে।

পোকা : (১) ফল মাজরা (২) ফল মাছি ও (৩) বিছাপোকা

রোগ : (১) উইল্ট (২) কাণ্ড ধ্বসা ও (৩) পাউডারি মিলডিউ

অষ্টম অধ্যায়

মটর চাষ

১. ভূমিকা

উৎস : সম্ভবতঃ মধ্য এশিয়া ; তবে ক্যান্ডলি (Candolle)এর মতে পশ্চিম এশিয়া (দক্ষিণ ককেসাস)। মটর প্রধানত দু' প্রকার যথা–

বাগান মটর (Garden pea)

মাঠ মটর (Field pea)

বাংলাদেশে মটর দু'ভাবে খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচি শিম ও ভিতরের বীজ বড়ি হিসেবে রান্না করা হয় । আর পরিপক্ব মটর ডাল হিসেবে খাওয়া হয়। অন্যান্য ডাল ফসলের মতো মটরও বেশ পুষ্টিকর খাবার। এর ডালে প্রায় ২২.৩% আমিষ আছে। মটরের কচি ও শুকনো গাছ এবং খোসা ও ভূষি গবাদি পশুর খাবার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রায় জমিতে মটরের চাষ হয়ে থাকে।

২. উদ্ভিদতত্ত্ব

মটর এক ধরনের লতানো গাছ। এর দেহে সাধারণত মোমের মতো একটা হাল্কা আবরণ থাকে। বাংলাদেশে দু'ধরনের মটর দেখতে পাওয়া যায়। বাগানের মটর বা বড়ি মটর এবং অন্যটিকে মাঠের মটর বা সাধারণ মটর হিসেবে অভিহিত করা হয় যা থেকে ডাল হয়। এই দু'ধরনের মটরের ও পার্থক্যের বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো–

বিষয়	সাধারণ মটর	বাগানের মটর
বৈজ্ঞানিক নাম	*Pisum sativum* sp. *arvense*	*Pisum. sativum* sp. *hortense*
গাছ	রঙিন গাছ বেশ শক্ত মাটিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।	গাছ বেশ নরম কিন্তু মোটা-সোটা
ফুল	হালকা রঙিন	সাদা
ফল	ছোট আকারের	বড় আকারের
মটর দানা	ছোট ও গাঢ় বাদামি রঙের	দানা বেশ বড়

মটর গাছের শিকড় বেশ গভীর, প্রায় ১০০ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। মাঠের মটর বা সাধারণ মটর গাছের উচ্চতা অনেকটা জাতের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত তিনভাগে এগুলোর ভাগ করা চলে, যেমন–

ছোট জাতের-গাছগুলো লম্বায় ১৫ থেকে ১৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

মধ্যম জাতের গাছের উচ্চতা ৯০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার।

লম্বা জাতের গাছের উচ্চতা ১৫০ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটার।

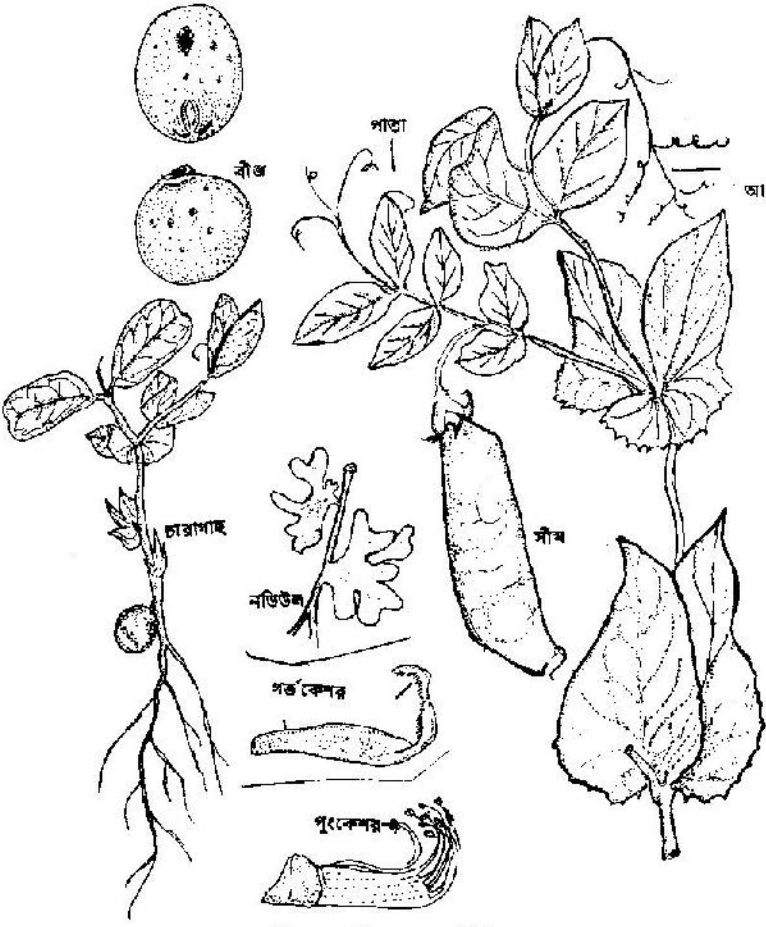

চিত্র ১ : মটর গাছের বিভিন্ন অংশ

৩. জাত

দেশী বা স্থানীয় জাত : বাংলাদেশে মটরের বেশ কয়েকটি দেশি জাতের চাষ হয়ে থাকে। তবে এই দেশি জাতের সংখ্যা অন্যান্য ডাল ফসলের তুলনায় অনেক কম। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাগাতি পাড়া। এই জাতের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। বেশ ভাল করে চাষ করতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

৪. উৎপাদন পরিবেশ

ক. **আবহাওয়া ও জলবায়ু :** মটর একটি শীতপ্রধান দেশের ফসল এবং বাংলাদেশেও শীতকালে এর চাষ হয়ে থকে। মটরের বীজ ৪° সেঃ থেকে ২৪° তাপমাত্রার মধ্যে গজাতে পারে। তবে ভাল বীজ গজানো এবং গাছের বৃদ্ধির জন্য অনুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে ১৩° থেকে ১৮° সেঃ। বাতাসের তাপমাত্রা ২৭° সেঃ এর বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি অনেক কমে যায়, আর তাতে ফলনও অনেক কম হয়। মটর শুষ্ক

আবহাওয়াতেও চাষ করা চলে। যেমন– বছরে ৮০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হলেও মটরের চাষ করা সম্ভব।

খ. **জমি ও মাটি :** অনেক ধরনের মাটিতেই মটরের চাষ করা চলে। যেমন দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ, পলিমাটি ও এঁটেল মাটিতেও এর চাষ করা সম্ভব। তবে মাটি বেশ ঝরঝরে হতে হয় যেন সেখানে বৃষ্টির পানি জমে না থাকতে পারে। খুব বেশি এঁটেল মাটিতে মটরের চাষ ভাল হয় না।

গ. **উৎপাদন এলাকা :** বাংলাদেশে রাজশাহী, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা ও যশোর এলাকায় মটরের চাষ বেশি হয়ে থাকে। যেমন–

রাজশাহী : শিবগঞ্জ, নাটোর, গোমস্তা।

ফরিদপুর : কোতয়ালী, বেয়ালমারি, মাদারীপুর ও নড়িয়া।

ঢাকা : ঘিওর, মনোহরদি ও সাটুরিয়া।

পাবনা : আটঘরিয়া, পাবনা সদর ও শাহাজাদপুর।

যশোর : লোহাগড়া ও মণিরামপুর।

৫. **ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি**

ক. **জমি নির্বাচন ও তৈরি :** অন্যান্য ডাল ফসলের তুলনায় মটরের জন্য ভাল করে জমি তৈরি করতে হয়। ২ থেকে ৩ বার চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি গুঁড়া করতে হয়। ভালভাবে জমি তৈরি না হলে মটরের বীজ অনেক কম গজায়। ভাল ফলন পেতে হলে অন্যান্য ডাল ফসলের তুলনায় মটরের ক্ষেতে অনেক বেশি যত্ন নিতে হয়।

খ. **বীজ বপন :** বাংলাদেশে নভেম্বর ও ডিসেম্বরের প্রথম দিকে মটর বোনা হয়। মৌসুমের প্রথম দিকে অক্টোবর মাসের শেষে চাষ করলে অনেক বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার : বাংলাদেশে প্রতি হেক্টরে ৭০ থেকে ৯০ কেজি বীজ বোনা হয়। ছোট জাতের জন্য দরকার হয় ৫০ থেকে ৯০ কেজি এবং বড় জাতের প্রতি হেক্টর ৮০ থেকে ১৬০ কেজি বীজ দরকার।

বপন পদ্ধতি : বাংলাদেশে মাঠ মটরে বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়। আর বাগান মটর সারি করে গর্ত করে বোনা হয়।

বীজ বোনার গভীরতা অনেকটা মাটিতে পানির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। শুষ্ক জমিতে বেশ গভীরভাবে বীজ বোনা উচিত, তা না হলে বীজ গজানোর পরিমাণ অনেক কমে যায়।

গ. **পরিচর্যা :** মটর গাছ প্রথম দিকেই বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে, এজন্য আগাছা সহজে মটর গাছের খুব একটা ক্ষতি করতে পারে না। তবে বীজ গজানোর ৩০ দিন পর ১ বার নিড়ানি দিতে পারলে ফলন বাড়ে।

ঘ. **পানিসেচ ও নিকাশ :** মটরের চাষ বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করেই করা হয়। বাংলাদেশে শীতকালে মটরের চাষ করা হয়ে থাকে। মটর চাষের জন্য মাটিতে যে

বৃষ্টির পানি জমা থাকে তাই যথেষ্ট। তবে বেলে মাটিতে বা খরার সময় একসময় সেচ দিতে পারলে ফলন বেশ বাড়তে পারে।

৬. ফসল বিন্যাস

বাংলাদেশে একক ফসল হিসেবেই মটরের চাষ করা হয়। তবে অনেক জায়গায় মটর অন্য ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনা হয়। অন্য ফসল যেমন– গম, যব ভুট্টা ও সরিষা এগুলোর সাথে মিশিয়ে মটর বীজ বোনা হয়। পাবনা, কুষ্টিয়া ও যশোর এলাকায় কখনো কখনো ৩ থেকে ৪টি ফসলের সাথে মিশিয়ে বোনা হয়। ফসলগুলো হলো যব, সরিষা, তিল ও খেশারি। নদীর ঢালু পাড় বা শুকনো জমিতে এই ধরনের মিশিয়ে বোনার প্রচলন বেশি দেখা যায়।

৭. সার প্রয়োগ

যে মাটিতে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের পরিমাণ কম সে মাটিতে ১৫ থেকে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন (N) প্রতি হেক্টরে দিতে পারলে মটর গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্যান্য ডাল ফসলের অবস্থা অনুযায়ী ৩৬ থেকে ৯০ কেজি ফসফরাস (P_2O_5) সার ব্যবহার করতে হয়। এজন্য জমির অবস্থা অনুযায়ী ৩৬ থেকে ৯০ কেজি ফসফরাস (P_2O_5) সার ব্যবহার করতে হয়।

৮. ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

মটরের কচি ফল অনেক সময় তরকারি হিসেবে ব্যবহারের জন্য তোলা হয়। পরিপক্ক ও শুকনো মটরের দানা ডাল হিসেবে ব্যবহার।

অন্যান্য ডাল ফসলের মতো মটরের ক্ষেত্রেও ফসল তুলে ৭ থেকে ৮ দিন রোদে শুকিয়ে ফল মচমচে করা হয়। তারপর ফসল মাড়িয়ে ও ঝেড়ে দুই একদিন রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

ফলন : বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি হেক্টরে মটরের জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ৫০০ থেকে ৬০০ কেজি। এটা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। তবে প্রতি হেক্টরে উৎপাদনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাড়ানো যেতে পারে।

(১) উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা।
(২) পরিমাণ মতো সার ব্যবহার করা।
(৩) পোকা ও রোগ দমন করা।
(৪) ভালভাবে পরিচর্যা করা।

৯. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

অন্যান্য ডাল ফসলের মতো মটরের নাইট্রোজেন সংবন্ধন করার ক্ষমতা রয়েছে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, এক হেক্টর পরিমাণ ভাল মটরের জমিতে ৬০ থেকে ৭০ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে সংবন্ধন হতে পারে

১০. মটর উৎপাদন প্রযুক্তি (সংক্ষিপ্তসার)

মৃত্তিকা : বেলে দো-আঁশ থেকে পলি দো-আঁশ কিছুটা লোনা মাটিতে জন্মানো যায়।

বীজ বপন সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর

বীজ বপন পদ্ধতি : ডিবলিং পদ্ধতি

বীজ বপন হার : ৫০ থেকে ৬০ কেজি/হেক্টর

সারি থেকে সারির দূরত্ব : ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার

গাছ থেকে গাছের দূরত্ব : ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার

পরিচর্যা : বীজ বপনের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন

সার প্রয়োগ (প্রতি হেক্টরে)

ইউরিয়া : ৩৫ থেকে ৪৫ কেজি

টিএসপি : ৪০ থেকে ৪৫ কেজি

এমপি : ৩০ থেকে ৪০ কেজি

ডলোচুন : ৪০০–৭০০ কেজি

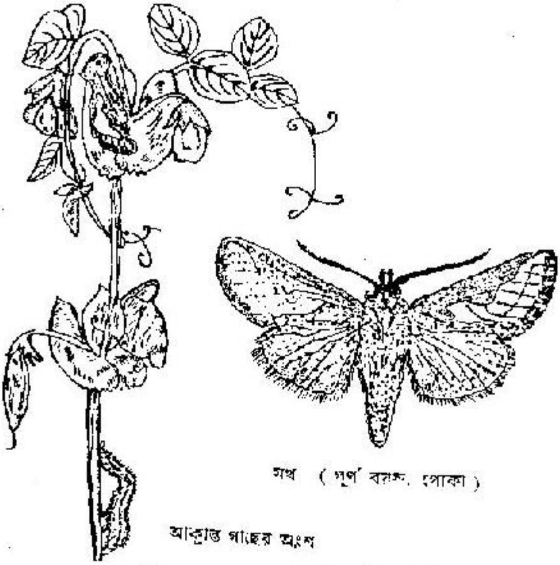

চিত্র ২ : মথ ও আক্রান্ত মটর গাছ

১১. পোকা দমন

মটর শুঁটি অন্তত ৬ ধরনের পোকায় আক্রান্ত হতে পারে। নিচে এগুলো বিবরণ দেওয়া হলো

পোকার নাম	ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
পাতাখেকো পোকা	খাওয়া পাতা শুকিয়ে মরে যায়	(১) স্প্রে ডিডিটি ১০% (২) মিথাইল প্যাকটিয়ন ২৫%
ঘোড়াপোকা	বিছা পাতা খেয়ে ফেলে	(১) স্প্রে-লিনডেন ১% (২) কার্বারিল ১০%

জাবপোকা	কচি ডগা ও পাতা রস চুষে খায়	(১) স্প্রে নিকোটিন সালফেট (৪০%) ১.৬০০ (২) ম্যালাথিয়ন ০.০৩%
ফল মাজরা	ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে দেয়	স্প্রে বিএইচ সি বা ডিডিটি ১০% ২০-২৫ কেজি/হেক্টর
পাতা বিছা	বিছা পাতা খেয়ে ফেলে	স্প্রে-বিএইচসি বা ডিডিটি ১০% ২০ থেকে ২৫ কেজি/হেক্টর

কীড়া

চিত্র ৩ : সবুজ ঘোড় পোকা (*Plusia orchalacea*)-র কীড়া

১২. রোগ দমন

মটর গাছ অন্তত ৬টি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এর মধ্যে প্রধান ৩টি রোগ নিচে বর্ণনা করা হলো।

রোগের নাম ও জীবাণুর নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
পাউডারি মিলডিউ	পাতায় সাদা গুড়া দ্রব্যের উপস্থিতি ও দাগ।	(১) বীজ শোধন-বেনোমিল ০.৫% (২) স্প্রে-সালফেক্স
উইল্ট ও গোড়া	পাতা হলদে হয়ে গাছ মারা যায়। গাছের গোড়া ও শিকড় পচে যায়।	বীজ শোধন- সেরেসান, কাপ্টান বা ব্যাভিস্টিন-প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ থেকে ৩ গ্রাম।
ডাউনি মিলডিউ	পাতার নিচে প্রথমে সাদা ও পরে কালচে দাগ পড়ে। ফলে বাদামি দাগ পড়ে।	স্প্রে কপারসম্পন্ন ছত্রাক-নাশক।

নবম অধ্যায়

সয়াবিন চাষ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে সয়াবিন একটি নতুন ফসল। আমিষ ও ভোজ্য তেল উৎপাদনে সয়াবিন এখন অনেক দেশেই একটি প্রধান ফসল। কারণ এতে শতকরা ৪০-৫০ ভাগ প্রোটিন এবং শতকরা ১৯-২২ ভাগ তেল রয়েছে। তাই স্বল্পমূল্যে প্রোটিন সরবরাহের লক্ষ্যে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সয়াবিন চাষ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি ফলন ১৫০০-২৩০০ কেজি। মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৫০০০ হেক্টর এবং উৎপাদন ৩৭৫০ টন।

শিমজাতীয় ফসলের মধ্যে সয়াবিনেই বেশি প্রোটিন এবং তেল আছে। এতে প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৪০-৪৫% এবং তেলের পরিমাণ প্রায় ১৮-২০%। শর্করা জাতীয় পদার্থের পরিমাণও প্রায় ২৪-২৬%। আজকাল বাংলাদেশে সয়াবিন নানাভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন সয়াবিন থেকে দুধ, রুটি, বিস্কুট ও চাপাতি তৈরি হচ্ছে।

২. উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি

সয়াবিন গাছ বাংলাদেশের বর্তমানে একটি পরিচিত উদ্ভিদ। বৈজ্ঞানিক নাম : *Glycine max*, এই গাছের পরিচিতি নিচে দেয়া হলো।

(১) মৌসুম : বার্ষিক ঋতুভিত্তিক।

(২) পাতা : বড় হালকা সবুজ, করতলাকার।

(৩) শিকড় : প্রধান শিকড় (Tap root) সুবিস্তৃত। ৫০-১০০ সেমি গভীর।

(৪) নডিউল : শিকড়ে নডিউল আছে। মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

(৫) বীজ : বীজ থেকে তেল উৎপাদিত হয়।

(৬) ফুল : ছোট সাদা বা পার্পল।

(৭) ফল : রোমশ, হলদে

৩. বাংলাদেশে সয়াবিন চাষের সম্ভাবনা

সারা বিশ্বের বিবেচনায় তেলবীজ হিসেবে সয়াবিনের স্থান প্রথম। বাংলাদেশে নানা কারণে সয়াবিন চাষ এখনও জনপ্রিয় হয় নাই। বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করার কল-কারখানা না থাকায় সয়াবিন চাষে সমস্যা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ও রংপুরে সয়াবিন চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সঠিকভাবে চাষ করা হলে বাংলাদেশের সয়াবিন একটি সম্ভাবনাময় ফসল। এতে দেশের তেলের ঘাটতি পূরণ হবে, অপরদিকে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে।

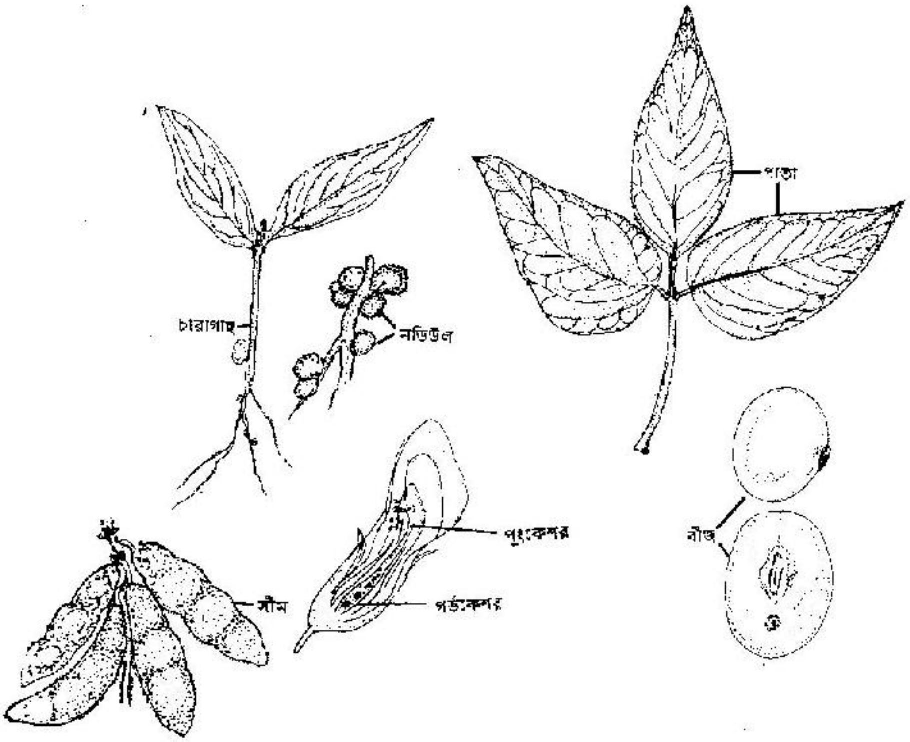

চিত্র ১ : সয়াবিনের বিভিন্ন অংশ

বাংলাদেশে সয়াবিন চাষের সুবিধা নিচে উপস্থাপন করা হলো

১. স্বল্পমেয়াদি	বীজ রোপণের পর অল্পদিনই পাকে। ৩-৪ মাসের মধ্যেই ফসল তোলা যায়।
২. সারা বছরই চাষ করা যায়	আলোক নিরপেক্ষতা স্বভাব থাকার জন্য সয়াবিন, রবি, খরিফ-১, খরিফ-২, বছরের এই তিন মৌসুমেই চাষ করা যায়।
৩. ফলন বেশি হয়	অন্যান্য প্রচলিত তেলবীজের চেয়ে সয়াবিনের ফলন বেশি; অর্থাৎ ২-৩ টন/ হেক্টর।
৪. তেলের মান ভাল	ভোজ্য তেল হিসেবে সয়াবিন তেলের গুণগত মান ভাল সয়াবিন তেলের মধ্যে প্রায় ৫০% লিনোলিক এসিড, ৩-৪% অলিক এসিড এবং ৭% লিনোলিনিক এসিড রয়েছে।
৫. একাধিক জাত রয়েছে	বাংলাদেশে ব্রাগ, ডেভিস, লি এবং সোহাগসহ সয়াবিনের বেশ কয়েকটি জাত ও সারি রয়েছে। জাতভেদে সারা দেশেই সয়াবিনের চাষ করা যায়।

৬. সয়াবিন তেল জনপ্রিয়	বাংলাদেশে ভোজ্য তেল হিসেবে সয়াবিন তেল খুব জনপ্রিয়। তাই সয়াবিন তেল বাজারজাত করার তেমন কোনো সমস্যা এদেশে নেই।
৭. জীবাণুসার পাওয়া যায়	সয়াবিন জমিতে ব্যবহারের জন্য জীবাণুসার ইনোকুলাম বাংলাদেশে পাওয়া যায়।
৮. মাটির উর্বরতা বাড়ে	সয়াবিন চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে মাটির উর্বরতা বাড়ে। পরিবেশের জন্য সয়াবিন চাষ করা ভাল। সয়াবিন চাষ করা জমিতে বছরে ১০০-২০০ কেজি নাইট্রোজেন/হেক্টর জমা হতে পারে। তাই এতে বাড়তি ইউরিয়া দিতে হয় না।
৯. আন্তঃফসল	উপযুক্ত অন্যান্য সাধারণ ফসলের সাথে সয়াবিন অন্তঃফসল হিসেবে চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।
১০. বহুবিধ ব্যবহার	ভোজ্য তেল ছাড়াও বাংলাদেশে সয়াবিনের বহুবিধ ব্যবহার রয়েছে। যেমন– সয়াডাল, সয়াবিস্কুট, সয়ারুটি, সয়াপরাটা, সয়াপিঠা প্রভৃতি।

৪. সয়াবিন চাষের অসুবিধা

বাংলাদেশে সয়াবিন চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানে এর চাষে অনেক সমস্যা রয়েছে। নিচে বাংলাদেশের সয়াবিন চাষের কয়েকটি প্রধান সমস্যা উল্লেখ করা হলো।

১. তেল নিষ্কাশনের যন্ত্রপাতির অভাব	বাংলাদেশে সয়াবিন বীজ থেকে তেল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। এজন্য বীজ বাজারজাতকরণ সমস্যা হয়।
২. বীজ সমস্যা	সয়াবিন বীজ অল্পদিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এজন্য চাষের সময় সয়াবিন বীজ প্রাপ্তি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।
৩. মাটিতে *Rhizobium* ব্যাক্টেরিয়ার অনুপস্থিতি	বাংলাদেশের মাটিতে সয়াবিনে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাক্টেরিয়ার (*Rhizobium japonicum*) উপস্থিতি খুব কম। তাই সয়াবিনের শিকড়ে নডিউল সাধারণত হয় না বা হলেও খুব কম।
৪. ইনোকুলামের অভাব	বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে সয়াবিনের জীবাণুসার ইনোকুলাম পাওয়া যায় না। এজন্য সয়াবিনের ফলন কম হয়।
৫. বহুবিধ ব্যবহারের অপরিচিতি	সয়াবিনের তেল ছাড়াও অন্য উপজাত দ্রব্যের ব্যবহার এখনও সীমিত। তাই সয়াবিনের চাষে লাভ অপেক্ষাকৃত কম।
৬. সয়াবিনের সম্প্রসারণ কম	এদেশের সাধারণ কৃষক সয়াবিনের উন্নত পদ্ধতির চাষাবাদ সম্পর্কে অবহিত নয়।
৭. তেল আমদানি বেশি	বাংলাদেশে সবসময় আমদানি করা সয়াবিন তেল বেশি পাওয়া যায়। এজন্য সয়াবিন চাষের ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ কম।

৫. সয়াবিনের উৎপত্তি ও বিস্তার

সয়াবিন *Glycine* গণের অন্তর্ভুক্ত। এই গণের প্রায় ১০টি প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে *Glycine max* নামক প্রজাতিটি সয়াবিন নামে পরিচিত। *Glycine* -এর অন্যান্য প্রধান প্রজাতির মধ্যে রয়েছে– *Glycine soja, Glycine hispida, Glycine ursuriensis, Glycine tomentosa* এবং *Glycine glacilis*

ইতিহাস মতে, আর্সুরিয়েনিসিস্ প্রজাতির মূল উৎস পূর্ব এশিয়া এবং টমেন্টোসা প্রজাতির উৎস দক্ষিণ এশিয়া সম্ভবত এই দুটি বন্য ধরনের প্রজাতির সঙ্করায়নের দ্বারা গ্লাসিলিস প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে গ্লাসিলিস থেকে পরবর্তীকালে চাষকৃত সয়াবিন জাত উদ্ভাবিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

চীন, জাপান ও কোরিয়াতে প্রাচীনকাল থেকে সয়াবিন চাষ হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। এরপর ১৭৪০-১৯০৮ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে সয়াবিন জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলীয় সকল দেশেই সয়াবিনের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সয়াবিনের চাষ জনপ্রিয় করার জন্য ১৯৪৩ সাল থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে ইদানিং সয়াবিন চাষের জন্য বাংলাদেশে বেশ জোর দেওয়া হচ্ছে।

৬. সয়াবিনের কৌলিতাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তীয় গঠন

সয়াবিনের কৌলিতাত্ত্বিক ও শারীরবৃত্তীয় গঠন নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. ক্রোমোজোম	১০ জোড়া
২. জাত	অবিরত (আগাম জাত) এবং সবিরত (নাবী জাত) উভয়ই রয়েছে।
৩. আলোক নিরপেক্ষতা	অধিকাংশ জাতের ছোট দিনে ফুল আসে।
৪. খরা সহনশীলতা	মধ্যম
৫. লোনা সহনশীলতা	আছে
৬. উচ্চতাপমাত্রা সহনশীলতা	আছে
৭. মাটির চাহিদা	প্রশস্ত
৮. জলাবদ্ধতা সহনশীলতা	নাই

সয়াবিন বীজের অঙ্কুরোদ্গম : সয়াবিন বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও প্রথম দুটি পাতা জন্মাতে প্রায় ৩ দিন সময় প্রয়োজন। বীজের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ২০-৩০° সেলসিয়াসের মধ্যে উঠানামা করে। বীজ সয়াবিন ৪ মাসের বেশি গুদামজাত রাখা ঠিক নয়। বীজ সয়াবিনের অঙ্কুরোদ্গম হার ৭০%-এর বেশি থাকা উচিত।

৭. সয়াবিন জাতের পরিচিতি

বাংলাদেশে সয়াবিনের অনেক জাত আছে নিচে কয়েকটি প্রধান জাতের পরিচিতি উল্লেখ করা হলো–

জাতের নাম	গাছের উচ্চতা (সেমি)	জীবনকাল (দিন)	ফুল	ফলন (কেজি/হেক্টর)	অনুমোদন সাল
ব্রাগ (Bragg)	৪০-৪৫	১০০-১১০	উজ্জ্বল	২.০-২.৫	১৯৮১
ডেভিস (Davis)	৩৫-৪০	১১০-১২০	সাদা	২.০-৩.০	১৯৯১
সোহাগ (পিবি-১)	৬০-৬৫	১১০-১২০	সাদা	২.৫-৩.০	১৯৯১
বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ (জি-২)	৬৫-৭০	১১৫-১২৫	সাদা	২.৫-৩.০	১৯৯৪

উপরে বর্ণিত জাতের মধ্যে বাংলাদেশে বর্তমানে সোহাগ ও জি-২ জাতের চাষ বাড়ছে। সোহাগ জাতটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব জাত ছাড়াও বি এ আর আই-তে অনেকগুলো সম্ভাবনাময় সারি নিয়ে গবেষণা চলছে।

৮. সয়াবিনের জাত

সয়াবিনের বিভিন্ন জাতের বীজের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হতে পারে। যেমন–

(১) বীজের আকার : ছোট, বড় (১০০ বীজের ওজন ২৫ গ্রাম পর্যন্ত)ঃ
(২) বীজের বর্ণ : কালো, বাদামী, ঘিয়ে-হলুদ, সবুজ
(৩) বীজের আকৃতি : গোলাকা, ডিম্বাকার, বৃক্কাকার।

সোহাগ (পিবি-১)

(১) সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ১৯৯১ সালে অনুমোদন করা হয়।
(২) এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি।
(৩) বীজ মাঝারি বড়।
(৪) একশত বীজের ওজন ১১-১২ গ্রাম।
(৫) বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের।
(৬) ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত বপন করলে ফসল সংগ্রহ করতে ১০০-১১০ দিন সময় লাগে।
(৭) জুলাই থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বপন করলে ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে ফসল কর্তন করা যায়।
(৮) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৫ থেকে টন হয়।
(৯) জাতটি পাতার হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।

বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ (জি-২)

(১) ১৯৯৪ সালে অনুমোদন করা হয়।
(২) এ জাতের গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেন্টিমিটার
(৩) বীজ আকারে ছোট।
(৪) একশত বীজের ওজন ৬-৭গ্রাম।
(৫) বীজের রঙ হলুদ।
(৬) খরিফ মৌসুমে বপন করলে ৯০ দিন এবং রবি মৌসুমে বপন করলে ফসল সংগ্রহ করতে ১১৫ দিন সময় লাগে।
(৭) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.৫ থেকে ২.২ টন পাওয়া যায়।
(৮) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশি।
(৯) জাতটি পাতার হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।

৯. সয়াবিন গাছের জীবনচক্র

সয়াবিন গাছের জীবনচক্রকে মোটামুটি প্রধান ৫টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। নিচে এসব বৃদ্ধি পর্যায় উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	বৃদ্ধি অবস্থার নাম	অবস্থার সময় (দিন)	সীমা (দিন)
১.	অঙ্কুরোদগম	৫	৫
২.	দৈহিক অবস্থা	৩০	৫০
৩.	ফুল উৎপাদন	৩০-৫৫	৫০-৯০
৪.	ফল উপাদান	৪৫-৬০	৭০-১০০
৫.	বীজ পরিপক্ব	৬০-৮০	১০০-১৩০

১০. উৎপাদন আবহাওয়া ও জলবায়ু : চাষকৃত অঞ্চলের পরিবেশ ও আবহাওয়ার উপর সয়াবিনের চাষাবাদ পদ্ধতি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। নিচে সয়াবিন চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করা হলো-

ক্রমিক	বৈশিষ্ট্য	পরিবেশ
১.	তাপমাত্রা	২০-৩৫৷3 সেন্টিগ্রেড
২.	বৃষ্টিপাত	মধ্যম থেকে বেশি
৩.	দিবস দৈর্ঘ্য	১২-১৪ ঘণ্টা
৪.	সূর্যালোক	উজ্জ্বল পর্যাপ্ত সূর্যালোক
৫.	মাটি	গভীর পলি দোআঁশ মাটি
৬.	মাটির p^H	৬.৫-৭.৫
৭.	পানির চাহিদা	৪০০-৫০০ মিলি প্রাপ্য পানি
৮.	জলাবদ্ধতা	সহ্য করতে পারে না।

সয়াবিন গাছ সোজা হয় এবং ডালপালা নিয়ে প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা হতে পারে। এর মূল শিকড় ২ মিটার নিচ পর্যন্ত যেতে পারে। অন্যান্য শিকড় মাটির ৩০-৬০ সেন্টিমিটার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রতি থোকায় ৫-১৫টি ফুল থাকতে পারে। সয়াবিনের ফুল ফুটতে ছোট দিনের প্রয়োজন হয়। ফল পরিপক্ক হতে ৭৫-১৬০ দিন সময় লাগে।

ক. **আবহাওয়া :** সয়াবিন গাছ গরম ও স্যাঁতেসঁ্যাতে আবহাওয়ায় ভাল জন্মাতে পারে। এই ফসলের অনুকূল দিনের তাপমাত্রা হচ্ছে ২৪-৩০° সেন্টিগ্রেড। বৃষ্টির পরিমাণ ৬০০ মিলিমিটার এর কাছাকাছি হলে সয়াবিনের চাষ করা যায়।

খ. **জলবায়ু :** সয়াবিন অবউষ্ণ অঞ্চলের ফসল হলেও বর্তমানে এটি উষ্ণ থেকে ৫২° উত্তর অক্ষাংশের অঞ্চল পর্যন্ত চাষ হয়।

সয়াবিন অত্যধিক উষ্ণ বা খুব কম তাপমাত্রা কোনোটিই সহ্য করতে পারে না। অধিকাংশ জাত ছোট দিনে ফুল উৎপাদন করে। ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা অন্ধকার হলে গাছে খুব তাড়াতাড়ি ফুল আসে।

গ. **মাটি :** সয়াবিন অনেক রকম মাটিতেই জন্মাতে পারে। মাটির p^H ৬.৫-৭.৫ হওয়া উচিত। তবে দোঁ-আশ ও বেলে দোঁ-আশ বা এঁটেল দোঁ-আশ মাটিতে সয়াবিন খুব ভাল জন্মে। বর্ষা মৌসুমে উঁচু ও সুনিষ্কাশনযোগ্য জমি এর চাষের জন্য প্রয়োজন। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

১১. ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি

ক. **জমি নির্বাচন ও তৈরি :** সয়াবিনের জন্য ভালভাবে জমি তৈরি করতে হয়। এ ফসলের জন্যে বেশ গভীর চাষের প্রয়োজন। লাঙল দিয়ে গভীরভাবে দুই-তিন চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। এ দেশে ধানী জমিতে গর্ত করে সোজাসুজি বীজ বোনার পরও ফলন পাওয়া গেছে।

খ. **বীজ বপন :** বাংলাদেশে সয়াবিন খরিফ ও রবি এই দুই মৌসুমেই বোনা যেতে পারে। যেমন-

(১) ডিসেম্বর-জানুয়ারি- খরিফ-১।
(২) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর- রবি।
(৩) জুলাই-আগষ্ট- খরিফ-২

গ. **বীজের হার :** সাধারণত হেক্টর প্রতি ৬০-৮০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। তবে ছোট আকারের বীজের জন্যে ৫০-৬০ কেজি বীজ লাগে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫-৬ সেন্টিমিটার হতে হবে

ঘ **বপন পদ্ধতি :** ছিটিয়ে, সারি করে এক মাটিতে গর্ত করে সরাসরিভাবে বোনা যায়। যেমন-

(১) লাঙল ও মই দিয়ে চাষ, সরাসরি বোনা, আর ধান ক্ষেতে গর্ত করে বোনা যায়
(২) মাটিতে যদি পানির পরিমাণ কম না থাকে তাহলে লাঙল দিয়ে চাষ করে বীজ বুনলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
(৩) জমিতে পানির পরিমাণ কম থাকলে বীজ সরাসরি গর্ত করে বোনা উচিত।

ঙ. বীজ বপনের গভীরতা : বীজ সাধারণত ৩-৫ সেন্টিমিটার নিচে বোনা উচিত।

চ. পরিচর্যা : চারা গজানোর কিছুদিন পর নিড়ানি দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ভাল ফলন পেতে হলে ১-২ বার নিড়ানি দেওয়া উচিত।

ছ. পানি সেচ : রবি মৌসুমে সয়াবিন চাষ করলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। জমির মাটি বেশ বেলে হলে ১-২ বার সেচ দিতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রথম সেচ বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ফুল ধরার সময় এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফল পরিপুষ্ট হওয়ার সময় দিতে হবে।

১২. ফসল বিন্যাস

সয়াবিন একক ফসল হিসেবে চাষ করা যেতে পারে। আবার অন্য ফসলের সাথেও মিশিয়ে বোনা যেতে পারে। বাংলাদেশে ভুট্টা, আখ, মিষ্টি আলু, মুগ ও গমের সাথে মিশিয়ে সয়াবিনের চাষ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত চাষের পর্যায়ে সয়াবিনের চাষ হতে পারে। এতে মাটির উর্বরা শক্তি বাড়ে। বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে চাষের নমুনা নিম্নরূপ হতে পারে-

মার্চ/এপ্রিল	জুলাই/আগস্ট	নভেম্বর/ডিসেম্বর
আউশ ধান	রোপা আমন	সয়াবিন
পাট	রোপা আমন	সয়াবিন
আউশ	সয়াবিন	শীতকালীন ফসল (মশুর, গম, ছোলা)

১৩. সার প্রয়োগ

সয়াবিনের জমিতে ১৫-২০ কেজি নাইট্রোজেন (N) সার দেওয়া দরকার। ৩০ কেজি ফসফরাস সার (P_2O_5) দিতে পারলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে খুব ভাল ফলন পেতে হলে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি ফসফরাস সার (P_2O_5) দিতে হবে।

১৪. ফসল সংগ্রহ

ফসল পরিপক্ব হওয়ার সময় হলে গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে। ফলের রং খয়েরি হয়ে শুকিয়ে যেতে। যদি ঠিক সময়ে ফসল কাটা না হয় তবে কিছু জাতের ফল ফেটে গিয়ে ঝরে পড়ে। গোড়া থেকে গাছ কেটে শিকড় মাটির সঙ্গে রাখতে হয়। গাছ রোদে শুকানোর পর একটি লাঠি দিয়ে ফসল মাড়ানো হয়। মাড়ানোর সময় খুব সাবধানে কাজ করতে হয় যেন বীজের ক্ষতি না হয়। ফসল মাড়ানোর পর তা ঝেড়ে রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা হয়।

১৫. বীজ সংরক্ষণ

বাংলাদেশে সয়াবিনের বীজ রাখা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তবে খুব যত্ন নিয়ে বীজ পরিষ্কার করে এবং রোদে শুকিয়ে মজুদ করলে বেশ কিছুদিন বীজ রাখা চলে। বীজে পানির পরিমাণ ১২% এর নিচে কমিয়ে আনা যায় তাহলে এক বছর পর্যন্ত বীজ রাখা যেতে পারে। বীজ পলিথিন ব্যাগে বন্ধ করে রাখলে ১০ মাস পর্যন্ত গজানো ক্ষমতা বিদ্যমান থাকতে পারে।

সয়াবিন বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ৯০ থেকে ১২০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ব হলে গাছগুলো হলুদ হয়ে আসে ও পাতাগুলো ঝরে পড়তে শুরু করে। এ সময় গাছ কেটে কয়েক দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে ফল থেকে দানাগুলো আলাদা করা হয়।

মাড়াই করা বীজ রোদে শুকিয়ে শুষ্ক ও ঠাণ্ডা পরিবেশে গুদামজাত করতে হয়। সাধারণত মৌসুম ও এলাকাভেদে হেক্টর প্রতি সয়াবিনের ফলন ১.৫-২.০ টন হয়।

সয়াবিনের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বেশি দিন বজায় থাকে না। তাই পরবর্তী মৌসুমে লাগানোর জন্য বীজ সংরক্ষণ করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে।

(১) বীজ ভালভাবে ঝেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
(২) রোগাক্রান্ত ও পচা বীজ বেছে ফেলে দিতে হবে।
(৩) মাড়াই করার পর বীজ বিশেষ যত্ন সহকারে শুকাতে হবে।
(৪) সরাসরি সিমেন্টের তৈরি খোলায় না বিছিয়ে ত্রিপল বা চাটাইয়ের উপর বীজ শুকাতে হবে।
(৫) বীজ এমনভাবে শুকাতে হবে যাতে বীজে আর্দ্রতা ১০%-১২% এর মধ্যে থাকে।
(৬) সংরক্ষণের পূর্বে এর অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে।
(৭) কমপক্ষে ৮০% অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।
(৮) বীজ রাখার জন্যে পলিথিনের ব্যাগ, টিনের ড্রাম, আলকাতরা মাখানো মাটির মটকা টিন ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে তবে পলিথিনের ব্যাগ সহজে যেন ছিঁড়ে না যায় সেজন্যে এটা একটা চটের বস্তায় ভরে রাখলে ভাল হয়।
(৯) বীজ ঠাণ্ডা হলে সংরক্ষণ করতে হবে।
(১০) বীজের পাত্র মাচা বা কাঠের তক্তার উপর রাখলে ভাল হয়।
(১১) বীজের আর্দ্রতার দিকে নজর রাখতে হবে।
(১২) বীজের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে প্রয়োজন মতো রোদে শুকিয়ে নিতে হবে এবং পূর্বের মতো পাত্রে রেখে দিতে হবে।

১৬. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন

সয়াবিন বাংলাদেশে অন্যান্য ডাল ফসলের মতো মাটিতে বেশ নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারে। এই ফসল প্রতি হেক্টরে প্রায় ১০০ কেজি নাইট্রোজেন বাতাস থেকে মাটিতে সংবন্ধন করতে পারে।

উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা হলো

জমি চাষ	৪ থেকে ৫টি চাষ মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।
গাছের সংখ্যা	প্রতি মিটার সারি দৈর্ঘ্যে ১২ থেকে ১৪টি গাছ।
বীজ হার	৬০-৮০ কেজি/ হেক্টর।
রোপণ দূরত্ব	৩০-৪০ সেন্টিমিটার (খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০ সেন্টিমিটার দেয়া যায়)
গাছ থেকে গাছের দূরত্ব	১৫-২০ সেন্টিমিটার
বীজ বপন গভীরতা	৩-৫ সেন্টিমিটার

আগাছা দমন : জমি ৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

বীজ বপন সময় : বাংলাদেশে সারা বছরই অর্থাৎ তিন মৌসুমেই সয়াবিনের বীজ বপন করা যায়। যেমন-

ক্রমিক	মৌসুম	সময়সীমা
১.	রবি মৌসুম	ডিসেম্বর- জানুয়ারি (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মৌসুম)
২.	খরিফ-১	জুন-জুলাই (জুন থেকে অক্টোবর মৌসুম)
৩.	খরিফ-২	আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (অগস্ট থেকে ডিসেম্বর মৌসুম)

প্রকৃতপক্ষে বীজ বপন সময় পূর্ববর্তী ফসল কাটা এবং জমি প্রস্তুতের সময়ের উপরে নির্ভর করে কমবেশি হয়ে থাকে।

রবি মৌসুমে রোপা আমন ধান কাটার পর সয়াবিনের বীজ বপন করতে হয়। খরিফ-১ মৌসুমে উঁচু জমিতে গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজি চাষ করা জমিতে সয়াবিনে চাষ করা যায়। তারপর খরিফ-২ মৌসুমে পাট বা আউশ ধান কেটে তারপর সেই জমিতে সয়াবিনের চাষ করা যায়। খরিফ-২ মৌসুমে রোপা আমন ধানের জমিতে এলাকাভেদে আন্তঃফসল হিসেবেও সয়াবিনের চাষ করা যায়।

বীজ শোধন : সয়াবিন ফসলে রোগ দমনের জন্যে বীজ শোধন করা প্রয়োজন। নিচে উল্লেখিত ওষুধ প্রয়োগ করে সয়াবিনের বীজ শোধন করা যায়।

(১) গ্রানোসান-এম।
(২) এগ্রোসান-৫।
(৩) প্যানোক টন।

উপরে বর্ণিত যে কোনো একটি প্রতি কেজি বীজের জন্যে ১২-১৫ গ্রাম হারে প্রয়োগ করে বীজ শোধন করা যায়। এভাবে শোধন করে বীজ বপন করলে জমিতে সয়াবিনের ছত্রাক- ঘটিত রোগের আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হবে।

ইনোকুলাম প্রয়োগ : সয়াবিনের ফলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজের জন্য সুপারিশকৃত জীবাণুসার ইনোকুলাম ব্যবহার করতে হয়। ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা হলে বীজ শোধনের ২-৩ সপ্তাহ পর বীজ বপনের আগে ইনোকুলাম প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইনোকুলাম পাওয়া গেলে বপনের আগে বীজের সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : প্রথম সেচ বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে (ফুল ধরার সময়) এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে (শুঁটি গঠনের সময়) দিতে হয়।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হয়। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হয়। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০টি গাছ রাখা উত্তম।

১৭. **সয়াবিনের পোকা দমন** : সয়াবিনের প্রধান প্রধান পোকার নাম, ক্ষয়ক্ষতি ও প্রতিকার নিচে উল্লেখ করা হলো-

পোকার নাম	ক্ষয়ক্ষতির ধরন	প্রতিকার
শিম মাছি (Bean fly)	পোকা পাতায় ডিম পাড়ে। শূককীট পাতার বোঁটা ছিদ্র করে। এতে চারা গাছ মারা যায়।	রিপকর্ড-১০ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে প্রয়োগ বা নগস প্রয়োগ।
সয়াবিনের পাতা মোড়ানো পোকা (Leaf folder)	শূককীট গাছের পাতা মোড়ায়।	সুমিথিয়ন-৫০ প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে প্রয়োগ।
পাতা গর্তকারী পোকা (Leaf miner)	লালচে বিছা পাতায় গর্ত করে। পাতা জালের মতো দেখায়। পাতা ঝরে যায়।	সিম্বুশ ১০ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে প্রয়োগ
সবুজ গান্ধী (Green soldier bug)	শূককীট বা কীড়া ফল ও বীজের রস চুষে খায়।	নগস প্রয়োগ (নির্দেশনা অনুসারে)
ফল ছিদ্রকারী (Pod borer)	শূককীটে কচি ফল খেয়ে ফেলে	ফলিথিয়ন-৫০ প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে প্রয়োগ।

১৮. সয়াবিনের রোগ দমন

সয়াবিনে নানা ধরনের রোগ হয়। নিচে সারণিতে সয়াবিনের কয়েকটি প্রধান রোগ ও তার প্রতিকারের বর্ণনা দেওয়া হলো-

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার
চারা পচা (Seedling rot)	চারার গোড়া পচে যায়। চারা বাদামি রং ধারণ করে।	ভিটাভেক্স-২০০ দ্বারা শোধন।
শিকড় পচা (Root rot)	শিকড় পচে যায়। কাণ্ডে গাঢ় বাদামি দাগ থাকে।	রোভরাল-৫০ ডব্লিউ পি ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে স্প্রে। ১০ থেকে ১৫ দিন অন্তর কয়েকটি স্প্রে।
কয়লা পচা (Charcol rot)	গাছের গোড়ায় কয়লার গুঁড়ার মতো কালো কালো বস্তু দেখা যায়।	টিল্ট-২৫০ একই প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ।
এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)	চারা ও বয়স্ক গাছ আক্রান্ত হয়। কাণ্ডে গাঢ় বাদামি দাগ পড়ে।	ডাইথেন এম-৪৫ একই প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ।
সয়াবিন মরিচা (Soybean rust)	পাতার নিচের দিকে হালকা বাদামি থেকে লালচে বর্ণের দাগ। পাতা ঝরে যায়	ঐ
ব্যাকটেরিয়াল পস্টুল (Bacterial postule)	পাতার নিচের দিকে হলদে গোলাকার দাগ। দাগের কেন্দ্র বাদামি।	ঐ

হলদে মোজাইক রোগ	পাতায় সোনালি হলদে দাগ। এই রোগ জাবপোকা দ্বারা বিস্তৃত হয়।	জাব পোকা দমন ম্যালাথিয়ন ৫০.২৫ অাউন্স/হেক্টর
এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)	পাতায়, কাণ্ডে ও ফলে গর্তের মতো বাদামি দাগ দেখা যায়। চারা ও বয়স্ক গাছ আক্রান্ত হয়।	বীজ শোধন : ভিটাভেক্স-২০০ বা কাপ্টান, ২-৩ গ্রাম/কেজি বীজ স্প্রে, ডাইথেন-এম ৪৫ প্রতি কেজি প্রয়োগ।
গোড়া পচা (Foot rot)	পাতা হলদে হয়ে যায়। গাছের গোড়া কালো হয়ে যায়। সেখানে সাদা মাইসেলিয়া ও স্কেরোশিয়া দানা দেখা যায়। চারা গাছ মরে যায়।	বীজ শোধন : ভিটাভেক্স-২০০ বা কাপ্টান, ২-৩ গ্রাম/কেজি বীজ।

১৯. সয়াবিনের আন্তঃফসল

আখের সাথে আন্তঃফসল : জমি প্রস্তুতের সময় গোবর সার প্রয়োগ করতে হয়। আখের দুই সারির মাঝখানে সকল সার প্রয়োগ করতে হয়। আখের দুই সারির মাঝখানে সকল সার প্রয়োগ করতে হয়। যেখানে সয়াবিন প্রথম চাষ করা হয়, সেখানে প্রতি কেজি বীজের জন্যে ২০ গ্রাম হারে জীবাণুসার ব্যবহার করতে হয়। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

সয়াবিন + আখ আন্তঃফসলের চাষ পদ্ধতি

সয়াবিন জাত	:	সোহাগ (পি বি-১)
বীজ বপন সময়	:	মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য জানুয়ারি
বীজের হার	:	৭৫ থেকে ৮০ কেজি/হেক্টর।
রোপণ দূরত্ব	:	সারি থেকে সারি-৩০ সেন্টিমিটার গাছ থেকে গাছ -৮ সেন্টিমিটার।

২০. চাষাবাদ পদ্ধতি

(ক) জমি তৈরি : জমির প্রকারভেদে প্রয়োজনমতো ৪ থেকে ৬টি চাষ ও মই দিতে হয়। শুকনো মৌসুমে গভীর করে ঝুরঝুরে করতে হয়। বৃষ্টির পর কাদার উপরে বীজ বপন করা যেতে পারে তবে লক্ষনীয় সে জমিতে যেন পানি জমে না থাকে

(খ) বীজ বপনের সময়

রবি মৌসুম (শীতকাল) : নভেম্বর-ডিসেম্বর/ডিসেম্বর-মধ্য জানুয়ারি
বর্ষা মৌসুম : মধ্য জুলাই-আগস্ট।
শরৎ কালে : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।

(গ) বপন পদ্ধতি : সারিতে বেশি লাগানো হয়। তবে ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়।

(ঘ) বীজহার

শীত মৌসুম : ৭৫-৮০ কেজি/হেক্টর
বর্ষা মৌসুম : ৮৫-৯০ কেজি/হেক্টর

শরৎ মৌসুম : ৭৫-৮০ কেজি/হেক্টর

(ঙ) রোপণ দূরত্ব : ২৫-৩০ সেন্টিমিটার × ১০-১৫ সেন্টিমিটার।

(চ) সার : নিম্নলিখিত পরিমাণে NPKS সার দিতে হয়–

N : ৭-১২ কেজি/হেক্টর
P : ১১-২০ কেজি/হেক্টর
K: ১৭-৩২ কেজি/হেক্টর
S : ৭-১২ কেজি/হেক্টর

[উৎস: Fertilizer Recommendation Guide-1997]

প্রয়োগের সময় অন্যান্য পদ্ধতি

$\frac{১}{২}$ N + অন্যান্য সার শেষ জমি চাষের সময়

$\frac{১}{২}$ N+ বপনের ৪-৫ সপ্তাহ পর।

(ছ) আন্তঃপরিচর্যা

আগাছা দমন : বীজ বপনের ২০ থেকে ২৫ দিন পর একবার এবং সম্ভব হলে বপনের ৪০ থেকে ৪৫ দিন পর আর একবার নিড়ানি দেওয়া ভাল।

সেচ : শীত মৌসুমে বপনের ২৫ থেকে ৩০ দিন পরপর একবার সেচ দিতে হয়। গাছ কিছুটা বড় হলে আর একবার সেচ দিলে বীজ পুষ্ট হয় এবং ফলন ভাল হয়। বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়।

(জ) পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

পোকা : (১) বিছাপোকা (২) পাতা মোড়ানো পোকা

দমন : ডাইমেক্রন ১০০ ইসি ১ কেজি/ ৩০ $\frac{১}{২}$ মণ পানি, ১-২ বার স্প্রে।

রোগ : রোগের মধ্যে এনথ্রাকনোজ পাতায় দাগ, মোজাইক উল্লেখযোগ্য।

(ঝ) ফসল কর্তন : নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনার্থে সয়াবিন ফসল কর্তন করতে হয়:

সয়াবিন পরিপক্কতার লক্ষণ

(১) গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে।
(২) গাছে সয়াবিন বীজ বাদামি রঙ ধারণ করে।
(৩) বীজ শক্ত (Hard dough) অবস্থায় যায়।

এমতাবস্থায় গাছের গোড়া কেটে ফসল সংগ্রহ করা হয়। ফসল তোলার পর ২-৩ দিন রোদে ভালভাবে শুকিয়ে অন্যান্য ফসলের মতো লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করা হয়। ভালভাবে শুকিয়ে মটকা, টিন বা পলিথিন ব্যাগে সংরক্ষণ করা হয়।

(ঞ) ফলন : জাতভেদে সয়াবিনের ফলনে তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন–

(১) ব্র্যাগ : ১২৮০-১৪৫০ কেজি/হেক্টর।

(২) ডেভিস : ১৪০০-১৬০০০ কেজি/হেক্টর।

(৩) সোহাগ : ১৬০০-১৮০০ কেজি/হেক্টর।

(ট) **ব্যবহার :** নিচে সয়াবিনের ব্যবহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

(১) বীজে ৪২-৪৫% প্রোটিন ও ২০-২২% উন্নতমানের তেল থাকে। এটি ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(২) ডাল ও তেলের মাঝামাঝি ফসল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) বায়ুমণ্ডল থেকে N_2 সংবন্ধন করে মাটির উর্বরতা বাড়াতে পারে।

(৪) ডাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৫) ডালডা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(৬) তেল দ্বারা আচার ও মাছ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

(৭) কারখানায় সাবান, কসমেটিকস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(৮) আমিষ সমৃদ্ধ সয়াবিন দ্বারা নানা রকমের পুষ্টিকর খাবার যেমন–সয়াডাল, সয়াখিচুড়ি, সয়ামিষ্টিকুমড়া, তরকারি, সয়াপোলাও, সয়াদুধ ও সয়ামিষ্টিপিঠা তৈরি করা যায়। তাছাড়া সয়াবিস্কুট ও সয়ারুটিও তৈরি করা যায়।

BARSCOG Library ★ Dhaka ★

দশম অধ্যায়

ফেলন চাষ

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রচলিত ডাল ফসলগুলোর মধ্যে ফেলনের স্থান যদিও নগণ্য তথাপি চট্টগ্রাম, ভোলা, ফেনী অঞ্চলের মানুষের নিকট এ ডাল অত্যন্ত সুপরিচিত। বাংলাদেশে মোট ১৯ হাজার হেক্টর জমিতে ফেলন চাষ হয় এবং এ থেকে সাড়ে ১৩ হাজার টন ফেলন বীজ উৎপাদিত হয়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ডাল খুবই জনপ্রিয়। সবুজ ফল তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়।

২. ফেলনের জাত

ফেলনের জাত সারি ফেলন-১ (বোস্তামী) : চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই করে প্রাথমিক অগ্রবর্তী এবং বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পরে দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আবাদের জন্য ১৯৯৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

(১) গাছের ডগা ও পাতা হাল্কা সবুজ।
(২) গাছ খাড়া।
(৩) অত্যাধিক পুষ্টি এবং পানি পেলে লতানো হয়ে যায়।
(৪) জীবনকাল ১২৫ থেকে ১৩৫ দিন
(৫) বীজের উপরের আবরণ ছাই রঙের সাথে কালো দাগ থাকে।
(৬) হাজার বীজের ওজন ৯০ থেকে ১০০ গ্রাম।
(৭) হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১.২ থেকে ১.৪ টন।
(৮) আমিষের পরিমাণ ২৭ থেকে ২৮% ভাগ।
(৯) বীজ ও খোসার অনুপাত প্রায় ৩ : ১।

৩. ফেলনের প্রাথমিক বৃদ্ধি অবস্থা

বীজের অঙ্কুরোদগম বীজ বপনের ২-৩ দিন পর হয়।

বীজ থেকে বীজপত্র ও শিকড় উৎপাদন হয়। বীজ বপনের ৪-৬ দিন পর হয়।

বীজের অঙ্কুরোদগমের পর প্রকৃত দুই পাতা অবস্থা। এর পরই তিন পাতা অবস্থা শুরু হয়। বীজ বপনের ৯-১০ দিনের মধ্যে এরকম হয়ে থাকে।

৪. নতুন জাতের ফেলন গাছের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে ফেলন ফসলের একটি উন্নত জাত অনুমোদিত হয়েছে। এ জাতের নাম বারি ফেলন-১। এ জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) গাছের ডগা ও পাতা : হালকা সবুজ।
(২) গাছের গড়ন : মধ্যম খাড়া।
(৩) জীবন কাল : ১৩৫ দিন।
(৪) বীজের রং : ধূসর।
(৫) হাজার বীজের ওজন : ১১৭ গ্রাম।
(৬) ফলন : ১.৩ টন/হেক্টর।

বীজ বপন : নভেম্বর-ডিসেম্বর।

বীজের হার : ৫০ কেজি/হে ছিটানো (৩০ × ২০ সেমি) ; ৪০ কেজি সারিতে।

চিত্র ১ : ফেলন পাতা ও পড

১০. চাষ পদ্ধতি

বীজ বপন সময় : ডিসেম্বর-জানুয়ারি।

বীজের হার : ৪০-৪৫ কেজি/হেক্টর।

বপন : ছিটানো ও সারি –এ দু'পদ্ধতিতেই ফেলন চাষ করা যায়।

সারির দূরত্ব : ২০-৩০ সেন্টিমিটার

গাছের দূরত্ব : ১৫-২৫ সেন্টিমিটার।

বীজ বপন গভীরতা : ৩-৫ সেন্টিমিটার।

গাছের সংখ্যা : ১৫-২০ টি/মিটার সারি : আগাম একমালা পরিপক্ব জাতের জন্য ১০-১২টি মিটার সারি। এটি মধ্যম সময়সীমার অসম পরিপক্ব জাত।

আগাছা দমন : জমি বীজ বপনের ৪০ দিন পর্যন্ত আগাছা মুক্ত রাখতে হয়।

পানি সেচ ও নিকাশ : দৈহিক ও ফুল উৎপাদন শুরু করার পর্যায়ে ১-২ বার সেচ দেওয়া দরকার। ফুল উৎপাদনের শেষ দিনে যাতে জমিতে পানি না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

১১. ফসল সংগ্রহ : ফল সংগ্রহ করার পর গাছ জমিতে রাখা যায়। ফসল কাটার সময় ফেলনের কিছু সংখ্যক ফল কচি থাকতে পারে। কারণ অনেক জাতের গাছে ফল এক সাথে থাকে না। যেমন- অনিয়ত (Indeterminate type) জাত আবার কোনো কোনো জাতের অধিকাংশ ফল এক সাথে পরিপক্ব হতে থাকে। যেমন নিয়ত (Determinate type) জাত।

১২. ফেলনের ফলন নির্ণয়

নিচে উল্লেখিত উপাদানের উপর ফেলনের উৎপাদন নির্ভর করে। যেমন–

(১) প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা
(২) প্রতি গাছ ফলের সংখ্যা
(৩) প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা
(৪) বীজের ওজন

ফলনের উৎপাদন নির্ণয়ের সূত্রটি নিম্নরূপ

বীজের উৎপাদন = (প্রতি বর্গমিটারে গাছের সংখ্যা) প্রতি গাছ পড বা ফলের সংখ্যা X প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা X শত বীজের ওজন (গ্রাম) X ০.১ কেজি/হেক্টর

১৩. ফেলনের আন্তঃফসল

গোমটর+ ভুট্টা আন্তঃফসল

গোমটর বা ফেলন : ৪ সারি, সারি থেকে সারির দূরত্ব = ২০–৩০ সেন্টিমিটার

ভুট্টা : ২ সারি : ৩৭.৫ সেন্টিমিটার/১৫০ সেন্টিমিটার/৩৭.৫ সেন্টিমিটার।

একাদশ অধ্যায়

মাঠ ও গুদাম পর্যায়ে ডাল ফসলের সমন্বিত বালাই দমন

১. সংজ্ঞা ও ধারণা

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো এমন একটি ধারণা বা জ্ঞান যার দ্বারা পরিবেশের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য একধিক দমন ব্যবস্থাকে একযোগে ব্যবহার করে ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও রোগকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা যায় যাতে কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো একটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যা পরিবেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং উপযোগী সব রকমের দমন পদ্ধতি ব্যবহার করে কোনো বালাইকে তার অর্থনৈতিক ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে রাখা হয়।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management-IPM) বলতে ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাইকে দমনের জন্য প্রয়োজনে একের অধিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে বোঝায়, যার ফলে :

(১) পরিবেশ দূষিত না হয়।

(২) উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণ, বালাই সহনশীল জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার এবং সর্বশেষ উপায় হিসেবে বালাইনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বিজ্ঞানী Botrell (1979) এর মতে *"IPM হলো কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে বালাই দমনের পদ্ধতিসমূহ নির্বাচন, সমন্বয় সাধন ও বাস্তবায়ন"।*

২. গুরুত্ব

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়, রোগবালাই, আগাছা, ইঁদুর প্রভৃতি ডাল ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। আমাদের দেশে শুধু পোকামাকড় দ্বারা প্রতি বছর শতকরা প্রায় ১৫ থেকে ২০ ভাগ ফসল নষ্ট হয়, যার মূল্য প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই গরীব, অশিক্ষিত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাবে এসব শত্রু থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য যত্রতত্র বালাইনাশক ব্যবহার করে থাকে– এতে পরিবেশ দূষণ, স্বাস্থ্যহানি এবং কৃষকদের আর্থিক ক্ষতিই হয়।

যত্রতত্র কীটনাশক ব্যবহারের ফলে উপকারী পরভোজী পোকামাকড়, পরজীবী পোকা মারা যায়, ফলে জৈবিক দমন বাধাগ্রস্ত হয়। কীটনাশক প্রয়োগের ফলে মৌমাছি ও বোলতা প্রভৃতি ধ্বংস হয়, ফলে অনেক ফসলের পরাগায়নে বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয় ও ফলনও কমে যায়।

ফসল সংরক্ষণ ও ভাল ফলনের জন্য এটি একটি আধুনিক ও উপকারী কলাকৌশল। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে অবস্থাভেদে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে ফসলের বালাই দমন করা এবং একই সাথে পরিবেশ যাতে দূষিত না হয় তার ব্যবস্থা করা।

বিষাক্ত কীটনাশক কম ব্যবহারের ফলে ফল-মূল বিষাক্ত হয় না এবং এতে ক্ষতিও হয় না। এ ব্যবস্থাপনায় পোকা-মাকড়, রোগবালাই, আগাছা, ইঁদুর ইত্যাদি বালাই দমনের ব্যবহারে সমন্বয় সাধন করে একটি সার্বিক বালাই দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও যদি পোকা বা রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে আর্থিক ক্ষতির পর্যায়ে পৌঁছার উপক্রম হয় তখনই কেবল বালাইনাশক সঠিকভাবে, সঠিক নিয়মে, সঠিক পরিমাণে ও সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হয়।

ক্ষতিকারক বালাইনাশক ওষুধের ব্যবহার সীমিত হলে, পরিবেশ নির্মল থাকে, উপকারী পরভোজী পোকমাকড় ও জীবজন্তুর জীবন ঝুঁকিমুক্ত থাকে এবং কৃষকদের আর্থিক সাশ্রয় হয়।

৩. **সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা IPM (Integrated Pest Management)-এর উদ্দেশ্য**

নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

(১) একক কোনো দমন পদ্ধতি ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় এবং রোগ দমনের জন্য ব্যবহার না করা ;

(২) ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও রোগ দমনের জন্য একাধিক পদ্ধতি যথা– জৈবিক দমন, বালাই সহনশীল জাতের ব্যবহার, যান্ত্রিক উপায়ে দমন, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও রাসায়নিক পদ্ধতির সমন্বয় করা ;

(৩) রাসায়নিক দমন পদ্ধতি প্রথমে ব্যবহার না করা ;

(৪) সর্বশেষে উপায় হিসেবে রাসায়নিক দমন পদ্ধতি গ্রহণ করা।

IPM-এর মূলনীতি : নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো–

(১) সুস্থ সবল ফসল জন্মানো ;

(২) কোনো একটি ফসলের জমির ইকোসিস্টেমকে (Ecosystem) ব্যবস্থাপনা একক হিসেবে বিবেচনা করে তার বিভিন্ন সমস্যাবলি সঠিকভাবে জরিপ ও পরিবীক্ষণ করা ;

(৩) বিভিন্ন আপদ বালাই দমনে এগুলোর প্রাকৃতিক শত্রুদের সার্বিক ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক শত্রুর বংশবৃদ্ধি ঘটানো ও যথাযথ সংরক্ষণ করা ;

(৪) একক কোনো দমন ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করা ;

(৫) আপদ বালাই দমনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃষকদের সক্ষম করে তোলা।

IPM-এর উপকারিতা : নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো

(১) আই পি এম গ্রহণের ফলে উপকারী পোকামাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশু-পাখি ও গুইসাপ প্রভৃতি সংরক্ষণ করা যায় ;

(২) বালাইনাশকের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। ফলে যথেচ্ছা ব্যবহার না হওয়ার কারণে উৎপাদন খরচ কম হয় ;

(৩) বালাইনাশকের পরবর্তী বা পার্শ্বক্রিয়া রোধ করা সম্ভব হয়। ফলে বালাইনাশক-জনিত দুর্ঘটনা সহজেই এড়ানো সম্ভব হয় ;

(৪) ক্ষতিকারক পোকা এবং মাকড় সহনশীলতা অর্জন করার সুযোগ পায় না ;

(৫) বালাইয়ের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ বালাইনাশকের প্রতি প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে না পারে সেজন্য IPM সাহায্য করে ;

(৬) পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে;

(৭) জনস্বাস্থ্য ভাল রাখে।

IPM-এর উপাদান : IPM-এর কার্যাবলী পাঁচটি উপাদান বিভক্ত যথা–

ক. **আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ :** নিম্নলিখিত উপায়ে ফসল চাষাবাদ করা প্রয়োজন।

(১) রোগমুক্ত বীজ বপন করা ;
(২) ভালভাবে জমি তৈরি করা ;
(৩) সময়মতো আগাছা দমন করা ;
(৪) ফসলের অবশিষ্টাংশ এবং আবর্জনা পুড়ে ধ্বংস করা ;
(৫) উপযুক্ত ফসল পর্যায় অবলম্বন করা ;
(৬) পোকামুক্ত ও রোগমুক্ত চারা রোপণ করা ;
(৭) রোগবালাই ও পোকামাকড় দমনের জন্য যথাসময়ে পানিসেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করা ;
(৮) স্যাঁতসেঁতে, কম আলো-বাতাস ও ছায়াযুক্ত স্থানে ফসলের চাষ না করা ;
(৯) সময়মতো ফসলের বীজ বপন বা রোপণ করা ;
(১০) সারি করে ও সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ করা ;
(১১) জমিতে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা ;
(১২) বৃষ্টির পরপরই জমিতে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ না করা।

খ. **পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ :** অধিক ফলনের জন্য যেসব জাত পোকামাকড় ও রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সেসব জাতের চাষ করা উচিত। যেসব ফসলের জাত পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সেসব গাছের রোগবালাই কম হয়। অনেক রোগের জীবাণু পোকার আক্রমণে যে ক্ষত হয় সে ক্ষত দিয়ে গাছের ভিতরে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

গ. **যান্ত্রিক উপায়ে দমন :** পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় এ পদ্ধতি বেশ কার্যকরি। নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে ফসলের বালাই দমন করা যেতে পারে–

১। হাতজালের সাহায্যে পোকা ধরা ও ধ্বংস করা ;
২। হাত দিয়ে পোকা সংগ্রহ করা ও মারা– যেসব পোকা, পোকার ডিম বা পোকার কীড়া এক জায়গায় গাদা হয়ে থাকে সেগুলো সংগ্রহ করে ধ্বংস করা ;
৩। জমিতে বা ক্ষেতে ডালপালা পুঁতে পোকাখাদক পাখি বসার ব্যবস্থা করা ;

(৪) আলো-ফাঁদ ব্যবহার করা ;

(৫) আক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ পুড়ে ধ্বংস করা– রোগাক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ পুড়ে রোগের আক্রমণ অনেকাংশে কমানো ;

(৬) জমিতে পানি দিয়ে লেদাপোকা দমন করা ;

(৭) জমি থেকে পানি সরিয়ে পোকা দমন করা ;

(৮) বিষ ফাঁদ ব্যবহার করে মাছি পোকা দমন করা ;

(৯) পোকাক্রান্ত কাণ্ড, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে পুড়ে ধ্বংস করে পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো;

(১০) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ;

ঘ. **উপকারী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণ :** প্রকৃতিতে অনেক পোকামাকড় আছে যেগুলো ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমনে সাহায্য করে। এগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

পরভোজী পোকামাকড় : পরভোজী পোকামাকড় অনিষ্টকারী পোকামাকড় খেয়ে অথবা দেহ থেকে রস শুষে দমন করে। একটি পরভোজী পোকা বেশ কয়েক জাতের পোকা খেয়ে থাকে। পরভোজী পোকামাকড় ও প্রাণী এসব অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের সাথে বা আশে-পাশে থাকে এবং এগুলোকে খেয়ে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ– ব্যাঙ, পাখি, মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, মিরিড বাগ, ম্যানটিড, টাইগার বিটল, অ্যাসাসিন বাগ, ড্রাগন ফ্লাই, ড্যামসেল ফ্লাই।

পরজীবী পোকা : একটি পরজীবী পোকা একই জাতের পোকামাকড় দমন করে। পরজীবী পোকার কীড়াই এ কাজ করে থাকে। এসব পোকার মধ্যে বোলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ফসলের অনিষ্টকারী পোকার পরজীবী, পরভোজী ও রোগজীবাণু যথা– ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি ক্ষেতে সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এগুলোকে সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করতে হলে–

(১) শুধু আক্রান্ত স্থানে কীটনাশক স্প্রে করা ;

(২) নির্ধারিত কীটনাশক ব্যবহার করা ;

(৩) পরজীবী বুস্টার ব্যবহার করা ;

(৪) কোনো অবস্থায় যত্রতত্র কীটনাশক ব্যবহার না করা ;

(৫) উপকারী পোকার যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

ঙ. **রাসায়নিক উপায়ে দমন :** রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করার আগে নিম্নলিখিত বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন–

(১) ফসলে কি ধরনের পোকা বা রোগের আক্রমণ হয়েছে তা পরীক্ষা করা ;

(২) ওষুধ ছাড়া আর যেসব পদ্ধতি আছে সেগুলোর সাহায্যে দমন করা সম্ভব কি-না তা যাচাই করা ;

(৩) ঝড়বৃষ্টি/শিলাবৃষ্টির কারণে ফসলের ক্ষতির লক্ষণকে অনেক সময় পোকা বা রোগের আক্রমণ মনে করে সেই অবস্থায় ওষুধের ব্যবহার না করা ;

(৪) আক্রমণের হার ফসলের আর্থিক ক্ষতির ন্যূনতম পর্যায়ে অতিক্রম করেছে কি-না তা আগে পরীক্ষা করা ;

(৫) নির্ধারণ করা ওষুধ যেন অন্যান্য উপকারী পোকামাকড় ও পাখির কোনো ক্ষতি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা ;

(৬) ওষুধ কম বা বেশি ব্যবহার না করা। ওষুধ কম হলে পোকা দমন হয় না, আর ওষুধ বেশি হলে আর্থিক ক্ষতি হয় ;

(৭) মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেছে এমন ওষুধ ব্যবহার না করা ;

(৮) বালাইনাশক ওষুধ ব্যবহারের সময় ওষুধের অনুমোদিত সর্বনিম্ন মাত্রায় (dose) প্রথমে ব্যবহার করা এবং কোনো সময়ই বেশি হারে ওষুধ ব্যবহার না করা ;

(৯) ওষুধ পানির সাথে মিশিয়ে ফসলে স্প্রে করা এবং সঠিক পরিমাণে পানি ব্যবহার করা;

(১০) প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি দিলে ওষুধের কার্যকারিতা কমে যায়। আবার কম পানি ব্যবহার করলে ওষুধের ঘনত্ব বেশি হবে ;

(১১) ফুল থাকা অবস্থায় সকালের পরিবর্তে বিকালে স্প্রে করা ;

(১২) স্প্রে করার পর ভালভাবে হাত মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা ;

(১৩) কোনো প্রকার শারীরিক অসুবিধা হলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা।

৪. মাকড়সা পরিচিতি

মাকড়সার দেহ দু'ভাগে বিভক্ত। সামনের বা মাথার অংশকে বলা হয় সেফালোথোরাক্স (cephalothorax) এবং পিছনের বা নিচের অংশকে বলা হয় পেট বা উদর (abdomen)। সেফালোথোরাক্স ও পেট পেডিসেল (pedicel) নামক পাতলা অংশ দ্বারা সংযুক্ত থাকে। মাকড়সার পায়ের সংখ্যা ৪ জোড়া বা ৮টি এবং এগুলো সেফালোথোরাক্সের সাথে যুক্ত। প্রতি পায়ের অগ্রভাগে ২ থেকে ৩টি তীক্ষ্ণ নখ (claw) থাকে। প্রায় সব মাকড়সার ৬ থেকে ৮টি সরল চোখ (simple eye) এমনভাবে স্থাপিত যাতে মাকড়সা চারদিকে ভালভাবে দেখতে সক্ষম। মাকড়সার মুখমণ্ডলের দাঁতযুক্ত চোয়ালকে চেলিছেরি (chelicerae) বলে। চেলিছেরির সাথে মাথার অভ্যন্তরে অবস্থিত বিষ গ্রন্থি (poison sac) সংযুক্ত থাকে বলে মাকড়সা জালে আটকিয়ে কিম্বা ধাওয়া করে শিকার করা কীটপতঙ্গকে কামড় দিয়ে সেগুলোর দেহে নিজের বিষ ঢুকিয়ে অবশ করে কিংবা মেরে ফেলে, পরবর্তীকালে মাকড়সার পাকস্থলীর রস শিকার করা কীটপতঙ্গের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়ে সেসব কীটপতঙ্গের শরীরের ভিতরের অংশসমূহ গলিয়ে তরল করে ফেলে এবং সেই গলানো তরল অংশ চুষে খেয়ে শিকার করা কীটপতঙ্গের দেহের খোলস ফেলে দেয়। এখানে কয়েকটি প্রধান মাকড়সার চিত্র পরিচিতি দেওয়া হলো।

৬. উপকারী পোকার পরিচিতি

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু সংখ্যক উপকারী পোকা ব্যবহৃত হয়। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

	নাম	বৈশিষ্ট্য	বংশবিস্তার
১	লম্বা শুঁড় ঘাস ফড়িং *(Conocephalus longipennis)*	শুঁড় অনেক লম্বা, যা এগুলোর দেহের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।	১৫-৩০ ডিম
২	গ্রাউন্ড বিটল *(Ophionea nigrofasciata)*	দেহ শক্ত, বাচ্চার রং উজ্জ্বল কালো ও পূর্ণ বয়স্ক লালচে তামাটে।	–
৩	লেডি বিটল *1.Harmonia octomaculata 2.Menochilus sexmaculatus*	পিঠে কালো দাগ, আস্তে আস্তে চলে।	১৫০-২০০০ টি বাচ্চার কীড়ার জন্ম দিতে পারে।
৪	লেডি বিটল *(Micraspis crocea)*	দেহ ডিম্বাকৃতি ও উজ্জ্বল লাল রঙের। দিনের বেলায় কর্মতৎপর থাকে।	
৫	ওয়াটার বাগ *(Microvelia ouglasi atrolineata)*	আকারে ছোট, পানির উপরিভাগে থাকে, গলায় ও পাখনায় সাদা ও কালো দাগ থাকে না।	২০-৩০ ডিম
৬	প্লান্ট বাগ *(Cyrtorhinus lividipennis)*	পূর্ণবয়স্ক ও বাচ্চার রঙ সবুজ এবং কালো মেশানো।	৭-১০ ডিম ১০-২০টি বাচ্চা
৭	জায়ান্ট বাগ *(Mesovelia vittigera)*	রঙ হালকা সবুজ এবং মাইক্রোভেলিয়া ওয়াটার বাগের চেয়ে বড়। পাখনাবিহীন অথবা পাখনাযুক্ত, আইলের ধারে জড় হয়ে থাকে। এক সাথে শিকার করে।	২৮
৮	ওয়াটার বাগ *(Limnogonus fossarum)*	ওয়াটার স্ট্রাইডার নামে পরিচিত। পানির উপর দ্রুত চলতে পারে। গায়ের রঙ কালো, পিছনের দু' জোড়া পা অনেক লম্বা।	১০-৩০ ডিম
৯	প্লান্ট বাগ *(Plant bug) Fusco vittatus* Sp.)	অ্যাসাসিন বাগ নামে পরিচিত। সাধারণত একাকি থাকে, রঙ ধূসর এবং পিঠের ওপর সুস্পষ্ট তিনটি কাঁটা আছে।	–

১০	ইয়ার উইগ (*Euborellia stali*)	দেহের পিছনের অংশ চিমটার ন্যায় যা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে না। পেটের প্রতিটি ভাগে সাদা দাগ থাকে। শুঁড়ের শেষ প্রান্তেও সাদা দাগ থাকে।	২০০-৩৫০ ডিম
১১	ক্যারাবিড বিটল (*Ophionea nigrofasciata*)	চকচকে, মসৃণ খোল ও রঙিন ডোরা এবং চিবিয়ে খাওয়ার মুখ। দিনে শিকার করে, সাঁতার কাটতে পারে।	২৮
১২	পিঁপড়া (*Solenopsis geminata*)	লাল পিঁপড়া নামে পরিচিত। ভেজা ক্ষেতের আইলে এবং শুকনা মাঠে দেখা যায়। দলবদ্ধভাবে চলে।	–
১৩	ড্যামসেল ফ্লাই *1. Agriocnemis pygmaea* *2. Agriocnemis femina*	পাখনাগুলো সরু, পেটের শেষ ভাগ কমলা রঙের অথবা নীলচে সবুজ, বাচ্চারা পানিতে বাস করে।	৩০
১৪	*Paider us fusspane* (স্টেফাইলিনিড)	পাখনার অর্ধেক অংশ শক্ত, বেগুনি ডোরা আছে, চর্বনযোগ্য মুখ।	২৪
১৫	ড্রাগন ফ্লাই	বড় পাখা ও চোখ, পুকুর ও নদীতে এদের কীড়ার বর্ধন হয়।	৫০

৬. পরজীবী পোকা বোলতা

প্রকৃতিতে অনেক পরজীবী পোকার মধ্যে বোলতা অন্যতম। বোলতার অনেক প্রজাতি রয়েছে। এগুলোর কোনো ক্ষতিকারক ভূমিকা নেই। দিন রাত এগুলো চাষীর ফসলের মাঠে সৈনিকের মতো পাহারা দিয়ে থাকে।

বোলতা নানা রঙের হয়ে থাকে। যেমন– হলুদ, নীলচে সবুজ, কালো, হলদে কালো, খয়েরি, কমলা খয়েরি, হালকা খয়েরি, লাল ইত্যাদি। ছোট ও বড় নানা আকারের বোলতা রয়েছে। বোলতার কোনো কোনো প্রজাতির স্ত্রী বোলতা পুরুষ বোলতার সঙ্গে মিলন ছাড়াই ডিম দিতে পারে। বোলতার ডিম পাড়ার অঙ্গ (Ovipositor) খুব শক্তিশালী। বোলতার ডিম পাড়ার অঙ্গ খাটো অথবা লম্বা হয়ে থাকে। বোলতা সাধারণত একটি ডিমে অথবা কীড়ায় অথবা পুত্তলিতে একটি মাত্র ডিম পাড়ে। তাই আক্রান্ত ডিম অথবা কীড়া অথবা পুত্তলি থেকে

একটি পূর্ণবয়স্ক বোলতা জন্মগ্রহণ করে। কোনো কোনো প্রজাতি ক্ষতিকারক কীড়ায় একাধিক ডিম পাড়ে (১-২০টি)। ডিম থেকে পূর্ণবয়স্ক বোলতায় পরিণত হতে সাধারণত ১০-১৪ দিন সময় লাগে। পূর্ণবয়স্ক বোলতা সাধারণত ২-৭ দিন বাঁচে। বোলতা ফুলের মধুজাতীয় উপাদান খেয়ে ২-৪ দিন বেঁচে থাকতে পারে।

৭. ডাল ফসলে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা

স্বাস্থ্য রক্ষায় ডালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমিষ দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে। বাজারে পোকা ও রোগে আক্রান্ত ডালের দাম ও চাহিদা অত্যন্ত কম। এজন্য চাষীগণ পোকা দমনের জন্য অধিক মাত্রায় বিষ প্রয়োগ করে থাকে। এজন্য নিচের কারণগুলোর জন্য ডালের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর প্রয়োজন।

(১) বালাইনাশকের অতিমাত্রায় অথবা ঘনঘন ব্যবহার কমানো ;

(২) কীটপতঙ্গের বালাইনাশক প্রতিরোধ ক্ষমতার সমস্যা রোধ করা ;

(৩) উৎপাদন খরচ কমানো ;

(৪) অতিমাত্রায় বালাইনাশক ব্যবহারের ফলে উপকারী পোকার সংখ্যা কমে গিয়ে ক্ষতিকারক পোকার সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

(৫) বালাইনাশক ব্যতীত অন্যান্য দমন প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো ;

(৬) প্রয়োজনে সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় ও বিধি মোতাবেক বালাইনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করা

ডালের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আই পি এম) বলতে ডালের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের নিমিত্তে প্রয়োজনে একের অধিক দমন পদ্ধতির প্রয়োগ করাকে বোঝায়। অর্থাৎ অরাসায়নিক, যান্ত্রিক ও রাসায়নিক এবং জৈবিক দমন পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক দমন প্রযুক্তি সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ডালের পোকা

প্রধান ক্ষতিকারক পোকা	কোথায় ক্ষতি করে
শুয়া পোকা	পাতায়
ডগা, কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	কচি কাণ্ড ও ডগা এবং ফল।
জাবপোকা	পাতা, কচি ডগা ও কাণ্ডের রস চুসে খায় ;
ডগা ও ফলের মাজরা	কাণ্ড, ডগা ও ফল ছিদ্র করে।
ইপিল্যাকনা বিটল	পাতায়
রেড মাইট	পাতায়
মিলিবাগ	পাতায়
লেদাপোকা	কচি পাতা ও ডগা
কাটুইপোকা	গোড়ায়

উঁইপোকা	শিকড়
ডাইমন্ড ব্যাক মথ	পাতা
লেদাপোকা	
বিছা পোকা	কাণ্ডের কচি অংশ
ইপিল্যাকনা বিটল	পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলে।
বিছাপোকা	পাতার কচি অংশ খায়।

৮. **ডাল ফসলে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি**

ডাল ফসলে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার পাঁচটি উপাদান নিচে প্রদত্ত হলো।

১. **জীব-নিয়ন্ত্রণ বাহক** (Bio-control agent) **সংরক্ষণ** : পরভোজী পোকা (মাকড়সা, লেডিবিটল) ও পরজীবী পোকা (বোলতা, মাছি) এবং উপকারী প্রাণী (ব্যাঙ, শালিক, ফিংগে, গুইসাপ, পেঁচা) বংশ বৃদ্ধি করা।

২. **বালাই সহনশীল জাতের চাষাবাদ** : যে সকল ফসলের জাতে পোকা ও রোগবালাই কম লাগে সেগুলো নির্বাচন করে চাষ করা।

৩. **আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার** : সুস্থ বীজ, সুষম সার ব্যবহার, পরিমিত পানি প্রয়োগ ও আগাছামুক্ত চাষাবাদ।

৪. **হাতে দমন** : আক্রান্ত ডগা, পাতা এবং ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা, কীড়া ও পূর্ণবয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলা। পোকার ডিম সংগ্রহ করে পরজীবী পোকার বংশ বৃদ্ধি করা।

৫. **রাসায়নিক দমন ব্যবস্থা** : উপকারী ও অপকারী পোকার সংখ্যা যাচাই করে, সঠিক কীটনাশক নির্বাচন করে, সঠিক মাত্রায় ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। কম বিষাক্ত ও স্বল্পমেয়াদি ওষুধ প্রয়োগ করা।

অধিকাংশ ডালে শোষক পোকা, পাতাখেকো ও ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণের সংখ্যাই বেশি। ছিদ্রকারী পোকা ডগা ও ফলে বেশি আক্রমণ করে। এ সকল পোকামাকড় একটি দমন পদ্ধতি দ্বারা দমন করা যাবে না। তাছাড়া একটি দমন ব্যবস্থা সকল বালাই এর জন্য কার্যকর নয়। এজন্য বীজ বোনা অথবা রোপণ থেকে প্রতিটি স্তরে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

ক. **বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষাবাদ** : পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ সম্পন্ন জাতের চাষাবাদ করা প্রয়োজন। এতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

খ. **আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি নিম্নলিখিতভাবে চাষাবাদ করা প্রয়োজন।**

(১) জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। বীজ বপনে পূর্বে জমিকে আগাছা মুক্ত করতে হবে

(২) পোকায় আক্রান্ত বীজ অথবা চারা রোপণ অথবা বপন করা যাবে না।

(৩) সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। অত্যধিক মাত্রায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে গাছ ও পাতা নরম হয়, এতে জাবপোকা, মাজরা পোকা এবং বিছা পোকার আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এজন্য জৈব সার বেশি করে ব্যবহার করা উত্তম।

(৪) রাসায়নিক সার যথা– ইউরিয়া, টি এস পি, পটাশ ইত্যাদি সুপারিশ মাত্রায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(৫) কম বা বেশি মাত্রায় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে পোকার আক্রমণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

(৬) মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশ অনুসারে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(৭) ফসল পর্যায় মেনে চলা প্রয়োজন। কেননা একই জমিতে একই জাতের ফসল লাগাতারভাবে চাষাবাদ করা হলে পোকা ও রোগের আক্রমণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

গ. **সাথী চাষাবাদের মাধ্যমে পোকা দমন :** আফ্রিকাতে অনেক অংশে ভূট্টার সাথে সাথী শস্য হিসাবে তামাকের চাষ করা হয়ে থাকে। এতে ভুট্টার দানায় ছিদ্র করে খাওয়া পোকার আক্রমণ কম হয়ে থাকে। ডালের জমিতে মাঝে মাঝে তামাকের চাষাবাদ করা হলে জাবপোকার আক্রমণ কম হবে।

ঘ. **তামাকের তৈরি বালাইনাশক** (Nicotine Insecticide) : তামাক গাছের রস থেকে শক্তিশালী স্নায়ু বিষ (Nerve poison) তৈরি হয়। এ বিষের সংস্পর্শে পোকা এলে মারা যায়। এ বিষ খেলেও পোকা মারা যায়। তামাকের সতেজ পাতা অথবা শুকনা পাতা পানিতে ভিজিয়ে পোকা দমনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঙ. **মরিচের গুড়া** (Chilli powder) : পাকা মরিচের ফলে ও বীজে কীটনাশকের (Insecticidal) উপাদান থাকে। কেনিয়াতে জাব-পোকা দমনের ক্ষেত্রে ভাল ফল পেয়েছে বলে জানা গেছে। কেনিয়াতে নিচে উল্লেখিতভাবে মরিচের স্প্রে তৈরি করা হয়ে থাকে।

মরিচের গুড়া ঠাণ্ডা পানিতে এক রাত ভিজিয়ে রেখে তা কাপড়ে সেঁকে স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে গাছে প্রয়োগ করে থাকে। ফিলিপাইনে মরিচের পানির সাথে অল্প সাবানের পানি মিশিয়ে ব্যবহার করে। মরিচ মিশ্রিত পানি ব্যবহারের পূর্বে কয়েকটি গাছে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল। বৃষ্টি না থাকলে সপ্তাহে একবার প্রয়োগ করতে হবে। যদি বৃষ্টি থাকে তবে সপ্তাহে ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

চ. **সাবানের পানি দ্বারা পোকা দমন**

সাবানের পানি প্রয়োগ করলে জাবপোকা মারা যায়। শতকরা ১ ভাগের কম মাত্রায় সাবান মিশ্রিত পানি গাছের পোকা নিধনের জন্য কার্যকর। এর বেশি হলে গাছের ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত ০.৫-০.৮% (৫-৮ গ্রাম প্রতি লিটার) সাবানের পানি জাবপোকা ও ছোট কীড়া (caterpillers) দমনের জন্য কার্যকর। বড় কীড়া এবং বিটল নিধনের জন্য ০.৮% সাবানের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছ. **হাতে দমন ব্যবস্থাপনা :** নিম্নলিখিতভাবে দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভাল।

(১) পোকা অথবা রোগে আক্রান্ত পাতা, ডগা, কাণ্ড ও ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

(২) আক্রান্ত পাতা, ডগা, কাণ্ড আইলে ফেলে রাখলে ক্ষতিকারক পোকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

(৩) পূর্ণবয়স্ক পোকা, কীড়া ও ডিম সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হলে ক্ষতিকারক পোকার সংখ্যা কম থাকবে।

(৪) ইপিল্যাকনা পোকার ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করলে ক্ষতি করতে পারে না। এ পোকার কীড়া (larva) প্রথমে কয়েকটি গাছে থাকে। এ সময় সংগ্রহ করে নিধন করা হলে ক্ষতি করতে পারে না। এতে দমন খরচ কম হবে।

ছ. পরভোজী ও পরজীবী পোকামাকড় ও প্রাণী সংরক্ষণ : পরভোজী পোকা (যেমন– মাকড়সা লেডিবিটল), পরজীবী পোকা (যেমন– বোলতা, মৌমাছি) এবং উপকারী প্রাণীর (যেমন– ব্যাঙ, গুইসাপ, পাখি) বংশবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য বালাইনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। পাখি বসার জন্য বাঁশের খুঁটি পুঁতে রাখতে হবে। পোকার ডিম সংগ্রহ করে প্যারাসাইট বুস্টারে রেখে দিলে পরজীবী পোকার বংশ বিস্তার হতে পারে।

জ. বালাইনাশকের সাহায্যে পোকা দমন : নিম্নলিখিতভাবে পোকা দমন করা আবশ্যক।

(১) উপকারী ও অপকারী পোকার সংখ্যা যাচাই করে কীটনাশক প্রয়োগের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যদি উপকারী পোকার সংখ্যা বেশি থাকে তা হলে কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

(২) সঠিক কীটনাশক নির্বাচন করে, সঠিক মাত্রায় সঠিক সময়ে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কম অথবা বেশি মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করলে অর্থনৈতিক অপচয় হয়। কম মাত্রায় অথবা ঘন ঘন বালাইনাশক প্রয়োগে পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং উপকারী পোকা বেশি মারা যায়। বেশি মাত্রায় গাছের ক্ষতি ও পরিবেশ দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

(৩) প্রতিষেধক হিসেবে বিষ (দানাদার অথবা তরল) প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

(৪) বালাইনাশকের অপেক্ষমান সময় উত্তীর্ণ হবার পর মাঠে পোকার সংখ্যা যাচাই করে পুনরায় ওষুধ দেয়া উচিৎ। আমাদের দেশে চাষীরা ওষুধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ব্যবহার করে। এতে দমন খরচ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এভাবে বিষ প্রয়োগ করলে পরবর্তীকালে ওষুধে কাজ করবে না।

ঝ. বালাইনাশক ও অপেক্ষমান সময় : নিচে কয়েকটি বালাইনাশকের অপেক্ষামান সময় প্রদত্ত হলো–

বালাইনাশকের বাণিজ্যিক নাম	অপেক্ষমান সময় (দিন)
ডাইক্লোরভস ১০০ ইসি	৫–৭
ডেংকাভ্যাপস ১০০ ইসি	৫-৭
নগস ১০০ ইসি	৫–৭
সানফুরান ৩ জি	৭–১০
ডায়থেন এম ৪৫	৩–৮
মেনেকো ২	৫–৭
রিডোমিল এম জেড ৭২	৩–৬

ডায়াজিনন ৬০ ইসি	৭-১০
ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি	৭-১০
ফাইফানন ৫৭ ইসি	৭-১০
মিথিয়ন ৫৭ ইসি	৭-১০
প্যানকোজের ৪০ ডব্লিউপি	৭-১০
রক্সিয়ন ৪০ ইসি	১০-১৫
ফাইফানন ৫৭ ইসি	১০-১৫
পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি	১৪-২০
নুভাক্রন ৪০ এস এল	১৪-২০

ট. **সুপারিশকৃত বালাইনাশক প্রয়োগ :** জাবপোকা দমনের জন্য নিম্নলিখিত ওষুধ বিকালে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১) পাইরিমর ৫০ ডিপি (Pirimor 50 DP) ১.০-১.৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ ওষুধ অল্প বিষাক্ত, পলিনেটর পোকার ক্ষতি কম হয়। এজন্য এ ওষুধ ফসলের ফুল স্তরে ব্যবহার করতে হয়।

(২) এজোড্রিন/নোভাক্রন ৪০ ডব্লিউ এস সি অথবা মেটাসিস্টকস- আর ২৫ ইসি অথবা মারসাল ২০ ইসি, ২ মি.লি. প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে জাবপোকা দমনের জন্য প্রয়োগ করতে হয়।

ঠ. **ইপিল্যাকনা বিটল :** সেভিন/কারবারিল ১৮৫ ডব্লিউপি ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হয়।

ড. **ছিদ্রকারী পোকা :** Cypermethrin (রিপকর্ড/সিমবুশ/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি, ১ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানির সাথে অথবা Fenvalerate (সুমিসিডিন/ফেনকিল) ২০ ইসি ০.৫ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে ফল আসার স্তরে স্প্রে করা যেতে পারে। সঠিক মাত্রায় ১৫ দিন পরপর ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়।

ঢ. **লাল মাকড় (Red mite) :** কেলথেন ৪০ এমএফ ২ মি.লি. প্রতি লিটার পানি, টরক (Torque) ৫০ ইসি অথবা নিউরন ৫০ ইসি ১ মি.লি. প্রতি লিটার পানির সাথে অথবা ভার্টিমেক ১০ ইসি ১ মি.লি. প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে রেড মাইট আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হয়।

ত. **কাটুই পোকা (Cutworm) :** ২ কেজি সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি অথবা পাদান ৫০ এসপি, ১০০ কেজি ধান/আটার ভূষি এবং প্রয়োজনমতো পানি মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করে ১ হেক্টর মাঠের কাটুই { দমন করা যায়। চারা গাছের লাইনে বিষটোপ ছিটিয়ে দিতে হবে। এছাড়া ডারসবান/পাইরিফস ২০ ইসি ৫ মি.লি. পানির সাথে মিশিয়ে চারার চারপাশে মাটিতে স্প্রে করতে হয়।

থ. **বিছাপোকা (Caterpillar) :** ডায়াজিনন ৬০ ইসি অথবা ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন/ ফলিথিয়ন/অন্যান্য) ৫০ ইসি ২ মি.লি. প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হয়। যদি ফসল ১৫ দিনের মধ্যে তোলার প্রয়োজন হয়, তবে মেলাথিয়ন

(ম্যালাথিয়ন/ক্লিপিওন/ফাইফানন/ সাইফানন/ ডাইমাল/অন্যান্য) ৫৭ ইসি ১.৫-২ মি.লি. প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়

দ. বিটল (Bug) : নিম্নলিখিতভাবে বিটল দমন করা যায়।

(১) সেভিন/কারবারিল ১৮৫ ডব্লিউপি ২ গ্রাম হিসেবে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে চারা গাছে ভালভাবে স্প্রে করতে হয়।

(২) ডায়াজিনন ১৪ জি ৫ গ্রাম হিসেবে প্রতি গাছের চারদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করার পর পানি দিতে হয়।

১০. ডালের গুদাম পোকা দমন

পূর্ণবয়স্ক ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে। এ পোকা ডালের দানাও খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে, ফলে হাল্কা হয়ে যায়, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং ডাল হিসেবে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এ পোকা মাঠে অবস্থানরত অড়হর ও অন্যান্য ডাল ফসলের শুঁটি নষ্ট করে।

দমন ব্যবস্থাপনা : নিম্নলিখিতভাবে দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত।

(১) গুদামজাতকরণের পূর্বে শস্য নানা ভাগভাবে পরিষ্কার করতে হয় এবং শুকিয়ে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়ে ১২% এর নিচে আনতে হয়।

(২) গুদামজাত করার পূর্বে ভাঙা, কীড়া আক্রান্ত দুর্বল ও অপুষ্ট দানাসমূহ অপসারণ করে অবশিষ্ট বীজের জন্য টন প্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন ১০% গুঁড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

(৩) পোকার আক্রমণ বেশি হলে ফসটক্সিন ট্যাবলেট দুটি বড়ি প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ব্যবহার করতে হয়।

১১. সংরক্ষণের জন্য ডালবীজ শুকানো

(১) ডালবীজ সবসময়ই পরিষ্কার ও শক্ত খলায় অথবা প্লাস্টিকের শিটে পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হয়।

(২) শুকানোর সময় হঠাৎ বৃষ্টিপাতের ক্ষতি এড়াতে পলিথিন শিট ব্যবহার করতে হয়।

(৩) বৃষ্টির পর বীজ পুনরায় শুকিয়ে নিতে হয়।

(৪) সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা কমিয়ে ৮% থেকে ৯% এ আনতে হয়।

(৫) শুকানো ডাল দাঁতের নিচে রেখে কামড় দিয়ে যদি 'কট' শব্দ হয় তবেই বোঝা যাবে বীজ সংরক্ষণ করার উপযোগী হয়েছে।

১২. সংরক্ষণপাত্রে ডালবীজ ভরা ও রক্ষণাবেক্ষণ

(১) শুকানো ডালশস্য সংরক্ষণপাতে ভরে ভালভাবে মুখ বন্ধ করতে হয়।

(২) গরম অবস্থায় ডালবীজ সংরক্ষণপাত্রে ভরা যাবে না।

(৩) উন্নত মাটির বা টিনের পাত্রে মুখ তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে ভালভাবে বন্ধ করতে হয়।

(৪) সংরক্ষণ পাত্রগুলো ঠাণ্ডা জায়গায় ইট, কাঠ বা মাচার উপরে রাখতে হয়।

(৫) পাত্রের চারপাশ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হয় যাতে পোকা-মাকড় বা ইঁদুরের আক্রমণ না হয়।

(৬) যদি কোনো কারণে পাত্র ভেঙে অথবা ফেটে যায়, তবে ডালবীজ আবার শুকিয়ে অন্য পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়।

১৩. ডালবীজ সংক্ষণে পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তা

ডালবীজ সংক্ষণে পলিথিনযুক্ত ছাড়ার বস্তা খুবই উপযোগী।

পলিথিন ব্যাগ ০.০৫ মিলি, পুরু. পাটের বস্তার ভিতরে ভরে এ ধরনের বস্তা তৈরি করা হয়। বস্তার মধ্যে ডালবীজ ভরে প্রথমে পলিথিনের মুখটি মোমবাতির শিখায় হাল্কাভাবে পুড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরে ছালার ব্যাগে মুখটি রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। বস্তার ভিতরে পলিথিন থাকায় বাইরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এ পদ্ধতিতে ডালবীজ এক বছর পর্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যায়। সংরক্ষণকালে দ্বিতীয়বার শুকানোর প্রয়োজন পড়ে না।

প্রতি ১০০ কেজি ডালবীজের জন্য একটি বস্তার খরচ পড়ে মাত্র ২০ থেকে ৩০ টাকা। এ ধরনের ছালার বস্তাটি ২ থেকে ৩ বছর ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে বস্তার ভিতরের পলিথিন ব্যাগটি পরিবর্তন করতে হয়।

১৪. ডালবীজ সংরক্ষণের পলিথিনযুক্ত মাটির মাত্র

উন্নত পাত্রের ভিতরে ০.০৫ মিলিমিটার পুরু পলিথিন ব্যাগ প্রবেশ করিয়ে এ ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়।

ডাল ফসল পলিথিন ব্যাগের মধ্যে রেখে পলিথিনের মুখটি মোমবাতির শিখায় পুড়িয়ে সীল করে দেওয়া হয়।

পরে পাত্রের মুখটিও তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাত্রের ভিতরে পলিথিন থাকায় বাইরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষেত্রে আর আলকাতরার প্রলেপের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের পাত্রে ডালবীজ এক বছর পর্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যায়।

সংরক্ষণকালে দ্বিতীয়বার শুকানোর প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি ৪০ কেজি ডালবীজের জন্য সংরক্ষণ পাত্রের খরচ পড়ে মাত্র ৩৫ থেকে ৪০ টাকা।

এ ধরনের পাত্র ৩ থেকে ৪ বছর ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে শুধু পলিথিন ব্যাগ পরিবর্তন করতে হয়।

১৫. ডালবীজ সংরক্ষণের টিনের উন্নত পাত্র

সাধারণত এমএস শিট দ্বারা এ ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়। পাত্রটির মুখ বন্ধ করার জন্য গোলাকার ঢাকনার চারদিকে সীল করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ফলে সিলিং পদার্থ বা তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করলে বাইরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

এ ধরনের পাত্রে ডালবীজ এক বছরের বেশি সময় ভালভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

সংরক্ষণকালে দ্বিতীয়বার শুকানোর প্রয়োজন পড়ে না।

প্রতি ৪০ কেজি ডালবীজ সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের পাত্রের খরচ পড়ে ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা। এই পাত্র ১০ থেকে ১২ বছর ব্যবহার করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

ডাল ফসল ও সবুজ সার ফসল

১. ভূমিকা

কোনো গাছ সবুজ ও নরম অবস্থায় মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়ায় যে সার তৈরি হয় তাকে সবুজ সার (Green manure) বলে। নিচে সবুজ সার উৎপাদী ফসল গাছের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

(১) দ্রুত বর্ধনশীল হতে হবে। এতে অল্প সময়ের মধ্যেই সবুজ সার করা যেতে পারে।

(২) পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং রসালো সবুজ পদার্থ উৎপাদনশীল হতে হবে। এতে জৈব পদার্থ বেশি পরিমাণে মাটিতে যোগ হবে এবং রসালো হওয়ায় সহজেই পচন ঘটবে।

(৩) অনুর্বর মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পাতা ও শাখা পল্লব উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। কারণ এরূপ অনুর্বর মাটিকে উর্বর ও উৎপাদনশীল করে তোলার জন্যই সবুজ সার করা হয়।

(৪) উদ্ভিদটি *Leguminosae* গোত্রভুক্ত হয়ে থাকে।

(৫) জীবনকাল ছোট এবং প্রচুর বীজ উৎপাদনক্ষম হতে হবে। এতে পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন এবং বীজের মাধ্যমে সহজেই বংশবিস্তার করা সম্ভব হবে।

এ পাঁচটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়া আরো কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো কোনো উদ্ভিদে পাওয়া গেলে তার দ্বারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সবুজ সার করা হয়ে থাকে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ।

(১) রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কম হতে পারে।

(২) চাষাবাদ পদ্ধতি সহজতর হতে হবে।

(৩) উঁচু, নিচু, বেলে থেকে কর্দম, অম্ল থেকে ক্ষারীয়, মাটির যে কোনো একটিতে চাষ করার যোগ্য।

এ গোত্রের উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে ভূমিস্থ *Rhizobium* গণের কয়েকটি প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া যেমন, *R. Japonicum R. leguminosarum., R. trifolii* ইত্যাদির বিভিন্ন উপজাত নির্দিষ্ট লিগিউমজাতীয় উদ্ভিদের মূলে মূলরোমের মাধ্যমে প্রবেশের পর ব্যাকটেরিয়ডে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাকটেরিয়ডের মধ্যস্থিত লেগহিমোগ্লোবিন (Leghaemoglobin) নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ পদার্থে পরিণত করে এবং মূলের নডিউলে জমা করে। জীবিত অবস্থায় উক্ত লিগিউম গাছ এই নাইট্রোজেন হতে নিজের প্রয়োজন মেটায় এবং বিনিময়ে উক্ত ব্যাকটেরিয়াকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। অর্থাৎ উভয় জীবই এরূপ সহঅবস্থানের দ্বারা উপকৃত হয়। তাই এরূপ অবস্থানকে মিতজীবিতা

(symbiosis) এবং উভয়কে সিম্বয়ন্ট (symboint) বলে। কিন্তু নির্দিষ্ট লিগিউমজাতীয় উদ্ভিদ না পেলে এই ব্যাকটেরিয়া একাকী বা মুক্তাবস্থায় কোনো নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতে পারবে না। এ ছাড়া মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকলেও কোনো নাইট্রোজেন সংবন্ধনকৃত করতে পারে না অথবা পারলেও পরিমাণে খুব কম। তাই অনুর্বর তথা নাইট্রোজেনের ঘাটতি রয়েছে এমন জমিতে লিগিউমজাতীয় ফসলের চাষ করলে মূলের গুটিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকৃত হতে পারে। একে জৈবিক ও মিথোজৈবিক (Biological and symbiotic) নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী বলে। ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি বা ক্রস ইনোকুলেশন দল (cross inoculation group) উপস্থাপন করা হলো।

Rizobium ব্যাকটেরিয়া, ক্রস ইনোকুলেশন গ্রুপ লিগিউম গণ ও ফসল

ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি	ক্রস ইনোকুলেশন দল	আশ্রয়দাতা লিগিউম গণ	লিগিউম ফসল
Rizobium meliloti	আলফালফা	*Medicago*	আলফালফা
		Melilotus	সুইট ক্লোভার মেথি
		Trigonella	ক্লোভার
Rizobium trifoli	ক্লোভার	*Trifolium*	মটর
Rizobium	মটর	*Pisum*	ভেচ
leguminosarum		*Vicia*	খেশারি
		Lathyrus	মশুর
Rizobium phaseli		*Lens*	শিম/কলাই
Rizobium lupini	শিম	*Phaseolus*	লুপিন
	লুপিন	*Lupinus*	সিরাডেলা
Rizobium		*Ornithopus*	সয়াবিন
joponicum	সয়াবিন	*Glycine*	গোশিম
	গোশিম	*Vigna*	শনপাট
		Crotalaria	চীনাবাদাম
		Arachis	

আশ্রয়দাতা (host) লিগিউম উদ্ভিদের মূলে গুটি সৃষ্টি হলেই যে তাতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকৃত হয়েছে তা বলা যায় না। যে গুটি লম্বালম্বি কাটলে অভ্যন্তর লাল দেখায় সে গুটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনকৃত হয়েছে বলা যায়। লেগহিমোগ্লোবিনের উপস্থিতি এই লাল বর্ণের জন্য দায়ী। নাইট্রোজেন সংবন্ধনকরণের কাজ সমাধা হলে গুটি সবুজাভ রঙ ধারণ করে।

চাষ করার ফলে যখন গাছ পচে মাটিতে মিশে যায়, তখন গুটির সেই নাইট্রোজেন মাটিতে সংযোজিত হয় এবং পরবর্তী ফসলসমূহের গ্রহণযোগ্য হয়। তাই সবুজ সারের জন্য নির্বাচিত ফসলটি লিগিউম গোত্রের হলে জৈব পদার্থের সাথে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সংযুক্ত হওয়ায় এ ফসল অগ্রাধিকার পায়। বিভিন্ন প্রকার লিগিউম ফসল চাষ করায় প্রতি বছর বিশ্বের মাটিতে যে নাইট্রোজেন যোগ হচ্ছে তার পরিমাণ কলে-কারখানায় উৎপাদিত নাইট্রোজেন সারের চেয়েও বেশি।

২. সবুজ সার ফসলের পরিচিতি

সবুজ সার ফসল হতে হলে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, তার মধ্যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে লিগিউম এবং অলিগিউম-উদ্ভিদ গণ্য হতে পারে, লিগিউম ফসল প্রাধান্য পাবে, কারণ এতে সবুজ পদার্থ ছাড়া বায়বীয় নাইট্রোজেনও পাওয়া যায়। অলিগিউম ফসলের দ্বারা সবুজ সার করলে কেবল জৈব পদার্থ পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞগণ সবুজ সার করার জন্য যেসব ফসলের উল্লেখ করেছেন সেগুলোর সংখ্যা লিগিউমজাতীয় ফসল প্রায় ৩০টি এবং অন্যান্য ফসল ১০টি। এগুলোর মধ্যে থেকে বেশ কিছু ফসলের একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো।

সবুজ সার ফসলের নাম ও গোত্র

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	গোত্র
ধৈঞ্চা	Dhaincha	*Sesbania aculata*	Leguminosae
সেসবানিয়া	Sesbania	*S. speciosa rostrata*	Leguminosae
শনপাট	Sunhemp	*Crotalaria juncea*	Leguminosae
গো-মটর	Cowpea	*Vigna* sp.	Leguminosae
মটর	Pea	*Pisum sativum*	Leguminosae
খেসারি	Grass pea	*Lathyrus sativus*	Leguminosae
মাষকলাই	Black	*Phasealus* sp.	Leguminosae
গুয়ার	Guar	*Cyamopsis* sp.	Leguminosae
সেনজিল	Senjil	*Meliotus alba*	Leguminosae
সয়াবিন	Soyabean	*Glycine max*	Leguminosae
আলফালফা	Alfalfa	*Medicago* sp.	Leguminosae
লাল ক্লোভার	Red clover	*Trifolium* sp.	Leguminosae
সাদা ক্লোভার	White Clover	*Trifolium* sp.	Leguminosae
বার ক্লোভার	Bur Clover	*Trifolium* sp.	Leguminosae
নীল ক্লোভার	Indigo	*Idigofera tinctoria*	Leguminosae
লজ্জাবতী	Sensitive	*Mimosa* spp.	Leguminosae
বাকহুইট	Buckwheat	*Fagopyrum stagittatum*	Polygonaceae
রাই	Rye	*Secale cereale*	Gramineae
যই	Oat	*Avena sativa*	Gramineae
যব	Barley	*Hordeum* sp.	Gramineae
গম	Wheat	*Triticum* sp.	Gramineae
ভুট্টা	Corn	*Zea mays*	Gramineae
সরিষা	Mustard	*Brassica* spp.	Cruviferae

অধিকাংশ সময়ে কেবল একটি ফসল দ্বারা সবুজ সার করা হলেও অনেক সময়ে একাধিক ফসল দ্বারা করাও অনুমোদন করা হয়। যই+মটর এবং রাই+ভেচ এরূপ দুটি উত্তম উদাহরণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধৈঞ্চা, শনপাট, গোমটর ইত্যাদি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সবুজ সার ফসল।

৩. সবুজ সারের উপকারিতা

সবুজ সার চাষ করে প্রাপ্ত জৈব পদার্থের ও বায়ুমণ্ডল থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেনের প্রভাবে মাটির গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধন ও উপকার পাওয়া যায়। ভূমির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে সবুজ সারের উপকারী প্রভাবসমূহকে নিচে আলোচনা করা হলো–

(১) জৈব পদার্থই মাটির জীবন। এসব কথা থেকেই মৃত্তিকার জৈব পদার্থের গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝা যায়। সাধারণ অর্থে ধরা হয় যে, কৃষি ভূমির জন্য মাটিতে ২–৫% জৈব পদার্থ থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ অত্যন্ত কম অর্থাৎ ১% এর নিচে। সবুজ সার করা হলে জমিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে জৈব পদার্থ যোগ হয় যেমন– ধৈঞ্চা ও শনপাট চাষ করলে হেক্টর প্রতি প্রায় ৫–৮ টন জৈব পদার্থ পাওয়া যায়।

(২) নাইট্রোজেন উদ্ভিদের একটি অত্যাবশ্যক এবং প্রাথমিক পুষ্টি উপাদান। যে কোনো ধরনের ফসলই মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে।

কেবল ফসল কর্তৃক পরিশোধিতই নয়, বরং চুয়ানো, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি নানা উপায়ে ভূমির নাইট্রোজেনের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের মাটিতে নাইট্রোজেনের উপস্থিতির হার খুবই কম। কিন্তু লিগিউমজাতীয় ফসল দ্বারা সবুজ সার করা হলে প্রচুর পরিমাণে বায়বীয় নাইট্রোজেন মাটিতে সংযোজিত হতে পারে। লিগিউম ফসল দ্বারা সবুজ সার করা হলে প্রতি ঋতুতে হেক্টর প্রতি ৬০-২৪০ কেজি নাইট্রোজেন সংযোজন হতে পারে। তাই জমি নাইট্রোজেনে সমৃদ্ধ করার উত্তম সহায়ক হচ্ছে লিগিউম ফসল দ্বারা সবুজ সার চাষ করা।

মাটিতে নাইট্রোজেন সংবর্দ্ধনের পরিমাণ

ফসল	নাইট্রোজেন (কেজি/হেক্টর)	ফসল	নাইট্রোজেন (কেজি/হেঃ)
আলফালফা	২৫০	গোশিম	১১৫
লেডিনো ক্লোভার	২২৫	লেসপিডিজাস	১১০
সুইট ক্লোভার	১৫০	ভেচ	১০০
রেড ক্লোভার	১৪০	মটর	৯০
কুড্জ	১৩০	সয়াবিন	৬৫
হোয়াইট ক্লোভার	১২০	শিম	৫০

(৩) খনিজ পদার্থের চেয়ে জৈব পদার্থের পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। এ কারণে সবুজ সার করা হলে জমির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ে।

(৪) সহজে পচে হয়ে যাওয়া জৈব পদার্থ পরে অত্যন্ত জটিল যৌগ পদার্থে পরিণত হয় এবং মাটি কণাকে একত্রে ধরে রেখে সংযুক্তি এককে পরিণত করে। এই সংযুক্তি

মাটিকে আলগারে মুক্ত ও দানাদার অবস্থায় থাকতে সহায়তা করে। এরূপ অবস্থায় ভূমিতে সহজে বায়ু চলাচল করে। এতে মূলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং নিকাশের সুবিধা হয়।

(৫) সবুজ সার থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থে উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদানের আধার হিসেবে কাজ করে। এ জৈব পদার্থ পচে তাতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানসমূহ আবাদকৃত ফসল পরিশোধন করে।

(৬) মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টিউপাদানসমূহ চুয়ানের মাধ্যমে অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়

(৭) জৈব পদার্থ পচনের সময়ে নানা প্রকার জৈব অ্যাসিড উৎপন্ন হওয়ায় তা বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত করে গাছের পরিশোষণোপযোগী আকারে আনে।

(৮) জৈব পদার্থ থেকে নিঃসৃত জৈব অ্যাসিড মাটির PH মান নিয়ন্ত্রণে বাফার হিসেবে কাজ করে।

(৯) জৈব পদার্থ থেকে নিঃসৃত সাইট্রেট, অক্সালেট, টারটারেট, ল্যাকটেট ইত্যাদি ফসফরাসের চেয়ে লোহা এবং এলুমিনিয়ামের সাথে দ্রুত বিক্রিয়া করে। ফলে অ্যাসিড মাটিতে আবদ্ধকৃত ফসফরাস মুক্ত হওয়ার জন্য সবুজ সার উত্তম সহায়ক

(১০) অগভীর করে চাষ করায় মাটির নিচে একটি শক্ত লাঙ্গল স্তর তৈরি হয়। এটি উদ্ভিদের মূল প্রবেশে এবং নিকাশের কাজে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু নানা প্রকার গভীরমূলী ফসল দ্বারা সবুজ সার করা হলে এই স্তর ভেঙে মাটির উন্নতি ঘটায়।

(১১) আগাছা ফসলের অন্যতম সমস্যা। আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দুরূহ। কিন্তু সবুজ সার ফসলের বীজ অত্যন্ত ঘন করে বপন করা হলে ফসল অল্প দিনেই জমি ঢেকে ফেলে বিধায় আগাছা নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সহজ হয়।

(১২) গভীরমূলী সবুজ সার ফসল মাটির গভীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীকালে তা পচনের মাধ্যমে সেই সব পুষ্টি উপাদান মাটির উপরিস্তরে যোগ হয়।

(১৩) কেঁচো, পিপিলিকা, উইপোকা জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। এই জীবসমূহ মাটিতে সরু গর্তের সৃষ্টি করায় ভূমিজ বায়ু চলাচল ও মাটি ওলটপালট করতে সহায়তা করে। ফলে মাটির ভৌত অবস্থার উন্নতি হয়। প্রাকৃতিক লাঙ্গল নামে পরিচিত কেঁচো প্রচুর জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটিতেই অবস্থান করে থাকে।

(১৪) মাটিতে অবস্থানকারী নানাপ্রকার অণুবীজের কার্জক্ষমতা ত্বরান্বিত করার জন্য জৈব পদার্থ অপরিহার্য। যেমন নানাপ্রকার মৃৎভোজী (heteropropic) অণুজীব এবং মুক্তভাবে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়াসমূহ দ্বারা তাদের প্রয়োজনীয় কার্বন জৈব পদার্থ অমিথোজৈবিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনে সহায়তা করে থাকে।

মাটিতে অন্যান্য জৈব সার যোগ করলে যেসব উপকার পাওয়া যায়, সবুজ সার করাতে সেগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত কয়েকটি উপকার হয়। যেমন -

(১) লিগিউমজাতীয় ফসল ফসল হলে বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকৃত হয়।

(২) গভীরমূলী ফসল হলে লাঙ্গলস্তর সমস্যা দূর করা যায়।

(৩) আগাছা দমন করা যায়।

(৪) ভূমির নিচের স্তরের পুষ্টি উপাদান উপরের স্তরে আনা যায়।

এহেন উপকারী সবুজ সার থেকে পুরোপুরি ফায়দা উঠাতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়াবলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, যথা–

(১) লিগিউমজাতীয় ফসল নির্বাচন করা এবং গুটি উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট ধরনের ব্যাকটেরিয়া অনুপ্রবিষ্ট (inoculate) করা ও কিছু P. K. জাতীয় সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

(২) পচনের জন্য প্রয়োজনীয় রসের ব্যবস্থা থাকা। এই সময়ে ২০ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হলে তথা মাটিতে রসের অভাব হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হয়।

(৩) পচনের পর পরবর্তী ফসল চাষ করা। পচনের জন্য প্রায় ২ মাস সময় প্রয়োজন হয়ে থাকে।

৪. কয়েকটি সবুজ সার ফসলের চাষ

ধৈঞ্চা বাংলাদেশের বহুল পরিচিত ফসল। সবুজ সার ফসল ছাড়াও অনেক সময় গো-খাদ্য এবং আমন ধানের জমিতে কচুরীপানা প্রবেশে বাধা প্রদানের জন্য জমিকে চারদিকে তথা আইলে ঘন করে রোপণ করা হয়।

ধৈঞ্চা জলাবদ্ধতা ও খরা প্রভাবান্বিত উভয় প্রকার জমিতেই সফলতার সাথে চাষ করা যায়। এ গাছ কিছুটা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। অঙ্কুরোদ্গমের সময় মাটিতে কেবল পর্যাপ্ত পরিমাণে রস থাকলেই চলে। প্রায় সব বুনটের মাটিতেই ধৈঞ্চা জন্মানো যায়।

ধৈঞ্চার জন্য খুব ভালোভাবে জমি তৈরির দরকার পড়ে না। ২/৩টি চাষ ও মই দিলেই চলে। কোনো নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু পরিমাণে ফসফরাস ও পটাশ সার দিলে মূলে গুটি উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়। ধৈঞ্চার জন্য হেক্টর প্রতি প্রায় ৪০ কেজি ফসফেট ও ২৫ কেজি পটাশ জমি তৈরির সময়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ কেজি বীজ ছিটিয়ে ঘন করে বপন করে মই দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বপনের পূর্বে ৬-৮ ঘণ্টা কাল ভিজিয়ে নিলে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ত্বরান্বিত হয়।

গাছের বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুততর এবং ঘন করে বপন করা হলে ২০-২৫ দিনের মধ্যেই জমি ঢেকে যায়। ফলে প্রতিযোগিতায় আগাছা টিকে থাকতে না পারায় নিড়ানির প্রয়োজন হয় না। এ ছাড়া জলাবদ্ধতাতেও ক্ষতি না হওয়া এবং তেমন কোনো রোগ বালাই না থাকায় কোনো আন্তঃপরিচর্যার ও দরকার হয় না। ৮-১০ সপ্তাহ পরে গাছগুলো ১-১.৫ মিটার লম্বা হলে তখন চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। গাছ লম্বা হওয়ায় চাষ দিতে অসুবিধা হলে প্রথমে কাচি দিয়ে গাছগুলো ২/৩ টুকরো করে কেটে নিয়ে পরে চাষ দেওয়ায় সুবিধা হয়। মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তা পচে যায়।

গাছের বৃদ্ধি অনুযায়ী হেক্টর প্রতি প্রায় ৭-৮ টন কাঁচা সবুজ পদার্থ এবং ৩৩ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। শুকনো ওজন ভিত্তিতে পাতায় (NP_2O_5) এবং (K_2O) এর পরিমাণ যথাক্রমে ১.৩০.৫ এবং ১.১%।

(১) শনপাট : গাছের বৃদ্ধি অনুযায়ী শনপাট থেকে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৮ টন কাঁচা সবুজ পদার্থ এবং ৪০ কেজি নাইট্রোজেন পাওয়া যায় এবং এটির প্রায় ২/৩ অংশ বায়ুমণ্ডল থেকে আসে। শুকনো ওজনভিত্তিতে শন পাটের পাতায় NP_2O_5) এবং (K_2O) এর পরিমাণ যথাক্রমে ২.৩,০.৫ এবং ১.৮%।

(২) গোমটর বা গোশিম : প্রায় ধৈঞ্চার অনুরূপ।

৫. জমির উর্বরতায় সবুজ সারের তাৎপর্য

ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য জৈব পদার্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকাজের জন্য জমিতে জৈব পদার্থের উপস্থিতির হার ২%-৫% থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ খুবই কম অর্থাৎ শতকরা ১%-২%। বাংলাদেশ বারিপাত অঞ্চলের আওতাভুক্ত এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন চুয়ানির মাধ্যমে অপচয় হয়। অথচ ফসল উৎপাদনের জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই মৃত্তিকার গুণাবলী সংরক্ষণের জন্য মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করা অত্যাবশ্যক।

কৃত্রিমভাবে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করার মাধ্যমের মধ্যে রয়েছে নানা প্রকার জৈব সার যেমন- সবুজ সার, খামারজাত সার, নানা প্রকার খৈল সার, আবর্জনা পচা সার।

গোবর কমে যাওয়ার কারণ–

(১) গবাদি পশুর সংখ্যা কম

(২) গোবর ও মূত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করা হয় না।

(৩) প্রচুর পরিমাণে গোবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নানা কারণে খামারজাত সারের ঘাটতি ও গুণগত মান কম। ক্রয় মূল্য বেশি ও প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় কৃষক খৈল সার ব্যবহার করতে পারে না। সকল স্থানে আবর্জনা সার প্রস্তুতের পর্যাপ্ত উপকরণও মেলে না। বিভিন্ন প্রকার ডাল ফসলের চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ হলেও জৈব পদার্থ যোগ হচ্ছে না। এমনকি জমি থেকে ফসলের অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার উপর ইউরিয়া সার ব্যবহার এবং অবউষ্ণ অঞ্চলের উষ্ণ তাপমাত্রার কারণে ভূমির জৈব পদার্থেরও দ্রুত অবক্ষয় হচ্ছে। ভূমি ক্ষয়ের মাধ্যমেও জৈব পদার্থ ও পুষ্টি উপাদানের অপচয় হচ্ছে। বাংলাদেশের মাটির উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি ধ্বংসমুখ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ কৃষিভিত্তিক এ দেশটির জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থানের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে এদেশের কৃষি তথা ভূমি।

অতএব বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে এদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত কোনো উৎস থেকে মাটিতে জৈব পদার্থ যোগ করার চিন্তা এবং সে অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর নিঃসন্দেহে বলা চলে যে লিগিউমজাতীয় নানাপ্রকার সবুজ সার ফসল যেমন– ধৈঞ্চা, শনপাট, গো-মটর চাষের মাধ্যমে সবুজ সার করার হচ্ছে বাস্তব সমাধান। এতে কার্যকরিভাবে কম সময়ে, কম খরচে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈবসার ও নাইট্রোজেন যোগ করে উর্বরতা ও উৎপাদিকা শক্তি কেবল সংরক্ষণই নয়, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করাও সম্ভব।

৬. ডাল ফসলের আগাছা দমন

অন্যান্য সকল ফসলের মতো ডাল ফসলেও অনেক ধরনের আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। কয়েকটি বিশেষ কারণে ডাল ফসলে আগাছর আক্রমণ বেশি হয় যেমন–

(১) ডাল ফসলে জমি তৈরির জন্য জমি চাষ করা হয়।

(২) অনুফসল ও মিশ্র ফসল হিসেবে অনেক ডাল ফসলের চাষ হয়। যেমন– বোনা আমন + খেশারি অনুফসল, রোপা আমন + মশুর অনুফসল। এসব জমি চাষই করা হয় না– তাই আগাছা বেশি জন্মায়।

(৩) গ্রীষ্মকালীন ডাল ফসলে অতিবৃষ্টি হলে ডাল ফসল যেমন– মুগ ডাল ও মাসকলাইয়ের জমি আগাছায় ভরে যায়।

(৪) ডাল ফসলের গতানুগতিক চাষে পরিচর্যা কম হয়।

(৫) ডাল ফসলে সাধারণত নিড়ানি দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশে সাধারণ মাঠ আগাছা যেমন দুর্বা, মুথা, ভেদাইল, শ্যামা, চাপড়া, দুধিয়া, কার্নেটি আগাছা, জয়না, গিটলা, শিয়াললেজা, মনা, দন্দকলস, হাতিশুঁড় প্রভৃতি সব সময়ই জন্মে থাকে। এছাড়াও ঘাসজাতীয় আগাছাসহ বিশেষ বিশেষ আগাছা অন্য ফসলে জন্মানোর সুযোগ পায় না– তাও ডাল ফসলে দেখা যায়। তাই এখানে সাধারণ আগাছা ছাড়াও ডাল ফসলে দেখা দেওয়া বিশেষ বিশেষ আগাছার সচিত্র পরিচিতি গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজন করা হলো।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ডালভিত্তিক ফসল বিন্যাসপদ্ধতি

১. ভূমিকা

বাংলাদেশে বর্তমানে একক ফসল চাষে ডাল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। সেচ সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে জমিতে ধানের চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মূলত ডাল ফসলের চাষ কমে যাচ্ছে। তাই দেশে ডাল উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য ফসল বিন্যাসে ডালের অন্তর্ভুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফসল পদ্ধতির মধ্যে বর্তমানে গবেষণার মাধ্যমে বেশ কিছু আন্তঃফসল (Intercropping), অনুফসল (Relay crop), আচ্ছাদন ফসল (Cover crop/sod crop), সবুজ ফসল (Green crop) প্রভৃতি বিবেচনায় আনা হচ্ছে। আলোচ্য অধ্যায়ে ডাল ফসলকে ফসল বিন্যাস পদ্ধতির আলোকে অন্তর্ভুক্ত করে চাষ করার প্রযুক্তিসমূহ বর্ণনা করা হলো।

কোনো এলাকার ফসল বিন্যাস, ফসলাবর্তন প্রভৃতির সমন্বয়ে ফসল বিন্যাস গড়ে উঠে। এজন্য ফসল পদ্ধতি বর্ণনার আগে ফসল বিন্যাস ও ফসলাবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ফসল বিন্যাস (Cropping pattern) : মাটি, আবহাওয়া ও কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে ফসল উৎপাদনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, যা একটি এলাকার ফসল নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে। এই ফসল ধারার সাথে লভ্য কৃষি প্রযুক্তির সমন্বয়ে এক এক এলাকায় গড়ে উঠা একাধিক ফসল উৎপাদনের ধারাকে ফসল বিন্যাস বলা হয়। কোনো এলাকায় একটি নির্দিষ্ট জমিতে এক বছরে ফসল উৎপাদনের যে ধারা অনুসরণ করা হয় তাকে ফসল বিন্যাস বলে। জমিভিত্তিক বার্ষিক এই ফসল অনুক্রম আবহাওয়া ও মাটির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত এবং কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত থাকে।

ফসলাবর্তন : জমির উর্বরতা নিরিখে ফসল উৎপাদনের সর্বোচ্চ লাভজনক অবস্থা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী ফসল চাষ করাকে ফসল পর্যায়ক্রম বা ফসলাবর্তন (Crop rotation) বলে। শস্য উৎপাদনে ফসলাবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। কোনো এলাকায় ফসল বিন্যাস ও ফসল পর্যায়ক্রম সেখানকার ফসল পদ্ধতি রচনা করে।

একটি জমিতে এক বছরে কি কি ফসল উৎপন্ন হয় এবং কোন ফসলের পরে কোনটি চাষ করা হয় তা ফসল বিন্যাস হিসেবে বোঝানো হয়। যেমন– কোনো এলাকায় এক বছরে ফসল উৎপাদন নিম্নরূপ হলে :

(১) খরিফ-১ মৌসুমে–আউশ ধান,

(২) খরিফ-২ মৌসুমে–আমন ধান,

(৩) রবি মৌসুমে–সরিষা।

এ জমির ফসল বিন্যাস হবে : *আউশ ধান–আমন ধান–সরিষা।*

ফসল বিন্যাস এক বা একাধিক ফসল সম্বলিত হতে পারে। প্রথাগতভাবে একাধিক ফসলকে যে কোনো একটি ফসল চাষের পর্যায়ক্রমে দেখানো যেতে পারে। যেমন–

(১) পতিত-আমন ধান-পতিত

(২) খরিফে আমন চাষ করে রবি ও খরিফ-১ এ পতিত

(৩) পতিত-আমন ধান-আলু

(৪) দুটি ফসল সম্বলিত বিন্যাস এবং খরিফ–১ মৌসুমে জমিতে কোনো ফসল করা হয়নি।

(৫) আউশ ধান/পাট-আমন ধান-সরিষা/ টমেটো/বাঁধাকপি/বেগুন।

তিনটি ফসল সম্বলিত এবং আউশ ধান ও সরিষার পরিবর্তে অন্য কোন কোন ফসল করা যেতে পারে তা দেখানো হয়েছে।

ফসল বিন্যাস ছক (সংক্ষিপ্ত)

বিষয়	মাস/মৌসুম		
	রবি	খরিফ-১	খরিফ-২
সময়	নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি	ফেব্রুয়ারি-মে	জুলাই-নভেম্বর
ফসলের নাম	গোল-আলু	ভুট্টা	রোপা আমন
জাতের নাম	কার্ডিনেল	মহর	মুক্তা

২. ফসল বিন্যাসের গুরুত্ব

বাংলাদেশের কৃষি মূলত জীবিকা-নির্বাহী (subsistence) কৃষি এবং ফসলভিত্তিক। দেশের জিডিপি-তে ফসলের অবদান প্রায় ২৪ ভাগ। প্রায় শতাধিক ফসল বাংলাদেশের কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে মাটি, আবহাওয়া ও কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কতিপয় ফসল দিয়েই ফসলের বিন্যাস গড়ে উঠে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি লভ্যতার প্রেক্ষিতে তারা প্রচলিত ফসল বিন্যাসের প্রয়োজনে পরিবর্তন করে থাকে।

বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশসমূহে পরিকল্পিত ফসল বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষির আধুনিকীকরণ ব্যবস্থায় আমাদের দেশে গত দু'দশকে এর উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এসব গবেষণা থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে, আমাদের দেশের ফসল উৎপাদন মূলত কৃষকের সম্পদ, জ্ঞান ও বিদ্যমান প্রযুক্তি (যেমন– আধুনিক জাত ও সার) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কৃষকরা যেসব ফসল থেকে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারে, সে সকল ফসলই তারা ফসল বিন্যাসে অর্ন্তভুক্ত করে। দেশের কৃষককূল এক অর্থে প্রগতিশীল বলা যায়।

বাংলাদেশের ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাস : বাংলাদেশে ফসল চাষের কেন্দ্রবিন্দু হলো ধান। ধান দেশের শতকরা ৭০ ভাগ ফসল বিন্যাসে অন্তত একটি ফসল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। ধান উৎপাদন দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক। জমির আয়তনের বিবেচনা আমন ধানকে চাষীরা দেশের প্রধান ফসল হিসেবে চিহ্নিত করে। দেশের প্রচলিত জলবায়ুতে

আমন ধান চাষের কোনো বিকল্প ফসল নাই। তাই দেশের প্রধান প্রধান ফসল বিন্যাস ধানের প্রাধান্য বর্তমান।

দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি ফসল বিন্যাস (উদাহরণ)

ফসল বিন্যাস	জমির প্রকার
রোপা আমন রবি ফসল	উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি
আউশ ধান-পাট-রবি ফসল	মাঝারি উঁচু জমি
আউশ ধান–পাট-রোপা আমন–রবি ফসল	মাঝারি উঁচু জমি
বোনা আমন–পাট–রবি ফসল	মাঝারি নিচু ও নিচু জমি
বোরো ধান–আমন ধান–রবি ফসল	মাঝারি উঁচু জমি
আখ (একক ফসল)	উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি
বোনা আমন ধান	নিচু ও খুব নিচু জমি
বোনা আমন–খেশারি	নিচু ও মাঝারি নিচু জমি
ডাল-ভুট্টা-রোপা আমন	মাঝারি উঁচু জমি
তুলা গ্রীষ্ম ডাল	উঁচু জমি
চিনাবাদাম-মাশকলাই	চরা ভূমি
মিষ্টি আলু-ডাল	চরা ভুমি
কলা/আনারস/পেঁপে + মিশ্র ডাল	উঁচু জমি
দেশী পাট–রবি ফসল (ডাল)	মাঝারি নিচু জমি
তোষা পাট–আলু-গ্রীষ্ম সবজি + ডাল	উঁচু জমি
ডাল-গ্রীষ্ম সবজি	উঁচু জমি
ডাল-আউশ-রোপা আমন	মাঝারি নিচু
গম-ডাল– রোপা আমন	উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি

ডাল– লেগুম পশু খাদ্যসহ।

৩. **ফসল বিন্যাসের উপাদান** (factors) : **জলবায়ু উপাদান**

কোনো একটি এলাকার ফসল বিন্যাস বিভিন্ন উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন :

ক. জলবায়ু উপাদান

(১) তাপ

(২) বৃষ্টিপাত

(৩) বায়ুপ্রবাহ

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগ : (ক) খরা (খ) বন্যা (গ) শিলাবৃষ্টি (ঘ) অতিবৃষ্টি।

(৫) দিবস দৈর্ঘ্য (Day length)

(৬) বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা

খ. মৃত্তিকা উপাদান

(১) ভূমির উচ্চতা : (১.১) উঁচু, (১.২) মাঝারি উঁচু, (১.৩) মাঝারি নিচু, (১.৪) নিচু, (১.৫) খুব নিচু জমি।

(২) মাটির বুনট

(৩) মৃত্তিকার অম্লমান (pH)

(৪) মৃত্তিকার লবণাক্ততা

(৫) পানি পরিস্থিতি

গ. আর্থ-সামাজিক উপাদান

(১) কৃষকের আর্থনৈতিক অবস্থা

(২) খাদ্যাভ্যাস

(৩) যাতায়াত ও বাজার ব্যবস্থা

(৪) কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা ও মূল্য

(৫) কৃষকের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি

(৬) ফসল গুদামজাতকরণের সুবিধা

ঘ. কৃষি প্রযুক্তিগত উপাদান

(১) প্রাকৃতিক উপাদান ও ঝুঁকির আশংকা

উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদান যেমন– তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, দিবস দৈর্ঘ্য, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতি কোনো এলাকার ফসলের অভিযোজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ফসল বিন্যাসে উল্লিখিত উপাদান যেভাবে সংশ্লিষ্ট সে বিষয়টি পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো।

(১) **তাপমাত্রা :** ফসল উৎপাদনে প্রতিটি ফসলের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা রয়েছে, আর সে কারণেই শীতপ্রধান অঞ্চলের ফসল মরু অঞ্চলে জন্মায় না। আবার কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে মৌসুমভিত্তিক তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণেও ফসল প্রজাতি ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন– দেশে রবি মৌসুমে নিম্ন তাপমাত্রায় যে ফসল ভাল জন্মে তা খরিফ মৌসুমে ভাল হয় না।

(২) **বৃষ্টিপাত :** বছরে মোট বৃষ্টিপাত এবং এর বিতরণ কোনো এলাকার ফসল উৎপাদন ধারাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। বর্তমানে সেচের মাধ্যমে এর প্রভাব কিছুটা কমানো হয়েছে। প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশে পাহাড়িয়া অঞ্চলে চা উৎপাদিত হয়।

ডাল ফসলভিত্তিক ফসল বিন্যাসের জন্য তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডাল ফসল চাষ পরিকল্পনায় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বিবেচনা করে বাংলাদেশে সারা বছরই ডাল ফসল জন্মানো যায়।

(৩) **দিবস দৈর্ঘ্য** (Day Length) : সকল ফসলের নির্দিষ্ট মাত্রার আলোক চাহিদা রয়েছে। আলোক সংবেদনশীল ফসলের বৃদ্ধি এবং ফলন সরাসরি দিবস দৈর্ঘ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হয়। যেমন- ডাল একটি খাটো দিবস উদ্ভিদ, এর দিবস দৈর্ঘ্য ১১ ঘণ্টার বেশি হলে ঐ গাছে অল্প বয়সে ফুল আসে। আর এ কারণেই ভাল ডাল উৎপাদন করার জন্য আমাদের দেশে খাটো দিবসে উৎপাদন করা হয়। তবে দীর্ঘ দিবসেও ডাল ফসল ফলানো যায় (জাতভেদে)

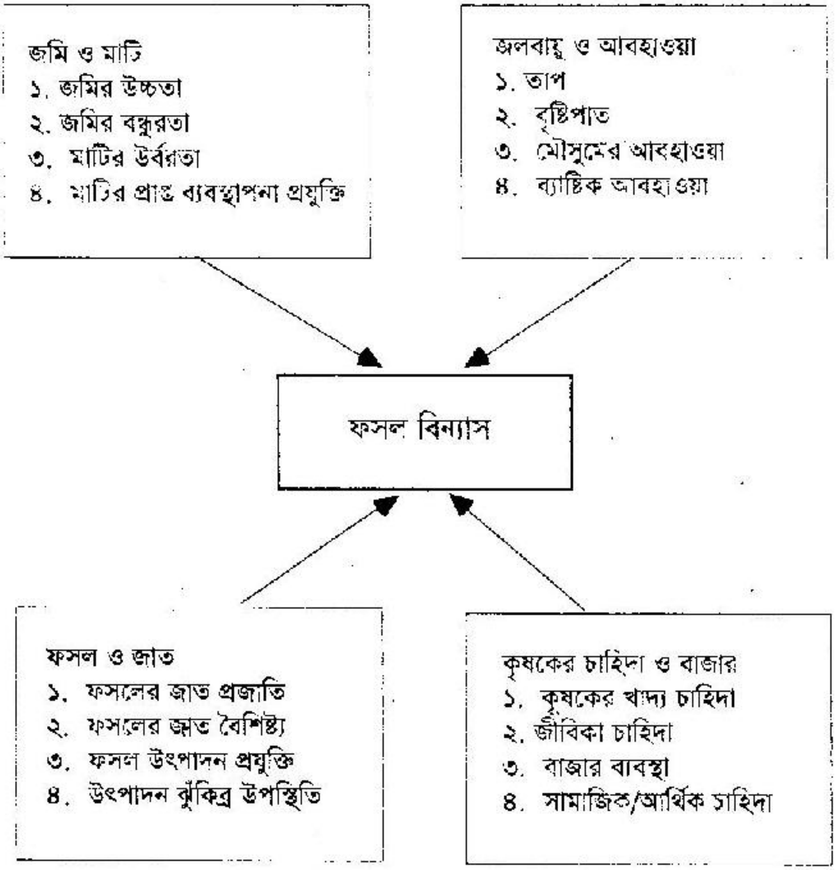

(৪) **বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা :** বায়ুমণ্ডলের আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফসল ধারা গড়ে ওঠে। যেমন- বায়ুমণ্ডলের অধিক আর্দ্রতার কারণে আমাদের দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নারিকেল, সুপারি ভাল জন্মে।

বাংলাদেশের দিবস দৈর্ঘ্য

বিষয়	মৌসুমভিত্তিক সময় (ঘণ্টা)		
	রবি	খরিফ-১	খরিফ-২
দিন	১১ ঘণ্টা	১১-১৩	১৩-১১
রাত	১৩ ঘণ্টা	১১-১৩	১৩-১১
মোট	২৪ ঘণ্টা	২৪	২৪

৪. ফসল বিন্যাসের মৃত্তিকাগত উপাদান

মৃত্তিকাগত বিভিন্ন উপাদান যেমন- ভূমির বন্ধুরতা, মাটির বুনট, ভূগর্ভস্থ পানির তল, মৃত্তিকা pH লবণাক্ততা ইত্যাদি ফসলের অভিযোজনকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে কোনো এলাকার ফসল বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করে। অম্লীয় মাটিতে ডাল ফসলের ফলন ভাল হয় না। মৃত্তিকার প্রধান উপাদান হলো :

(১) ভূমি উচ্চতা : ভূমির উচ্চতা বলতে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কোনো স্থান কতো উঁচু তাকে বোঝায়। তবে আমাদের দেশে ভূমির উচ্চতা সাধারণত বন্যার পানি অবস্থানের সময়সীমা অনুসারে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়-

(১) উঁচু জমি- যেখানে বন্যার পানি ওঠে না।
(২) মাঝারি উঁচু জমি- বন্যার/বৃষ্টির পানি দাঁড়ানোর উচ্চতা ৯০ সেন্টিমিটার
(৩) মাঝারি নিচু জমি- বন্যার/বৃষ্টির পানি দাঁড়ানোর উচ্চতা ৯০-১৮০ সেন্টিমিটার।
(৪) নিচু জমি- বন্যার পানি ১৮০ সেন্টিমিটার-এর উপরে উঠে।
(৫) খুব নিচু জমি- হাওড়, বিল, নিচু এলাকা, সারা বছর পানি থাকে।

উঁচু জমি, যেখানে কখনই বন্যার পানি উঠে না, সেখানে গ্রীষ্ম ডাল চাষ করা যায় যা মাঝারি নিচু থেকে খুব নিচু জমিতে পানি জমে থাকার কারণে চাষ করা যায় না। আবার নিচু জমি, যেখানে বন্যার পানি ১৮০ সেন্টিমিটার-এর বেশি হয় সেখানে জলী আমন ধান+খেশারি চাষ করা যায় যা উঁচু বা মাঝারি উঁচু জমিতে চাষ করা যায় না। ফসল বিন্যাস নিয়ন্ত্রণে ভূমির উচ্চতার সাথে এর বন্ধুরতা জড়িত রয়েছে।

(২) **মাটির বুনট** (Soil textune) : বুনটের উপর নির্ভর করে মাটির ধরন ভিন্ন হয়। ফলে মাটির গুণাবলী ও পানি ধারণ ক্ষমতাও ভিন্ন হয়। মাটির বুনট সরাসরি কোনো এলাকার ফসল প্রজাতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যেমন- ভেদ্য মাটি (permeable soil) যেখানে ভারি বৃষ্টিপাত কিংবা সেচের পরে কয়েক ঘন্টার বেশি পানি জমে থাকে না সেখানে গ্রীষ্মকালীন ডাল ইত্যাদি ভাল হয়, আবার অভেদ্য মাটি (impermeable soil) যেখানে ভারি বৃষ্টিপাত বা সেচের পর ৩-৭ দিন বা তারও বেশি সময় পানি জমে থাকে– সেখানে ধান ভাল হয়।

(৩) **মৃত্তিকা অম্লমান** (PH) : অম্লমানের উপর নির্ভর করে মাটি অম্লীয়, ক্ষারীয় ও নিরপেক্ষ এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। অধিকাংশ ফসল নিরপেক্ষ বিক্রিয়ায় (neutral reaction) মাটিতে ভাল হয়। কিছু কিছু ফসল আছে যেগুলোর জন্য অম্লীয় বা ক্ষারীয় মাটি ভাল আর এজন্যই সিলেটের অম্লীয় মাটিতে চা, আনারস, কফি ভাল হয়। ক্ষারীয় মাটির কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নারকেল ভাল হয়। ডাল ফসলের জন্য প্রচুর ম্যাগনেসিয়ামসম্পন্ন নিরপেক্ষ মাটি ভাল।

(৪) **মৃত্তিকার লবণাক্ততা** (Salinity) : মাটির বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে মৃত্তিকা লবণাক্ততাও কোনো কোনো এলাকার ফসল বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। মাটির লবণাক্ততা বেশি হলে সেখানে লবণাক্ততা সহনশীল উদ্ভিদ জন্মে থাকে।

বাংলাদেশের কতকগুলো স্থানীয় জাতের মুগকলাই কিছুটা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।

(৫) **মাটি পরিস্থিতি** : বন্যার পানি আসা, পানি অপসারিত হওয়ার সময়সীমার বন্যার পানির গভীরতা, মৃত্তিকা পানির লভ্যতা প্রভৃতি উপাদান দ্বারাও কোনো এলাকার ফসল বিন্যাস প্রভাবিত হয়ে থাকে।

৩. আর্থ সামাজিক উপাদান

ফসল নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

(১) **কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা** : কোনো এলাকার ফসল সেই এলাকার কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন- গরিব কৃষক অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন ব্যয়সম্পন্ন ফসল যথা- ডাল, তেল ইত্যাদি অধিক হারে চাষ করে। ধনী কৃষকরা অপেক্ষাকৃত অধিক উৎপাদন ব্যয়সম্পন্ন ফসল যথা- গোলআলু, ফুলকপি, কলা ইত্যাদি চাষে উৎসাহী হয়ে থাকে।

(২) **খাদ্যাভ্যাস** : কোনো এলাকার মানুষের খাদ্যাভ্যাস সে এলাকার ফসল নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। আমাদের দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত –এ কারণে আমাদের দেশের ফসলের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগই ধানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অথচ জাপানিরা সবজি খেতে পছন্দ করে। সেখানকার ফসলে সবজি ফসলের বেশি।

বাংলাদেশে ডাল খাদ্যের ব্যবহার পশ্চিম উত্তরাঞ্চলে বেশি, কারণ সেখানে ডাল ফসলের চাষ বেশি হয়।

কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা	ফসল চাষ
গরিব কৃষক	স্থানীয় জাতের খাদ্য ফসল (ডালসহ)
মধ্যম কৃষক	স্বঅর্থায়নে বাণিজ্যিক উৎপাদন, মধ্যম ব্যয় ফসল
বড় কৃষক	বৃহৎ বাণিজ্যিক খামার মূল্যবান ফসল।

(৩) **যাতায়াত ও বাজার ব্যবস্থা** : কোনো এলাকার যাতায়াত ও বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে এলাকার ফসল বিন্যাস প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেখানে যাতায়াত ও বাজার ব্যবস্থা অনুন্নত, সেখানে কৃষকরা সাধারণত নিজেদের খাবার উপযোগী ফসল অধিক পরিমাণে চাষ করে থাকে। আবার যেখানে যাতায়াত ও বাজার ব্যবস্থা উন্নত সেখানে শাকসবজি ও ফলমূল অধিক চাষ হয়।

(৪) **কৃষি উপকরণের প্রাপ্যতা ও মূল্য** ; সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ যেমন- বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি দরকার। এসব উপকরণের প্রাপ্যতা এবং মূল্য কোনো এলাকার ফসলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- আমাদের দেশে রবি মৌসুমে ডাল ভাল হলেও অনেক সময় কৃষকরা বীজের অভাবে ডাল চাষ করতে পারে না। আবার অনেক সময় বিভিন্ন উপকরণ যেমন- বীজ, গোলআলু, সার ইত্যাদি সহজলভ্য হলেও উচ্চমূল্যের কারণে গোল-আলুর চাষ ব্যাহত হয়।

(৫) **কৃষকের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি** : কৃষকের ফসল উৎপাদন বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কোনো এলাকায় বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল বিন্যাস গড়ে উঠেছে। এর অভাবে অন্য এলাকায় কৃষকরা এখনো মান্ধাতা আমলের ফসল আকড়ে ধরে আছে।

(৬) **গুদামজাতকরণের সুবিধা** : বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজিজাতীয় দ্রুত পচনশীল ফসল উৎপাদন করার ক্ষেত্রে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ

করে। কোনো এলাকায় পর্যাপ্ত গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার কারণে কৃষকরা বিভিন্ন ফলমূ- ও শাকসবজি উৎপাদন করলেও যেখানে গুদামজাতকরণের সুবিধা নেই সেখানে এ ধরনের ফসল চাষ হয় না।

ডাল ফসল উৎপাদনের জন্য এর গুদামজাতকরণ সুবিধা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডাল ফসল সংরক্ষণ অবস্থায় বহু প্রকারের পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

(৭) **কৃষি প্রযুক্তিগত উপাদান** : কৃষি প্রযুক্তিগত সুবিধার কারণেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ফসল বিন্যাস গড়ে উঠে। বর্তমানে কৃষির আধুনিকায়নের যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রযুক্তিগত উৎকর্য সাধনের ফলে বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল বিন্যাস গড়ে উঠেছে। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকার কারণে এখনো এদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক ফসল পদ্ধতি গড়ে উঠে নি। যেমন- ডাল সংরক্ষণ, সয়াবিন ও সূর্যমুখী বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করার যন্ত্র ইত্যাদির অভাবে আমাদের দেশে উপরোক্ত ফসলের চাষাবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

কৃষি প্রযুক্তির প্রকার : কৃষি প্রযুক্তি নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে-

(১) ফসল জাত
(২) উৎপাদন প্রযুক্তি
(৩) উপকরণ প্রযুক্তি
(৪) প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি
(৫) সংরক্ষণ প্রযুক্তি

(৮) **প্রাকৃতিক উপাদান ও ঝুঁকি** : বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিও কোনো কোনো এলাকার ফসল উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। যেমন- যে এলাকায় বন্যায় পানি আসে এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকে সেখানে ডালজাতীয় ও পশু খাদ্য ইত্যাদির চাষ করা যায় না। আবার যেসব অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় বেশি হয় সেখানে ঝড় প্রতিরোধী ফসল যেমন এলি ঘাস বেশি জন্মে।

৫. বহু ফসলীকরণ (Multiple Cropping)

সময় ও স্থানের পরিসরে কোনো একটি জমিতে ফসল চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা এবং সময় ও স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো একটি জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করাকে বহু ফসলীকরণ বলা হয়।

বর্তমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা মেটাতে মানুষ প্রতিনিয়তই ফসলের উন্নত জাত, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি উদ্ভাবন করে চলেছে। তারপরেও মানুষ খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যে একই জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদনের প্রতি মনোনিবেশ করেছে, যা থেকে একাধিক ফসল সম্বলিত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কীভাবে একাধিক ফসল সম্বলিত পদ্ধতি আরো লাভজনক প্রযুক্তিতে পরিণত করা যায় তার উপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের কাজ চলছে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে অনেক আগে থেকে একাধিক ফসল চাষ পদ্ধতি চালু। এদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে একাধিক ফসল পদ্ধতি অনুসরণ করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব।

বহু ফসলীকরণের প্রকারভেদ : একাধিক ফসল সম্বলিত পদ্ধতির প্রকারভেদ সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা যায় :

১. পর্যায়ক্রমিক ফসল বিন্যাস

(১) এক-ফসল পদ্ধতি (Mono-cropping)
(২) দ্বি-ফসল পদ্ধতি (Double-cropping)
(৩) ত্রি-ফসল পদ্ধতি (Triple-cropping)

২. আন্তঃ বা যুগপৎ ফসল অনুক্রম

(১) মিশ্র আন্তঃ ফসল পদ্ধতি (Mixed inter-cropping)
(২) সারি আন্তঃ ফসল পদ্ধতি (Row inter-cropping)
(৩) ফালি বা খণ্ড ফসল পদ্ধতি (Strip-cropping)
(৪) সাথী বা অনুঃ ফসল পদ্ধতি (Relay-cropping)

সব ফসল বিন্যাসে জমিতে একই বছরে পর্যায়ক্রমে ২টি, ৩টি ও ৪টি ফসলের চাষ করা হয়। যেহেতু এদেশের মাঠ ফসলের জীবনকাল মোটামুটি ১০০-১৫০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়, পর্যায়ক্রমিক ফসল চাষে একই জমিতে অনায়াসে ২টি বা ৩টি ফসল চাষ সম্ভব। তিনটি ফসলের ক্ষেত্রে কখনো বীজতলার সাহায্যে কোনো একটি বা দুটি ফসলের প্রাথমিক সময়কাল মূল জমির বাইরে কাটিয়ে নেওয়া হয়, তারও বেশি সংখ্যক ফসল পদ্ধতিতে এক বা একাধিক ফসল অবশ্যই সবজি বা সবুজসারজাতীয় ফসল হয়ে থাকে। এসব ফসলের সংগ্রহের মেয়াদ ২০-৬০ দিন পর্যন্ত মাত্র।

যুগপৎ ফসল চাষে দুটি ফসলের বীজ একত্রে মিশিয়ে ছিটিয়ে বুনে ফসল উৎপাদন করাকে মিশ্র আন্তঃফসল বা মিশ্র ফসল বলে। পাশাপাশি সারিতে দুটো ফসল লাগানোকে সারি আন্তঃফসল বলে। সাথী ফসল হচ্ছে- একটি ফসল পরিপক্বতা পর্যায়ে এসে গেলে দ্বিতীয় ফসলটির বীজ বপন করা হলে এই দ্বিতীয় ফসলটিকে সাথী ফসল বা আন্তঃফসল বলা হয়।

বহু ফসলীকরণের গুরুত্ব : একাধিক ফসল চাষের বিভিন্ন উপকারী প্রভাবের কারণেই বহু ফসলীকরণের উপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

(১) **উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের দক্ষ ব্যবহার সম্ভব :** ফসল উৎপাদন করার জন্য জমিতে সার হিসেবে যেসব পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা হয় তার কিছু অংশ মাঠের বর্তমান ফসল (standing crop) গ্রহণ করে এবং বাকি অংশ মাটিতে থেকে যায় (residual potion) যা পরবর্তীকালে ফসল উৎপাদন না করলে মাটি থেকে বিভিন্নভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বছরে পর্যায়ক্রমে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হলে এসব উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের দক্ষ ব্যবহার সম্ভব হয়।

(২) **ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়ে :** কোনো একটি জমিতে বছরে একাধিক ফসল চাষ করা হলে সেই জমির শস্য চাষ নিবিড়তা বৃদ্ধি পায় যা উন্নয়নশীল দেশের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এদেশে বর্তমানে শস্যচাষ নিবিড়তা ১৭৫%। অদূর ভবিষ্যতে ফসল চাষের নিবিড়তা আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৩) **ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি** : কোনো একটি জমিতে বছরে একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করার চেয়ে সে জমিতে বছরে দুই বা তার অধিক ফসল উৎপাদন করা হলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। এমনকি এক বছর স্থায়ী ফসল যেমন- আখ-এর সাথে যদি আন্তঃফসল হিসেবে আরো এক বা একাধিক ফসল চাষ করা হয় তাহলে মোট উৎপাদন এককভাবে আখের উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়।

(৫) **ফসল আগাছার প্রকোপ কমে** : কোনো জমিতে আগাছার প্রকোপ কমানোর প্রধান শর্ত হলো ফসল বপনের পূর্বে জমি ভালভাবে চাষ করা। কোনো জমিতে বছরে একাধিক ফসল ফলানো হলে সে জমি বেশি করে চাষ করা হয় বলে আগাছার প্রকোপ কমে যায়।

(৬) **রোগ ও পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কম হয়** : কোনো জমিতে বছরে একটি ফসল উৎপাদন করা হলে তাতে রোগ ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। কিন্তু কোনো জমিতে একাধিক ফসল আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করা হলে রোগ ও পোকার উপদ্রব তুলনামূলকভাবে কম হয়।

(৭) **ফসল চাষে বৈচিত্র্য আসে** : একাধিক ফসল পদ্ধতিতে ফলের একটি জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যায় বলে ফসল চাষে বৈচিত্র্য আসে। একই ফসলের পরিবর্তে একাধিক ফসল চাষ করা হলে উৎপাদন ঝুঁকি কমে যায়

(৮) **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়** : কোনো জমিতে বছরে একটি ফসল উৎপাদন করা হলে যে পরিমাণ শ্রমিকের দরকার, একাধিক ফসল উৎপাদন করলে তার চেয়ে বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার শস্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য অধিক শ্রমিকের দরকার হয়। একাধিক ফসল সম্বলিত ফসলক্রম অবলম্বনের ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।

(৯) **ফসল ক্ষতির ঝুঁকি কমে যায়** : কোনো জমিতে বছরে একটি ফসল করা হলে তা খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোনো জমিতে যদি বছরে একাধিক ফসল চাষ করা হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি ফসল মারা গেলেও অন্য ফসল থেকে কিছু ফলন পাওয়া যায়। এভাবে সামগ্রিক ক্ষতির হাত থেকে কৃষক রেহাই পেতে পারেন।

(১০) **কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়** : কোনো জমিতে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করা হলে ফসলের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সে কারণে আয়ও বাড়ে।

একাধিক ফসল চাষের ফলে একাধিক পণ্য উৎপাদিত হয়। কৃষক বিভিন্ন ধরনের ফলে কৃষক তখন অনেক বেশি আত্মনির্ভর হয়।

বহুফসলীকরণের সমস্যা : বহুবিধ ফসল চাষে সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধা রয়েছে। এ সম্বন্ধে নিচে উল্লেখ করা হলো-

(১) **প্রচুর কৃষি উপকরণ প্রয়োজন** : আমাদের দেশের চাষী গরিব বলে বহু ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে না।

(২) **অধিক শ্রমিক প্রয়োজন** : আমাদের দেশে ফসল সংগ্রহের সময় শ্রমিকের খুব অভাব হয়। সাধারণত ফসলীকরণে শস্য চাষ পদ্ধতি জটিল এবং ৩-৪টি ফসল উৎপাদনের

জন্য অধিক পরিমাণ শ্রমিকের দরকার পড়ে। শ্রমিকের অভাবের কারণে অধিক ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।

(৩) **কৃষকদের জ্ঞান** : বহু ফসলীকরণে শস্য চাষ করতে প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার দরকার। সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব হলে বহুফসলীকরণে ফসলের চাষ করা সম্ভব হবে না।

(৪) **পোকা ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে** : এক্ষেত্রে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদিত হওয়ায় ফসলভিত্তিক সংবেদনশীল পোকা ও রোগের আক্রমণ বেশ লক্ষ্যণীয়। কিছু কিছু ক্ষতিকর পোকা এবং রোগজীবাণু এক ফসল থেকে অন্য ফসলে স্থানান্তর হয়। বহুফসলীকরণে শস্য চাষ করলে পোকা এবং রোগ জীবাণুর আবাসস্থল হবে ফসলী জমি। যেমন- টমেটো, বেগুন এবং আলু আন্তঃফসল করলে মূলপচন, ভাইরাস রোগ এবং ছত্রাকজাতীয় রোগ এক ফসল থেকে অন্য ফসল আক্রমণ করবে। এতে সব ফসলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মশুর ও সরিষার মিশ্রচাষ করলে উভয়টিতেই জাবপোকার আক্রমণ দীর্ঘায়িত হতে পারে।

(৫) **কৃষকের উপকরণ সংগ্রহের অসুবিধা** : অল্প সময়ে অধিক ফসল উৎপাদন করার জন্য অধিক পরিমাণ সার, সেচ, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োজন বলে গরিব কৃষক তা যোগাড় করতে পারে না।

(৬) **অ্যালিলোপ্যাথির প্রভাব** : কোনো কোনো উদ্ভিদ তার শিকড়ের মাধ্যমে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে যে তার আশেপাশের অন্যান্য উদ্ভিদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও পরিপক্ব কোনো ফসলের বিভিন্ন অংশ মারা যাবার ফলে বা পচনের ফলে সৃষ্ট অ্যালিলোপ্যাথিক (allelopathic) পদার্থ আন্তঃফসল বা সাথী ফসলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

এক ফসল চাষের সাথে বহু ফসলীকরণের পারস্পরিক তুলনা থেকে উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

এক ফসল ও বহুফসলীকরণের তুলনা

এক ফসল	বহুফসলীকরণ
একটি ফসলের চাষ পদ্ধতি জানলেই চলে	বহু ফসলের চাষ পদ্ধতি এবং এগুলোর আন্তঃক্রিয়া জানতে হয়।
উপকরণ সরল প্রকৃতির	উপকরণ ব্যবস্থাপন বেশ জটিল
প্রক্রিয়াজাতকরণ সহজ	প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যাপক
শ্রমিক কম লাগে	সারা বছরে বেশি শ্রমিক লাগে
ব্যয় মৌসুমভিত্তিক	ব্যয় সারা বছর
ঝুঁকি বেশি	ঝুঁকি কম

৬. আন্তঃফসল ও সাথী ফসল

আদিম মানুষ ফসল চাষের শুরুতেই খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর জন্য একই জমিতে বিভিন্ন গাছের বীজ একত্রে মিশিয়ে বপন করত। ফসল উৎপাদনের সূচনা থেকেই

মানুষ নিজেদের অজ্ঞাতেই আন্তঃফসলের চাষাবাদ শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণার আলোকে আন্তঃফসল চাষ সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

কোনো এক খণ্ড জমিতে যখন একাধিক ফসল মিশ্রভাবে বা এক সাথে জন্মানো হয়, তখন তাকে আন্তঃফসলীকরণ বলে। এ ক্ষেত্রে একটি জমিতে সময় ও স্থান দুটিই বিবেচনা করে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ একাধিক ফসল একত্রে বিভিন্ন জ্যামিতিক বৈচিত্র্য অনুসরণ করে চাষ করা হয় অথবা পূর্ববর্তী ফসল যখন পরিপক্বতা পর্যায়ে পৌঁছে তখন পরবর্তী ফসল বপন বা রোপণ করা হয়। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন দিক বিবেচনায় আন্তঃফসল চাষকে একটি অন্যতম প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যেমন-

(১) মিশ্র আন্তঃফসল বা মিশ্র ফসল (Mixed cropping)
(২) সারি আন্তঃফসল (Row intercropping)
(৩) ফালি খণ্ড আন্তঃফসল (Strip intercropping)
(৪) সাথী আন্তঃফসল অনু ফসল (Relay intercropping)
(৫) সাথী ফসল (Companion cropping)
(৬) আচ্ছাদন ফসল (Cover cropping)
(৭) সংযুক্তি ফসল (Catch cropping)
(৮) সুযোগ ফসল (Chance cropping)
(৯) সার্বক্ষণিক ফসল (Continuous cropping)
(১০) বিবিধ ফসল (Miscellaneous cropping combinations)

(১) **মিশ্র আন্তঃফসল বা মিশ্র ফসল** : প্রথমে একাধিক ফসলের বীজ একত্রে মিশানো হয় এবং পরবর্তীকালে একখণ্ড জমিতে ছিটিয়ে বোনা হয়। এ ধরনের ফসল চাষকে মিশ্র আন্তঃফসল বা মিশ্র ফসল বলে। ফসল দুটির সংগ্রহের সময় সমকালীন হতে পারে অথবা পূর্বাপরও হতে পারে। যেমন- বোনা আমন ধানের জমিতে খেশারি বীজ বা রোপা আমন ধানের জমিতে মশুর বীজ একত্রে মিশিয়ে বপন করা হয়। সমসাময়িক জীবনকালীন মিশ্র ফসল চাষে ফসলদ্বয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা কমানোর লক্ষ্যে একটিকে প্রধান ফসল এবং অন্যটিকে গৌণ ফসল বলে চিহ্নিত করা হয়। সাধারণত প্রধান ফসলটি হয় অপেক্ষাকৃত খাটো (dwarf crop) যেটি জমিতে নিচে অবস্থান করে এবং যার কাম্য গাছ সংখ্যা থাকে অন্য ফসলটির চেয়ে বেশি। লম্বা ফসলটি (Tall crop) হচ্ছে গৌণ ফসল, যেটি অন্য ফসলটির উপরে থাকে এবং যার গাছ সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। লম্বা ও খাটো ফসলের সমন্বয়ে মিশ্র চাষের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, লম্বা ফসলের গাছ জমির উপর থেকে অপেক্ষাকৃত কম সূর্যালোক রোধ করবে, অবশিষ্ট সূর্যালোক দিয়েই খাটো ফসলটি তার বৃদ্ধি ও ফলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

(২) **সারি আন্তঃফসল** (Row inter-crop) : দুই বা ততোধিক ফসল একত্রে কোনো একটি জমিতে জন্মানো হলে যখন কমপক্ষে একটি ফসল সারি করে লাগানো হয়, তখন তাকে সারি আন্তঃফসল বলে। যেমন- আখের জমিতে দুই সারির মাঝে মশুর ফসল

লাগানো হয়। দুটি ফসলের সারির সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। যেমন- এক সারি একটি ফসলের পর এক সারিতে অন্য ফসল চাষকে একান্তর সারি (Single row or alternate row) পদ্ধতি বলে। দুই সারি এক ফসলের পর ১ বা ২ সারি অন্য ফসল চাষকে জোড় সারি (paired row) আন্তঃফসল চাষ বলে।

৩। **ফালি আন্তঃফসল** (Strip cropping) : দুই বা ততোধিক ফসল কোনো একটি জমিতে একত্রে বিভিন্ন ফালিতে জন্মানো হলে যেখানে ফসলসমূহ আলাদাভাবে চাষ হচ্ছে বলে মনে করা হলেও এগুলোর মধ্যে কৃষিতাত্ত্বিকভাবে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান থাকে তখন তাকে ফালি আন্তঃফসল বলে। ফালি চাষের তৎপর্য হচ্ছে যে, প্রধান ফসলের সাথে ফালিতে এমন একটি ফসল চাষ করা হয় যার বিশেষভাবে মাটি আঁকড়ে ধরে রাখার বা মাটিকে ঢেকে রাখার ক্ষমতা থাকে। পাহাড়ী এলাকায় বা যে কোনো ঢালু জমির ক্ষেত্রে এ ধরনের ফালি চাষের ফলে জমির ক্ষয়রোধ করা সম্ভব। যেমন- পাহাড়ী অঞ্চলে ঢালু জমিকে বিভিন্ন ফালিতে বিভক্ত করে এক ফালিতে আনারস অন্য ফালিতে আউশ ধান চাষ করা হয়।

(৪) **অনুফসল** (Relay cropping) : একটি ফসল কাটার কিছুদিন পূর্বে অন্য একটি ফসলের বীজ ছিটিয়ে দেওয়া হয় বা লাগানো হয়- এ ধরনের ফসলকে অনুফসল বলে। প্রথম ফসল পরিপক্ব পর্যায়ে থাকায় তার বৃদ্ধি স্তিমিত হয়ে যায় বলে মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান ও রস গ্রহণ করে না বললেই চলে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ফসল মাটির অবশিষ্ট আর্দ্রতা কাজে লাগিয়ে তার অঙ্কুরোদ্গম ও প্রাথমিক বৃদ্ধি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। প্রথম ফসল কাটার পর দ্বিতীয় ফসলটির জন্য আন্তঃফসল প্রতিযোগিতা দূর হয় এবং দ্বিতীয় ফসলটি জীবনকাল সম্পন্ন করে। যেমন রোপা ও বোনা আমন ধানের শেষ পর্যায়ে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খেশারি বীজ বপন করা হয়। আমন ধান কাটার পরেই খেশারির বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জমিতে অবশিষ্ট আমন ধানের নাড়া বেয়ে খেশারি গাছ বেড়ে উঠে।

আন্তঃ ও অনুফসলে সার প্রয়োগ : মাটি, আবহাওয়া ও ফসলের কাম্য ফলন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সার ব্যবহারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। ফসলের প্রকৃতি অর্থাৎ একক ফসল বা আন্তঃফসল হিসেবে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতির তারতম্য হতে পারে। সারের পরিমাণ নির্ণয়ে আন্তঃফসল ও অনু ফসলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা উল্লেখ করা যায়:

(১) **মিশ্র ফসলে প্রধান ফসলে সারের ব্যবহার** : মিশ্র ফসল চাষের মূল তত্ত্ব হচ্ছে প্রধান ফসলের অতিরিক্ত কিছু ব্যবহার না করে অন্য ফসল থেকে অতিরিক্ত একটি পাওনা। এই ধারণার ফলে গৌণ ফসলের জন্য সাধারণত কোনোরূপ সার আলাদা করে দেওয়া হয় না।

(২) **অনুফসলের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন ব্যবহার** : অনুফসলের ক্ষেত্রে দুটি ফসল আন্তঃফসল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় না, নীতিগতভাবে তাই দুটি ফসলের পূর্ণ মাত্রা সার ব্যবহার করার কথা।

প্রথম ফসলে ফসফরাস ও পটাশ সার সম্পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় ফলে এবং দ্বিতীয় ফসলে তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ায় অসুবিধার কারণে এই সার দুটি আর দ্বিতীয় ফসলে প্রয়োগ করা হয় না।

প্রথম ফসলে সার যথারীতি প্রয়োগ করা হয় এবং শুধু নাইট্রোজেন সার, যার কোনো অবশিষ্ট প্রতিক্রিয়া থাকে না, সেটি প্রথম ফসল কাটার পর দ্বিতীয় ফসলের মাত্রানুযায়ী জমিতে উপরি প্রয়োগ করা যায়।

তবে লেগ্যুমজাতীয় মিশ্র ও অনুফসলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ফসল লেগ্যুম হলে সে ক্ষেত্রে আর সার প্রয়োগ করা হয় না।

(৩) দীর্ঘমেয়াদি ফসলের মাঝে স্বল্পমেয়াদি ফসল চাষে পূর্ণ মাত্রার সার ব্যবহার : আখ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সারিতে লাগানো হয় এবং এপ্রিল-মে মাসের আগে আখের চারা জমি ঢাকতে পারে না। তাই এর মাঝে ডাল ফসল প্রভৃতি সফলভাবে চাষ করে নেওয়া সম্ভব। আখের জন্য সারের পূর্ণ মাত্রা এবং ফসলটির জন্যও সারের অনুমোদিত মাত্রা ব্যবহার করতে হবে। আখের জন্য গোবর, তিন ভাগের দুই ভাগ ইউরিয়া ও এমপি, সবটুকু টিএসপি, ডলোচুন এবং জিঙ্ক সালফেট রোপণের ১-২ দিন আগে নালায় প্রয়োগ করতে হবে। ১/৩ ইউরিয়া অবশিষ্ট এমপি ৯০-১২০ দিন পরে এবং অবশিষ্ট ২/৩ ইউরিয়া মে-জুন মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

আন্তঃফসলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সার আখের দুই সারির মাঝে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন ডাল ফসলের (মশুর) ক্ষেত্রে বোনার আগে সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি, ডলোচুন ও মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

আন্তঃফসল চাষে ফসলের কোনো একটির প্রতি বিশেষ কোনো সারের ক্ষতিকারক প্রভাব থাকলে সেক্ষেত্রে বিকল্প সার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় কোনো বিশেষ সার উভয় ফসলের নিকট গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। যেমন ডাল ফসল চাষের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে, বিশেষ করে কিস্তি সার ব্যবহার করতে হয় না।

অনুফসল ও আন্তঃ ফসলে ব্যবহৃতব্য সারের মাত্রা (উদাহরণ)

ফসল	সার (কেজি/হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	ডলোচুন	জিঙ্ক সালফেট
১. মশুর ও সরিষার মিশ্র চাষ	৩৫	৯০	৩৫	৫০০	৯
২. রোপা আমনের সাথী ফসল					
(ক) রোপা আমন	১০০	৭৫	৪০	৬০০	১০
(খ) মশুর					
৩. আখের সাথে অন্যান্য আন্তঃফসল					
(ক) আখ	৩৭০	২৭৫	২৭৫	১০০০	১০
(খ) অন্যান্য ফসল					
মশুর	১৫	৪৫	২৫	১০০	৪
ছোলা	১৫	৪৫	২৫	২০০	৪
চীনাবাদাম	২০	৪৫	২৫	৩০০	৫

আন্তঃফসলের পরিচর্যা : আন্তঃফসলের জন্য আলাদা বিশেষ কোনো পরিচর্যা নেই। তবে ফসলদ্বয়ের পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হয়। যদি দুটি ফসলের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রশ্ন আসে তাহলে আপেক্ষিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। যেমন-

(১) আখ মশুর আন্তঃফসলে আখ গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া মশুর কাটার পরেই শুরু করতে হয়।

(২) গম-মশুর মিশ্র ফসল চাষে গমের জন্য প্রয়োজনীয় প্লাবন সেচ (flood irrigation) দিলে প্রায় সব মশুর গাছ মারা যেতে পারে অথবা গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে।

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আন্তঃফসলের পরিচর্যা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এক ফসলের উপকার করতে অন্য ফসলের ক্ষতি করা যাবে না। প্রতিটি ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পদ্ধতি গ্রহণ করে ফসলের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রচেষ্টা নিতে হবে।

৭. ফসলাবর্তন বা ফসল পর্যায় (Crop Rotation)

কোনো একটি নির্দিষ্ট জমিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফসল ধারাবাহিকভাবে উৎপাদন করাকে ফসলাবর্তন বা ফসল পর্যায় বলে।

কোনো একটি নির্দিষ্ট জমিতে অপরিকল্পিতভাবে ফসল না জন্মিয়ে সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য পর্যায়ক্রমে চাষ করা বাঞ্ছনীয়। ফসলাবর্তন বিভিন্ন সময়সীমার জন্য হতে পারে; তবে লাভজনকভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য সাধারণত ৩-৫ বছরব্যাপী ফসলাবর্তন সর্বোত্তম।

অতীতকালে কোনো একটি নির্দিষ্ট জমিতে কেবল একটি ফসল চাষের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, কোনো নির্দিষ্ট জমিতে বছরের পর বছর একই ফসল চাষ করার ফলে সেই ফসলের ফলন কমে যায়। তখন সেই জমি কিছু কালের জন্য অনাবাদী রেখে দেওয়া শুরু হয়। পরে দ্রুত বর্ধনশীল বিশ্ব জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মানুষ ফসল উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন শুরু করল। এর অন্যতম হচ্ছে ফসলাবর্তন বা ফসলপর্যায় অবলম্বন। প্রমাণ হলো একই জমিতে একই ফসল উৎপাদন না করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

বর্তমানে কৃষিতে উন্নত দেশসমূহে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসলপর্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক ফসলাবর্তনের ব্যবহার উচিত।

ফসলাবর্তনের উপাদান : ফসলাবর্তন তৈরি করার জন্য নিচের ধাপ অনুসরণ করতে হয়-

(১) **জমি খণ্ডকরণ** : ফসলাবর্তন যত বছরের জন্য তৈরি করা হবে মোট জমি সেই কয়টি খণ্ডে বিভক্ত করতে হয়। তবে জমির পরিমাণ খুব বড় হলে খণ্ডের সংখ্যা বছরের সংখ্যার গুণিতক হওয়া উত্তম। যেমন- বছরের ফসলাবর্তনের জন্য মোট জমিকে ৪টির স্থলে ১২, ১৬টি খণ্ডে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(২) **ফসল সংখ্যা নির্ধারণ** : ফসলাবর্তনের জন্য মোট ফসল সংখ্যা নির্বাচন করতে হয়। এর জন্য ফসলাবর্তনের বছর সংখ্যা, জমি খণ্ডের সংখ্যা, জমি খণ্ড এক, দ্বি

বা ত্রিফসলী কি-না তা বিবেচনা করতে হবে : যেমন- ত্রি-ফসলী জমির ক্ষেত্রে ৫ বছরের জন্য ফসলাবর্তন করতে হলে মোট ৫×৩ = ১৫টি ফসল নির্বাচন করতে হয়।

(৩) **ফসল বিতরণ** : প্রথম বছরে নির্বাচিত ফসলসমূহ বিভিন্ন জমি খণ্ডে এমনভাবে চাষ করতে হয় যেন বছরের বিভিন্ন ঋতুতে সকল ফসল জন্মানো যায়।

(৪) **ফসল পরিবর্তন** : দ্বিতীয় বছরে এসে প্রথম জমি খণ্ডে প্রথম বছর যে ফসল ছিল সেটি দ্বিতীয় খণ্ডে শুরু করে বাকি ফসল ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য জমি খণ্ডে বিতরণ করতে হয়।

এভাবে পরবর্তী বছরে বিভিন্ন ফসল পর্যায়ক্রমে উপরোক্ত নিয়মে বিভিন্ন জমি খণ্ডে আবর্তন করতে হয়।

ফসলের নাম	বছর				
	প্রথম বছর	*দ্বিতীয় বছর*	*তৃতীয় বছর*	*চতুর্থ বছর*	*পঞ্চম বছর*
দানা	বোরো ধান	গম	ভুট্টা	গম	বোরো ধান
ডাল	মশুর	মুগ	মশুর	মাশকলাই	ছোলা
পশু খাদ্য ও সবুজ ফসল	খেশারি	গিনিঘাস	–	–	অন্য ঘাস
সবজি	কপি গোত্রের ফসল	শাক	গ্রীষ্ম সবজি	কুমড়াজাতীয় ফসল	কপিগোত্রের ফসল

ফসলাবর্তনের নীতিমালা : ফসলাবর্তন অবলম্বনের জন্য কয়েকটি নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। যেমন:

(১) অধিক পুষ্টি উপাদান পরিশোষণকারী ফসলের পর অপেক্ষাকৃত কম পুষ্টি উপাদান শোষণকারী ফসলের চাষ করতে হয়।

(২) অধিক পুষ্টি উপাদান শোষণকারী ফসল (যেমন- আখ, ভুট্টা ইত্যাদি) চাষের পূর্বে সবুজ সার লেগুমজাতীয় ফসলের (ধৈঞ্চা, কুসুম ফুল, গোমটর) চাষ করতে হয়।

(৩) ফসল পর্যায়ের জন্য ফসলসমূহ সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হয়। যেমন- ফসলসমূহ স্থানীয় জলবায়ু, মাটি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে অভিযোজিত হতে হয়।

(৪) অগভীরমূলী ফসল উৎপাদনের পর গভীরমূলী ফসল উৎপাদন করতে হয়।

(৫) আগাছার প্রকোপ কমানোর জন্য অধিক চাষের দরকার এমন ধরনের ফসল নির্বাচন করতে হয়।

(৬) ফসল নির্বাচনের সময় পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হয়।

(৭) শ্রমিকের প্রাপ্যতা বিবেচনা করতে হয়।

(৮) ভূমিক্ষয় রোধকল্পে আচ্ছাদন ফসল (sod crop) নির্বাচন করতে হয়।

৯. গবাদি পশুর জন্য গো- খাদ্যজাতীয় ফসল নির্বাচন করতে হয়।
১০. ফসল নির্বাচন করার সময় কৃষকের দক্ষতা বিবেচনা করতে হয়।
১১. শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি প্রাপ্তি বিষয় বিবেচনা করে ফসল নির্বাচন করতে হয়।
১২. সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য কৃষকের ক্ষমতা বিবেচনা করতে হয়।
১৩. ফসল ও মৃত্তিকাভেদে ভিন্ন ফসলাবর্তন অনুসরণ করতে হয়।
১৪. অধিক লাভজনক ফসল নির্বাচন করতে হয়। যেমন- শহর এলাকার নিকটে বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও শাকসবজি, মিল-কারখানার নিকটে কারখানার উপযোগী ফসল, গবাদি পশুর খামারে নিকট গো-খাদ্য ফসল হবে অধিক লাভজনক।

একই খামারে যখন দুই ধরনের মাটি থাকে তখন সেখানে দুই ধরনের ফসলাবর্তন অবলম্বন করা উত্তম। যেমন- খামারজাত সার প্রয়োগকৃত এবং অধিক নাইট্রোজেনসমৃদ্ধ নিচু জমিতে বিভিন্ন ফসল ভাল হলেও এ ধরনের জমিতে যদি ডাল উৎপাদন করা হয় তাহলে ফলন কম হতে পারে।

খামারের জমিভেদে ফসলাবর্তন পরিবর্তনের উদাহরণ

উঁচু, হালকা বুনট ডাল (মুগ), তুলা, গ্রীষ্ম সবজি মাশ- পাট- পশুখাদ্য (সবজি) অড়হর- সবুজ ফসল- সবজি	*মাঝারি উঁচু, দোআঁশ* ডাল (ছোলা), রোপা আমন- সবজি ছোলা- গ্রীষ্ম সবজি- ধান গম- গ্রীষ্ম ডাল- পশুখাদ্য
মাঝারি নিচু, পলি দোআঁশ ধান মশুর- শীত সবজি খেশারি- সবুজ ফসল-ধান পশুখাদ্য- ধান- ধান	*নিচু এঁটেল দোআশ* বোনা আমন-খেশারি- গম- বোনা আমন-বোরো ধান- বোনা আমন

ফসলাবর্তনের পরিকল্পনা (Crop rotation plan) : সুষ্ঠু ফসলাবর্তন অনুসরণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইতোপূর্বে উল্লিখিত ফসলাবর্তনের বিবেচ্য বিষয় ও নীতিমালার ভিত্তিতে সেটি তৈরি করা সম্ভব। ধরা যাক, একজন কৃষকের ১০ হেক্টর মাঝারি উঁচু জমির একটি খামার আছে। জমি সেচের আংশিক সুবিধা আছে। এই খামারটির জন্য ফসলাবর্তনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে

ধারণা :

(১) ১০ হেক্টর জমিকে ২.০ হেক্টর করে ৫টি ব্লকে ভাগ করা হলো।
(২) ফসল নির্বাচনে ধান ও ডাল ফসল প্রাধান্য পাবে।
(৩) সেচের আংশিক ব্যবস্থা থাকায় উফশী ডাল ও গমের চাষ সম্ভব।
(৪) মাঝারি উঁচু জমিতে তিনটি করে ফসল চাষ করা হবে।

BANSDOC Library Dhaka

একটি ৪ বছর মেয়াদি ফসলাবর্তনের পরিকল্পনা

বছর	মৌসুম	ব্লক-১	ব্লক-২	ব্লক-৩	ব্লক-৪	ব্লক-৫
	খরিফ-১	ডাল	পাট	আউশ	গ্রীষ্ম ডাল	ডাটা শাক
১	খরিফ-২	রোপা আমন	শসা	ঝিঙা	রোপা আমন	বরবটি
	রবি	পালং শাক	ডাল	গম	ডাল	বোরোধান
	খরিফ-১	ডাল	পশুখাদ্য	পাট	আউশ	ঢেঁড়শ
২	খরিফ-২	বরবটি	রোপা আমন	হেমন্ত ডাল	করলা	রোপা আমন
	রবি	বোরো ধান	ডাল	ডাল	গম	ডাল
	খরিফ-১	ডাল	ডাটা	ভুট্টা	পাট	আউশ ধান
৩	খরিফ-২	রোপা আমন	বরবটি	রোপা আমন	শসা	তরমুজ
	রবি	মশুর	বোরো ধান	পালং শাক	সরিষা	গম
	খরিফ-১	আউশ ধান	ডাল	ডাটা	ডাল	পাট
৪	খরিফ-২	বরবটি	রোপা আমন	বরবটি	রোপা আমন	ডাল
	রবি	গম	ডাল	বোরো ধান	শাক	ডাল

ফসলাবর্তনের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য : সঠিক ডাল ফসলাবর্তনের বিভিন্ন উপকারী দিক রয়েছে। এগুলো একক ও সম্মিলিত প্রভাবে জমির উর্বরতা রক্ষা হয় বা বাড়ে। যেমন-

(১) **নাইট্রোজেন সমৃদ্ধি :** ফসলাবর্তনের মাধ্যমে লেগুমজাতীয় শস্য উৎপাদন করা হলে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়বীয় নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে থাকে।

(২) **উদ্ভিদ পুষ্টির ব্যবহার :** সঠিক ফসলাবর্তন অবলম্বন করা হলে মাটি থেকে উদ্ভিদ পুষ্টির গ্রহণের সামঞ্জস্যতা থাকে বলে মাটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন পুষ্টির তারতম্য সৃষ্টি হয় না।

(৩) **আগাছা ব্যবস্থাপনা :** আগাছা ব্যবস্থাপনার উত্তম উপায় হলো শস্য পর্যায় অবলম্বন। সঠিকভাবে ফসলাবর্তন অবলম্বন করা হলে অনেক আগাছা প্রাকৃতিকভাবেই ধ্বংস হয়ে যায়।

(৪) **রোগ পোকা দমন :** রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়

(৫) **ভূমিক্ষয় রোগ :** উপযুক্ত ফসলাবর্তনে ভূমি ক্ষয় কমে।

(৬) **জৈব পদার্থ ঠিক রাখা :** মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে।

(৭) **লাঙল স্তর ভাঙ্গা :** ফসলাবর্তনের মাধ্যমে অগভীরমূলী ফসলের পর গভীরমূলী ফসল উৎপাদন করা হলে ধানের পর পাট জমিতে শক্ত লাঙল স্তর গঠিত হতে পারে না।

(৮) **শ্রমবিন্যাস :** বিভিন্ন ফসল বিভিন্ন জমি খণ্ডে সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত করা হয় বলে সারা বছর শ্রমিকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(৯) **খামার ব্যবস্থাপনা** : সঠিকভাবে ফসলাবর্তন গ্রহণ করা হলে খামার ব্যবস্থাপনার কাজ সহজ হয়।

(১০) **আয় বৃদ্ধি** : ফসলাবর্তনের মাধ্যমে অর্থকরী ফসল উৎপাদন করলে নগদ অর্থ উপার্জন বেশি হয়।

(১১) **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : সঠিকভাবে ফসলাবর্তন গ্রহণ করা হলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খামারের সমস্ত ফসলহানির ঝুঁকি কমে যায়।

(১২) **ফসলের মান বৃদ্ধি** : ফসলাবর্তনের ফলে ফসলের ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের গুণগতমানও বৃদ্ধি পায়।

(১৩) **পুষ্টি ব্যবস্থাপনা** : পুষ্টি ব্যবস্থাপনা সুষম হয়

বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে পুষ্টি উপাদান দরকার হয়। যেমন- দানাজাতীয় শস্যের জন্য অধিক ফসফরাস, শাক-সবজির জন্য অধিক নাইট্রোজেন এবং আঁশজাতীয় শস্যের জন্য অধিক পটাশ দরকার। ফসলাবর্তনের মাধ্যমে কোনো একটি জমিতে বিভিন্ন ধরনের শস্য উৎপাদন করা হয় বলে মাটিতে বিভিন্ন খাদ্যের সুষম বন্টন সম্ভব হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

ডালভিত্তিক ফসল বিন্যাসের জন্য সার প্রয়োগ

ডাল ফসল চাষ করে অধিকতর ফসল প্রাপ্তির জন্য এবং মাটির উর্বরতা ঠিক রাখার জন্য ফসল বিন্যাস ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে সার প্রয়োগ দরকার। বাংলাদেশে এ বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করা হয়েছে। কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিতে সমন্বিত ফসল পুষ্টি পদ্ধতির সার সুপারিশমালা এখানে উল্লেখ করা হলো। এই সুপারিশমালা সারা দেশে AEZ (Agroecological Zone) ভিত্তিতে ব্যবহারের গাইড লাইন হিসেবে ব্যবহারের জন্য এস এফ এফ পি (SFFP) প্রকল্প (কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ) কর্তৃক পরিমার্জন করা হয়েছে।

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য :

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

pH : ৪.৫-৫.৫ (অম্ল)

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	ডাল (মশুর, ছোলা)	১.২ ± ০.১	১২	১৫	১৫	৮	-	০.৫	১	-
খরিফ-১	বোঃ অ উশ স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	৩০	৬	২০	২	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	মশুর/ ছোলা	১.২ ± ০.১	১২	১৫	১৫	৮	-	০.৫	১	-
খরিফ-১	পাট (তোষা)	৩.০ ± ০.৩	৬০	৮	৪০	৫	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	শীতকালীন সবজি	৩০. ± ০৩	১০০	৩০	৭৫	২০	১০	২	-	১
খরিফ-১	গ্রীষ্মকালীন ডাল	১.০ ± ০.১	২০	১০	১২	৪	-	-	০.৫	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	গম	৩.৫ ± ০.৪	৯০	২০	৪৫	১৫	-	১.৫	০.৫	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোপা আমন	৩.৫ ± ০.৪	৫০	১০	৩৫	৪	-	-	-	-

রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৫০	১২	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোপা আমন	৩.৫ ± ০.৪	৫০	১০	৩৫	৪	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোনাআউশ (স্থাঃ উঃ)	২.০ ± ০.২	৩০	৮	২০	৪	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪০	৬	২৫	৩	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৪৫	১২	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	১০	৩৫	৪	-	-	-	-
রবি	গম	৩.৫ ± ০.৪	৯০	২০	৪৫	১৫	-	১.৫	০.৫	-
খরিফ-১	সবজি সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	১০	৩৫	৪	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল – ২

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

পিএইচ : ৬.০-৬.৬ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : বেলে দোঁআশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	যব	১.০ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বো আউশ স্থাঃউঃ	২.০ ± ০.২	২৫	৮	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃউঃ	২.৪ ± ০.২	৩৫	৪	২০	২	-	১	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৩০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৭	২০	৩	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

pH : ৫.৪-৬.৫ (মৃদু অম্ল)
মাটির বুনট : দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

শস্য বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টি নির্ভর										
রবি	মাশকলাই	১.০ ± ০.১	১২	১২	৮	৬	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	বো আউশ স্থানীয়	২.০ ± ০.২	২৫	৪	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-		-	-	-
রবি	সবজি ও ফুল কপি	৩.০ ± ৩	১০০	৩০	৫০	১৫	১০	২	১	১
	ডাল	-	১৫	৫	৬	৩	-	-	-	-
খরিফ ১	পতিত	১.০ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২										
রবি	তামাক	২.০ ± ০.২	৪০	২০	৩৫	-	১০	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫০	৬	২৫	৫	১		-	-
খরিফ-২	আখ +	৮০.০ ± ৮	১২০	৪০	৭৫	২০	১৫	২	-	-
...	পেঁয়াজ/রসুন	৮.০ ± ১	৫০	২০	৩০	১৫	-	-	-	-
...	আখ+	৮০.০ ± ৮	১২০	৪০	৭৫	২০	১৫	২	-	-
...	ছোলা	০.৬ ± ০.১	৮	১০	১০	৬	-	-	-	-
রবি	বোরো (উফশী)	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৩০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	৫	২০	৩	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৪

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু
জৈব পদার্থ : নিম্ন
pH : ৫.৪-৫.৭ (মৃদু অম্ল)
মাটির বুনট : এটেল দোআঁশ
পটাশ সমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টি নির্ভর										

রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১২	১২	৬	-	০.৫	১	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	২৫	৩	২০	২	-	-	-	
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-		-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১২	১২	৬	-	০.৫	১	-
খরিফ-১	পাট (দেশি)	২.০ ± ০.২	৩০	৫	২০	২		-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	সরিষা+মসুর	১.৫ ± ০.১	৭০	২০	৩৫	২০	-	২.০	১	
খরিফ-১	পাট (দেশী)	২.০ ± ০.২	৩০	৩	২০	২		-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	সরিষা+মসুর	১.৫ ± ০.১	৭০	২০	৩৫	২০	-	২.০	১	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.০ + ০.২	২৫	৩	১৫	২		-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	ছোলা	১.৫ ± ০.১	১৫	১৫	২৫	১২	-	০.৫	১	
খরিফ-১	পাট	২.০ ± ০.২	৩০	৩	২০	২		-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± 0.2	৩৫	৩	২০	২	-	-	-	-
রবি	খেসারি /মাশকলাই	১.০ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	
	বেগুন	১.৫ ± ০.১	১৫	৮	১০	৬		-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উ	২.০ ± ০.২	২৫	৩	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	রো আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৩৫	৩	২০	২	-	২	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫০	৪	২৫	৫		২	-	-
রবি	আলু	২৫.০ ± ৫	১০০	১৫	৫৫	৮	১০	১.৫	১	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৫	৩০	৩		-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১৫	৪০	১০	-	১.০	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৫	৩০	৩	-		-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৫

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৪.৮-৬.০ (অম্ল- মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : এঁটেল

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : উচ্চ

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo

বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বি.আমন (স্থাঃ উঃ)	২.০ ± ০.২	২০	৫	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আমন+বোঃ আমন	২.৫ ± ০.৩	৩০	৭	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৭

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : অতি নিম্ন

pH : ৭.৫-৭.৯ (মৃদু ক্ষার)

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টি নির্ভর										
রবি	চিনা/	১.৩ ± ০.১	৪৫	১৫	১৫	৪	-	-	-	-
	ডাল	১.২ ± ০.১	১৫	১৫	১০	৫	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ	২.৫±০.৩	৩৫	৭	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	বোঃ আমন	-	-	৭	-	-		-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ+বোঃ আমন	২.৫ ± ০.৩	৩৫	১০	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৮

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : অতি নিম্ন১

pH : ৭.৫-৭.৯ (মৃদু ক্ষার)

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টি নির্ভর										
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৩৫	১২	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	২.৮ ± ০.৩	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ		৩০	৮	২০	২	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫±০.৪	৫০	১০	২৫	৪	-	-	-	-
রবি	গম	৩.৫ ± ০.৪	৮৫	২০	৩৫	১২	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	৩.০ ± ০.৩	৩০	৮	২০	২	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ±০.৪	৫০	১০	২৫	৪	-	-	-	-
রবি	আখ+	৮০.০±৮	১২০	৪০	৭০	২৫	-	২	-	-
	ডাল	০.৬±০.১	৭	৭	৫	-	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১২	১৫	১০	৮	-	-	-	-
	সরিষা	১.২ ± ০.১	৬০	১৫	২০	১৫	-	০.৫	-	-
খরিফ-১	পাট (তোষা)	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৭	২৫	৫	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃউঃ	২.৪±০.২	৪০	৬	১৫	২	-	-	-	-
রবি	সরিষা	১.২ ± ০.১	৬০	১৫	২০	১৫	-	০.৫	-	-
	ডাল	১.২ ± ০.১	১২	১৫	১০	৮	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থঃ উঃ	২.০ ± ০.২	৩৫	৪	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃউঃ	২.৪±০.২	৪০	৫	১৫	২	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১২	১৫	১০	৮	-	-	-	-
	সরিষা	১.২ ± ০.১	৬০	১৫	২০	১৫	-	০.৫	-	-
খরিফ-১	কাউন	২.০ ± ০.২	৬০	১২	২০	৪	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃউঃ	২.৪ ± ০.২	৪০	৬	১৫	২	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১২	১৫	১০	৮	-	-	-	-
	সরিষা	১.২ ± ০.১	৬০	১৫	২০	১৫	-	০.৫	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ +	২.৫ ± ০.৩	৩৫	৪	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	মাশকলাই	১.৫ ± ০.২	১৫	১০	১০	৮	-	-	-	-
	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১৫	৩৫	৬	-	১	-	-
খরিফ-১	বো: আউশ স্থাঃউঃ	৩.৫±০.৪	৫০	৬	২০	৩	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	গম	৩.৫ ± ০.৪	৮৫	২০	৩৫	১৫	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রো: আউশ স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৩০	৬	২০	৩	-	-	-	-
	রো: আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	৮	২৫	৪	-	-	-	-
রবি	খেসারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	পাট দেশী	২.০ ± ০.২	৩৫	৮	১০	২	-	-	-	-
খরিফ-২	বো: আমন	২.০ ± ০.২	২০	-	-	-	-	-	-	-
রবি	খেসারি + সরিষা	১.৫ ± ০.২	৬০	১৫	১০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	পতিত	-	-	-	-	-	-	১	-	-
খরিফ-২	বো: আমন	২.০ ± ০.২	২০	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু
জৈব পদার্থ : নিম্ন
pH : ৫.১-৫.৬ (অম্ল)
মাটির বুনট : পলি দোআঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১০	১০	৬	-	-	-	-
খরিফ-১	পাট (দেশি)	২.০ ± ০.২	৩০	৪	২০	৩	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১০	১০	৬	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	৩০	৪	১৫	২	-	-	-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৫	৫৫	৪	৩০	৪	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত		-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১৫	৪০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	২.৮ ± ০.৩	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ		৩০	৮	২৫	২	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪০	৮	৩০	৪	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১০	১০	৬	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৩৫	৪	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৩৫	৪	১৫	২		০.৫	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫০	৫	১৫	৩	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১৫	৪০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	৩.৫ ± ০.৪	৪০	৮	৩০	৪	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	২৫	৮	২৫	৩	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	আউশ+আমন(স্থাঃ)	২.৫ ± ০.৩	২৫	৫	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১০

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু
জৈব পদার্থ : নিম্ন
pH : ৬.৫-৭.৫ (মৃদু অম্ল - মৃদু ক্ষার)

মাটির বুনট : দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	ছোলা	১.২ ± ০.১	১৫	১৫	১০	৬	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ ধান	২.০ ± ০.২	৩৫	৪	১৫	-	-	-	-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬০	৫	৩০	৫	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত		-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	মাষকলাই	১.০ ± ০.১	১৫	১০	৮	৬	-	-	-	-
	গম	২.০ ± ০.২	৬০	৮	২৫	৫	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ ধান	২.০ ± ০.২	৩৫	৪	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	মসুর	১.০ ± ০.১	১৫	১৫	১০	৬	-	-	-	-
খরিফ-১	বোনা আউশ	২.০ ± ০.২	৩৫	৪	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-		-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

pH : ৬.৫-৭.৫ (মৃদু অম্ল - মৃদু ক্ষার)

মাটির বুনট : দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	তিল/মসুর	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ/	২.০ ± ০.২	৩৫	৫	১৫	-	-	-	-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬০	৭	২০	৪		-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	তিল	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	মরিচ-মসুর	১.৫ + ০.২	৭০	২০	২০	১৫	-	-	-	-
	বোঃ আউশ/	২.০ ± ০.২	৩৫	৫	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-			-	-	-	-	-

রবি	ছোলা	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	-	০.৫	-
	সরিষা + মশুর	১.৫ ± ০.২	৭০	২০	২০	১৫	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ/	২.০ ± ০.২	৩৫	৫	১৫	-	-		-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬৫	৭	২৫	৪	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-			-	-	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	-	-	-
খরিফ-১	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪৫	৪	১৫	২	-	১.০	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৫	২০	৩	-	১.০	-	-
রবি	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬৫	১২	৩০	১০	-	২	-	-
	বোঃ আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	৩৫	৫	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	মাশকলাই	১.২ ± ০.১	১৫	১০	১০	৬	-	-	-	-
	মুগকলাই	১.০ ± ০.১	২০	১০	১০	৬	-	-	-	-
রবি	আখ +	৮০.০ ± ৮	১৩০	৩৫	৬০	২০	-	৩	-	-
	ডাল	০.৫ ± ০.১	৫	৫	-	-	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	আউশ–আমন স্থঃ	১.৫ ± ০.৩	৩৫	৮	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	ছোলা/	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	-	০.৫	-
	খেশারি	১.২ ± ০.১	১০	১০	১৫	১০	-	-		-
খরিফ-১	বোঃ আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	৩৫	৫	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৫ ± ০.৩	৪৫	৪	১৫	২	১	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৫	২০	৩	১.৫		-	-
রবি	ছোলা/	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	-	০.৫	-
	খেশারি	১.২ ± ০.১	১০	১০	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-১	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬৫	৭	২০	৪	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থঃ উঃ	২.৪ + ০.২	৪৫	৪	১৫	২	১	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৫	২০	৩	১.৫		-	-
রবি	সরিষা/	১.২ ± ০.১	৭০	১৫	১৭	১৩	-	১	০.৫	-
	ছোলা	১.২ ± ০.১	১২	১২	১৫	১০	-	২	০.৫	-
খরিফ-১	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬৫	৭	২০	৭	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	ছোলা+সরিষা	১.৫ ± ০.২	৭০	২০	২০	১৫	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৬৫	৭	২০	৪	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থঃউঃ	২.৪ ± ০.২	৪	৪	১৫	২	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৩৫	১০		১.৫	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-		-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ±০.৪	৫০	৬	২০	৪	-		-	-

রবি	গম	৩.৫ ± ০.৪	৯০	২০	৩৫	১০	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	৬	২০	৪	-	-	-	-
রবি	খেশারি +	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	আউশ+ আমন	২.৫ ± ০.৩	২০	৫	৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	খেশারি + সরিসা	১.৫ ± ০.২	৩৫	১৫	১০	৫	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আমন স্থাঃ	২.০ ± ০.২	২০	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১২

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৬.২-৭.৭ (মৃদু অম্ল - মৃদু ক্ষার)

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১৫	৮	৬	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	৩০	৪	১০	-	-	-	-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৩৫	৫	১৫	৩	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃউঃ	২.৪ ± ০.২	৩৫	৪	১০	২	-	-	-	-
রবি	মশুর+সরিষা	১.৫ ± ০.২	৬০	১৫	১৫	১৫	-	১	-	-
খরিফ-১	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৩৫	৫	১৫	৩	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	ডালঃ ছোলা খেশারি	১.২ ± ০.১	১০	১৫	৮	৬	-	১.০	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	৩০	৪	১০	-	-	-	-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৩৫	৫	১৫	৩	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃউঃ	২.৫ ± ০.৩	৩৫	৪	১০	২	-	-	-	-
রবি	ছোলা	১.২ ± ০.১	৩৫	১২	৬	৬	-	১.০	-	-
খরিফ-১	তিশি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
	আউশ আমন স্থাঃ	৩.০ ± ০.৩	৩০	৪	১০	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

রবি	মশুর+সরিষা	১.৫ ± ০.২	৬০	১৫	১৫	১৫	-	১	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ	১.২ ± ০.১	৩০	৪	১০	-	-	-	-	-
	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৩৫	৫	১৫	৩	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	৯০	২০	২৫	১০	-	১.৫	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫±০.৪	৪০	৬	১৬	৪	-	-	-	-
রবি	গম	৩.৫ ± ০.৪	৭৫	২০	২৫	১০	-	২	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫±০.৪	৪০	৬	১৬	৪	-	-	-	-
রবি	আলু	২.৫ ± ০.২	৯০	২০	৩০	১০	-	-	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ + ০.৪	৪০	৬	১৬	৪	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১০	৫	৫	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ + আমন	১.৫ ± ০.৩	৩০	৪	১০	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১০	১০	৫	৫	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আমন	২.০ ± ০.২	২০	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৩

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৬.৫-৭.০ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : মধ্যম

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	মুগ ডাল	১.০ ± ০.১	১২	১২	৮	৬	-	১	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	২৫	২৫	৩	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৩০	৩০	৩	২	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	২.৮ ± ০.৩	৩৫	৩৫	৪	২	-	-	-	-
রবি	মুগ ডাল	১.০ ± ০.১	১২	৮	৮	৬		১.৫	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৩০	৩	২০	২	-	২	-	-
	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৮	৩৫	৩	২০	২	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	২.৪ ± ০.২	৩০	৪	২০	২	-	-	-	-

রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	০.৫	-
	বোঃ আউশ স্থঃ	২.৪ ± ০.২	৩০	৬	১৫	৩	-	১		
খরিফ-১	রোঃ আমন স্থঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৩০	৩	২০	২	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৩৫	৪	২৫	২	১	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১		-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	২৫	৩	১২	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৩ + ০.৩	৩০	৩	২০	৪	-	১	-	-
রবি	সরিষা স্থাঃ উঃ	১.০ ± ০.১	৪৫	১৫	২০	১৬	-	১.৫	-	-
	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	৬৫	৮	৩০	৫	-	-	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৩০	৫	২০	৫	-	-	-	-
রবি	পেঁয়াজ	১.৫ ± ০.২	৬৫	৩৫	৫০	২০	-	১	-	-
	তরমুজ	৩.৫ ± ০.৪	৬৫	২০	৪০	১৫	-	১	-	-
	মুগকলাই	১.৫ ± ০.১	১২	৮	১০	৩	-	১	-	-
	টোমেটর	১.৫ ± ০.১	১০	১৫	১৫	১০	-	১	-	-
	মরিচ	২.০ ± ০.২	৬৫	৪০	৫০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	পতিত/ আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	২৫	৩	১২	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	২.৪ ± ০.২	৩৫	৪	২০	২	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৪

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য :

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৫.৪ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : এঁটেল

পটাশ সমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : উচ্চ

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.০ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	আউশ +আমন স্থাঃ	২.৫ ± ০.২	২০	৮	১০	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.২	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আমন	২.০ ± ০.২	২০	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৫

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৫.৪ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : এঁটেল

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : উচ্চ

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.০ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	
খরিফ-১	আউশ +আমন স্থাঃ	২.৫ ± ০.৩	২০	৫	২০	২	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৬

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারি উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৫.৪ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : এটেল

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : উচ্চ

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.০ ± ০.১		-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	২০	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৭

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৫.০-৬.০ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : পলি দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	সবজি	০.৩ ± ৩	১০০	২৫	৬০	১৫	-	-	১	-
খরিফ-১	পাট (দেশী)	২.০ ± ০.২	৩০	৩	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	মাশকলাই	১.০ ± ০.১	১৫	৪	১০	৩	-	-	-	-
রবি	সবজি	৩.০ ± ০.৩	১০০	২৫	৬০	১৫	-	১	-	-
খরিফ-১	মসুর	১.২ ± ০.১	১২	১০	১২	৫	-	-	-	-
খরিফ-২	সরিষা	১.২ ± ০.১	৬৫	১২	২০	১২	-	-	-	-
	বোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	৩০	৩	১৫	২	-	-	-	-
	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৫.০-৬.০ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : পলি দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.২	-	-	-	-	-	১	-	-
খরিফ-১	বোঃ অউশ	২.০ ± ০.২	৩০	৮	১৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪০	৪	২০	২	-	-	-	-
রবি	মটর/	১.৫ ± ০.২	১৫	২০	২৫	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	মসুর	১.০ ± ০.১	১০	১০	১০	৫	-	১	-	-
খরিফ-২	বোঃ আউশ	২.০ ± ০.২	৩০	৪	১৫	-	-	-	-	-
	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪০	৪	২০	২	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	৯৫	২০	৪০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৭	২৫	৪	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.০ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ	৩.৫ ± ০.৪	৬৫	১৫	২৫	৬	-	১	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৪৫	৫	২০	২	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৯

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু
জৈব পদার্থ : মধ্যম
pH : ৫.০-৬.০ (মৃদু অম্ল)
মাটির বুনট : পলি দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.১	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	আউশ+ আমন স্থাঃ	২.৫ ± ০.৩	৩০	১০	২০	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.২	-	-	-	-	-	১	-	-
খরিফ-১	রোঃ আমন উফশী	২.৮ ± ০.৩	৫০	১২	২৫	৬	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪০	৮	২০	২	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫০	৬	২৫	৩	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	৯৫	২০	৪০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৭	২৫	৪	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২০

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারী উঁচু
জৈব পদার্থ : মধ্যম
pH : ৪.৭-৬.৯ (মৃদু অম্ল)
মাটির বুনট : পলি দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	৯৫	২০	৪০	১০	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৭	২৫	৪	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২১

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : মাঝারী উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৪.৭-৬.৯ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : পলি দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.২	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ	২.০ ± ০.২	১৫	৬	১০	-	-	-	-	-
খরিফ-২		-		-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২২

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : মধ্যম

pH : ৪.৫-৫.৮ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশ সমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	১২	৩৫	৮	-	১	-	-
খরিফ-২	মাশকলাই	১.০ ± ০.১	১৫	৫	১৫	৩	-	-	-	-
রবি	মাশকলাই	১.০ ± ০.১	১৫	১০	১৫	৬	-	-	-	-
খরিফ-১	রোঃ আউশ উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৬	৩০	৪	-	১	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	সরিষা স্থাঃ উঃ		৪৫	২০	৩৫	২০	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১৫	৬০	৮	-	-	-	-
খরিফ-২	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৪৫	৮	৪৫	৪	-	-	-	-
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.২	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ	২.০ ± ০.২	১০	৫	১৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-		-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৩

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার	: উঁচু
জৈব পদার্থ	: নিম্ন
pH	: ৫.৬ অম্ল
মাটির বুনট	: পলি দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ	: নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	২০	৫০	৮	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	৭	৩৫	২	-	-	-	-
রবি	মটর/	১.৫ ± ০.১	২৫	২০	২৫	১০	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৬	২৫	২	-	২	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৬	২৫	২	-		-	-
রবি	গোঃ মটর	১.৫ ± ০.১	২৫	২০	২৫	১০	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৬	২৫	২	-	-	-	-
রবি	গো-মটর	১.৫ ± ০.১	১৫	২০	২৫	১০	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	বোঃ আউশ উফশী	২.০ ± ০.২	৩৫	৪	১০	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৪০	৪	২৫	২	-	-	-	-
রবি	সরিষা স্থাঃ উঃ	১.০ ± ০.১	৭০	২০	২৫	১৫	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১০	৪০	৫	-	-	-	-
খরিফ-২	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	৮	৩৫	২	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৪

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার	: মাঝারি উঁচু
জৈব পদার্থ	: মধ্যম
pH	: ৪.৫-৫.৮ (অম্ল)
মাটির বুনট	: পলি দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ	: নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	খেশারি	১.২ ± ০.২	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	বোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	৩০	৮	২০	২	-	-	-	-
খরিফ-২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৫

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

pH : ৫.০-৫.৭ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টি নির্ভর										
রবি	আখ+	৮০.০±৮	১৪০	৪০	১৩০	৩০	২০	৪	-	-
	ছোলা	০.৬± ০.১	১০	১০	২০	১০	-	-	০.৫	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১১০	২৫	৬৫	১৫	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫৫	১২	৪০	৫	-	-	-	-
রবি	সরিষা স্থাঃ উঃ	১.০ ± ০.১	৭০	২০	৩৫	২০	১০	১	১.৫	-
খরিফ-১	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১০০	১৫	৬০	৮	-	-	-	-
খরিফ-২	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	২.৮ ± ০.৩	৩০	৮	৪০	৩	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৬

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

pH : ৪.৮-৫.৯ অম্ল

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশ সমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	সরিষা/	১.০ ± ০.১	৭০	২০	৩৫	২০	১০	১	০.৫	-
	ছোলা+মসুর	১.৫ ± ০.২	২০	২০	৪০	১৫	-	১	০.৫	-
	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪৫	৭	৩৫	২	-	-	-	-
রবি	ছোলা/	২.৫ ± ০.৩	৬০	২০	৫০	১০	-	-	-	-
	বালি	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ছোলা+সরিষা	১.৫ ± ০.২	৮০	২০	৪০	২০	-	১	০.৫	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ছোলা মসুর	১.৫ ± ০.২	২০	২০	৪০	১৫	-	১	০.৫	-
	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৬৫	৮	৪০	৫	-	-	-	-
রবি	ছোলা	১.২ ± ০.১	২০	২০	৪০	১৫	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪৫	৭	৩৫	২	-	১	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৬৫	৮	৪০	৫	-	১	-	-
রবি	ছোলা	১.০ ± ০.১	২০	২০	৪০	১৫	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.০ ± ০.৩	৪৫	৮	৪০	৫	-	১	-	
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১১০	২৫	৬৫	১৫	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৩০	৮	৪০	৩	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫৫	১২	৪০	৫	-	-	-	-
রবি	গম	৪.৫ ± ০.৫	৯০	২৫	৬০	১৫	-	১.৫	০.৫	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৩০	৮	৪০	৫	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫৫	১২	৪০	৩	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৭

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার	:	উঁচু
জৈব পদার্থ	:	নিম্ন
pH	:	৪.৮-৫.৬ (মৃদু অম্ল)
মাটির বুনট	:	দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ	:	নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	মাশকলাই/	১.০ ± ০.১	১৮	১৫	১৫	১০	-	-	-	-
খরিফ-১	সরিষা	১.০ ± ০.১	৭০	২০	৫০	২০	-	০.৫	-	-
	বোঃ আউশ স্থাঃ উঃ	২.০ ± ০.২	৩৫	৭	২৫	২	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১১০	২৫	৬০	১২	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৭৫	১২	৪০	৫	-		-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৮

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার : উঁচু

জৈব পদার্থ : নিম্ন

pH : ৪.৮-৫.৫ (মৃদু অম্ল)

মাটির বুনট : বেলে দো-আঁশ

পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ : নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	ডাল	১.২ ± ০.১	১৫	২০	১৫	১০	-	-	০.৫	-
খরিফ-১	পাট তোষা	৩.০ ± ০.৩	৫৫	৭	৫০	৬	-	-	-	-
খরিফ-২	পতিত	-	-	-	-	-	-	-	-	-
রবি	আখ+	৮০.০±৮	১২০	৪০	১০০	৩০	.১০	২	-	-
	ছোলা	০.৬± ০.১	৮	৩	৮	-	-	-	০.৫	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১১০	২৫	৬০	১৫	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-		-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৫০	৮	৪০	৩	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৭০	১০	৪০	৫	-	-	-	-
রবি	গম	৩.৫ ± ০.৩	৯০	২৫	৫৫	১৫	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৩০	৮	৪০	৩	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	১২	৪০	৫	-	-	-	-

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৯

ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য

ভূমি প্রকার	:	উঁচু
জৈব পদার্থ	:	নিম্ন
pH	:	৪.৫-৪.৯ অম্ল
মাটির বুনট	:	বেলে দো-আঁশ
পটাশসমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ	:	নিম্ন

ফসল বিন্যাস		ফলন মাত্রা (টন/হেক্টর)	সুপারিশকৃত মাত্রা (কেজি/হেক্টর)							
মৌসুম	ফসল		N	P	K	S	Mg	Zn	B	Mo
বৃষ্টিনির্ভর										
রবি	গো-মটর	১.৫ ± ০.১	২০	২০	২৫	১৫	-	১	০.৫	-
খরিফ-১	গ্রীষ্ম আউশ স্থাঃ	২.০ ± ০.২	৩৫	৭	২৫	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৪ ± ০.২	৪০	৬	৩০	২	-	-	-	-
রবি	বোরো উফশী	৪.৫ ± ০.৫	১১০	২৫	৬০	-	-	১	-	-
খরিফ-১	সবুজ সার	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খরিফ-২	রোঃ আমন স্থাঃ উঃ	২.৮ ± ০.৩	৩০	৮	৪০	৩	-	-	-	-
	রোঃ আমন উফশী	৩.৫ ± ০.৪	৫০	১০	৪০	৪	-	-	-	-

সারের পরিমাণ নির্ণয়ের রূপান্তর ছক

(উপাদান-সারের পরিমাণ)

ইউরিয়া		তিএমপি			এমপি		জিপসাম		জিপসাম		জিঙ্ক সালফেট		
৪৬% নাইট্রোজেন		২০% ফসফরাস এবং ১৮% নাইট্রোজেন			২০% ফসফরাস		৫০% পটাসিয়াম		১৮% সালফার		৩৬% জিঙ্ক এবং ১৮% সালফার		
এন	ইউ	পি	এন	ডিএমপি	পি	টিএমপি	কে	এমপি	এস	জিপসাম	জিঙ্ক	এস	জিঙ্ক সালফেট
১০	২২	৫	৫	২৫	৫	২৫	৫	১০	২	১১	০.৫	০.৩	১.৪
২০	৪৩	১৫	১৪	৭৬	১৫	৭৬	১০	২০	৪	২২	১	০.৬	২.৮
৩০	৬৫	২০	১৮	১০২	২০	১০২	১৫	৩০	৬	৩৩	১.৫	০.৮	৪.১
৪০	৮৭	২৫	২৩	১২৭	২৫	১২৭	২০	৪০	৮	৪৪	২	১.১	৫.৫
৫০	১০৯	৩০	২৮	১৫২	৩০	১৫২	২৫	৫০	১০	৫৬	২.৫	১.৪	৬.৯
৬০	১৩০	৩৫	৩২	১৭৮	৩৫	১৭৮	৩০	৬০	১২	৬৭	৩	১.৭	৮.৩
৭০	১৫২	৪০	৩৭	২০৩	৪০	২০৩	৩৫	৭০	১৪	৭৮	৩.৫	১.৯	৯.৬
৮০	১৭৪	৪৫	৪২	২২৯	৪৫	২২৯	৪০	৮০	১৬	৮৯	৪	২.২	১১.০
৯০	১৯৫	৫০	৪৬	২৫৪	৫০	২৫৪	৪৫	৯০	১৮	১০০	৪.৫	২.৫	১২.৪

১০০	২১৭	৬০	৫৫	৩০৫	৬০	৩০৫	৫০	১০০	২০	১১১	৫	২.৮	১৩.৮
১১০	২৩৯	৭০	৬৫	৩৫৬	৭০	৩৫৬	৫৫	১১০	২২	১২২	৫.৫	৩.০	১৫.১
১২০	২৬০	৮০	৭৪	৪০৬	৮০	৪০৬	৬০	১২০	২৪	১৩৩	৬	৩.৩	১৬.৫
১৩০	২৮২	৯০	৮৩	৪৫৭	৯০	৪৫৭	৬৫	১৩০	২৬	১৪৫	৬.৫	৩.৬	১৭.৯
১৪০	৩০৪	১০০	৯২	৫০৮	১০০	৫০৮	৭০	১৪০	২৮	১৫৬	৭	৩.৯	১৯.৩

রূপান্তর প্রণালী

N × ২.১৭ = ইউরিয়া

K × ২ = এমপি

Zn × ২.৭৮ = জিঙ্ক সালফেট

P × ৫.০৮ = টিএসপি/পিএপি

S × ৫.৫৬= জিপসাম

B × ৫.৮৮ = বরিক এসিড

প্রদর্শনী প্লটে সারের মাত্রা নির্ণয়

৪০০ বর্গ মিটার প্লটের জন্য : হেক্টর প্রতি সারের মাত্রাকে ২৫ দিয়ে ভাগ করতে হয়।

২০০ মিটার প্লটের জন্য : হেক্টর প্রতি সারের মাত্রাকে ৫০ দিয়ে ভাগ করতে হয়।

উদাহরণ

৬০ কেজি এন (নাইট্রোজেন) = ১৩০ কেজি ইউরিয়া।

১৩০÷ ২৫ = ৫.২ কেজি ইউরিয়া ৪০০ বর্গমিটার প্লটের জন্য।

১৩০÷৫০-২.৬ কেজি ইউরিয়া ২০০ বর্গমিটার প্লটের জন্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পশুখাদ্য হিসেবে ডাল ও মিশ্র ঘাস ফসলের চাষ

ডালের প্রায় সকল প্রজাতির ফসলই পুষ্টিকর পশুখাদ্য হিসেবে পরিচিত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, ডাল খাদ্য ফসলসমূহের কেবল ডাল অংশই মানুষ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে, বাকি সম্পূর্ণ অংশই পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনেক কৃষিজীবীই ডাল ফসল চাষের জমিতে বিভিন্ন ধরনের ঘাসজাতীয় ফসল যেগুলোর অনেক গুলোই সাধারণভাবে আগাছা হিসেবে পরিচিত। ডাল চাষকৃত জমিতে ডাল ফসলও যেমন জন্মায় তেমনি পশু খাদ্যের একটি বড় উৎসও সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়াটি প্রধানত ডাল ফসলের সাথেই ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রধানত এ ধরনের ডাল ফসল চাষের আলোচনায় পশু খাদ্য চাষের বিতরণ ব্যাপক ও গুরুত্ববহ।

১. গৃহপালিত পশুখাদ্যের গুরুত্ব

পশুখাদ্য ফসলের গুরুত্ব বুঝতে হলে প্রথমে গৃহপালিত পশুর গুরুত্বকে বুঝতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গবাদিপশু এবং খাদ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

১. **কৃষিকাজের শক্তি :** এ দেশের কৃষিকাজ গরু ও মহিষের শক্তির উপর নির্ভরশীল। বীজ বপনের জন্য জমিতে চাষ ও মই দেওয়া, ফসল মাড়াই ও পরিবহনে পশু শক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এ দেশের কৃষকের দরিদ্রতা জমির খণ্ডতা এবং সমবায়ভিত্তিক চাষের অভাবে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ফলে পশুশক্তির বিকল্প কোনো পথ নেই।

২. **আমিষের উৎস :** উৎকৃষ্ট তথা অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অসিডসমৃদ্ধ প্রাণিজ আমিষের উৎসের মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষের মাংস ও দুধ অন্যতম। এদেশে বছরে ২৫০-৩০০ হাজার টন মাংস এবং ৬০০-৭০০ হাজার টন দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে।

৩. **উপদ্রব্য :** বিভিন্ন প্রকার প্রাণী থেকে প্রাপ্ত উপদ্রব্য (by. product) যেমন- হাড়, মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদিতে N. P. K আছে এবং জৈব সার হিসেবে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করছে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রা :** যেসব প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তার মধ্যে চামড়া অন্যতম। এ দেশে প্রতি বছর প্রায় ১২ হাজার পশুর চামড়া পাওয়া যায়।

৫. **লোম শিল্প :** ভেড়ার পশম ও অন্যান্য গবাদি পশুর লেজের লোম নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

৬. **চর্বি শিল্প :** প্রাণিজ চর্বি সাবান, মোম, প্রসাধনীসহ বিভিন্ন প্রকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে প্রাণিজ চর্বির বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪ হাজার টন।

প্রাণিজ জৈব সারে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ

জৈব সার	N	P_2O_5	K_2O
গরুর গোবর	০.২০-০.৩০	০.২০-০২০	০.০৮-০.১২
গরুর মূত্র	১.০০-১.২	০.০৫-০.০৭	১.০০-১.৪০
ভেড়া ও ছাগলের মল	০.৭০-০.৮	০.৪০-০.৫০	০.৪০-০.৫০
ভেড়া ও ছাগলের মূত্র	১.৩০-১.৪	০.০৫-০.০৭	২.০০-৩.০০
শুকনো রক্ত	১৮-১০	১.৪০-১.৬	০.৮-১.২
হাড়ের গুঁড়া	১.০০-২.০	২৫-৩০	০.১-০.৭

গবাদির খাদ্য হিসেবে লেগুমজাতীয় বা ডালজাতীয় ফসলের গাছ, দানা ব্যবহার করা হলে গবাদির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে এবং উৎপাদিত পণ্যের মান বৃদ্ধি পায়। খেশারি, মুগ, মাশকলাই, গোমটরসহ স্থানীয় অনেক কলাই ফসলের গাছ ও ভূষি গৃহপালিত পশুর উত্তম খাদ্য। মাঝারি আকারের একটি গরু থেকে বছরে ৫-৬ টন গোবর পাওয়া যেতে পারে।

গোবর দ্বারা ঘুটে তৈরি করে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ৪-৫টি গরু থেকে প্রাপ্ত গোবর হতে প্রতিদিন ২০-২৫ ঘন মিটার গোবর গ্যাস তৈরি করে জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। শুকনো রক্ত এবং নাড়ি-ভুঁড়ি মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত গুরুত্বের মধ্যে কৃষি কাজে শক্তির উৎস হিসেবে গরু-মহিষের ব্যবহারই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। এদেশের গরু মহিষের সাধারণ স্বাস্থ্য অত্যন্ত নিম্নমানের। এ অবস্থায় সেগুলো দ্বারা গভীর বা উত্তমভাবে ভূমিকর্ষণ করা যায় না। সুষম খাদ্যের অভাবই এর কারণ। তাই গরু-মহিষের স্বাস্থ্যকে উন্নত করার জন্য সুষম খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধানে গোখাদ্য ফসল উৎপাদনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে ডাল ফসল পশুখাদ্য হিসেবে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

বাণিজ্যিকভাবে এ দেশে গোখাদ্য উৎপাদনের প্রচুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই প্রত্যেক কৃষকের উচিত নিজের গরু-মহিষের সরবরাহের জন্য ডালজাতীয় গোখাদ্য উৎপাদন করা।

২. পশু খাদ্যের শ্রেণীকরণ

বিভিন্ন প্রকার গবাদি পশুকে খাওয়ানোর জন্য বিশ্বে প্রায় হাজার রকমের খাদ্য ব্যবহৃত হয়। নিচে গবাদি পশুর খাদ্যের শ্রেণিকরণ সম্পর্কে প্রথমে একটি রূপরেখা উল্লেখ করা হলো।

পশু খাদ্য

(১) আঁশযুক্ত (Roughage) খাদ্য

ক. বিভিন্ন প্রকার গো-খাদ্য শস্য (Fodder crops)

খ. সাইলেজ (Silage)

গ. গোচারণ ভূমির ঘাস (Forage grass)

ঘ. বৃক্ষের পাতা

ঙ. মূলজাতীয় ফসল।

(২) রসালো (Succulent) আঁশযুক্ত খাদ্য

(৩) শুকনো আঁশ যুক্ত খাদ্য : দানা বা কনসেনট্রেট (Concentrate) খাদ্য-
ক. খড় (Straw), খ. হে (Hay)
(১) স্বল্প আমিষযুক্ত
(২) মধ্যম আমিষযুক্ত
(৩) অধিক আমিষযুক্ত।

(১) আঁশযুক্ত খাদ্য : এসব খাদ্যে আঁশের (Crude fibre) পরিমাণ ১৮% এর বেশি এবং মোট পাচ্য পুষ্টি উপাদান (Total digestible nutrient/TDN) কম। এগুলো আয়তনিক (bulky) হওয়ায় পাকস্থলী পূর্ণ রাখা এবং মল উৎপাদনে সহায়তা করে। রসালো কাঁচা ও সবুজ অবস্থায় এসব খাদ্য ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রকার গোখাদ্য-শস্য : বিভিন্ন প্রকার শস্য চাষ করে এগুলোর বিটপ (shoot) সবুজ অবস্থায় পশুকে খাওয়ানো হয়। এ শস্য লেগুমও হতে পারে :

কয়েকটি গো-খাদ্য ফসলের পরিচিতি

বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
খেশারি	Grass pea	*Lathyrus sativus*
মাশকলাই	Black gram	*Phaseolus mungo*
গোমটর	Cowpea	*Vigna sinensis*
বারশিম	Barseem	*Trifolium alexandrium*
লুসার্ন	Luwm	*Medicago sativa*
শনপাট	Sunhemp	*Crotalaria juncea*
ধৈঞ্চা	Dhaincha	*Sesbania aculeata*
ভুট্টা	Maize	*Zea mays*
জোয়ার	Sorghum	*Sorghum vulgare*
বাজরা	Bajra	*Pennisetum typhoides*
গিনি ঘাস	Guinea grass	*Pancium maximum*
নেপিয়ার ঘাস	Napier grass	*Pennisetum purpureum*
প্যারা ঘাস	Para grass	*Brachiaria mutica*
যই	Oat	*Avena sativa*
যব	Barley	*Hordeum vulgare*

এ তালিকায় ডালজাতীয় গোখাদ্যের সাথে ফসল বিন্যাস বা ফসলাবর্তনে চাষযোগ্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘাসের পরিচিতিও উল্লেখ করা হলো।

ফসলসমূহের মধ্যে লেগুম ফসলসমূহের বিটপে আমিষের পরিমাণ বেশি। বাংলাদেশে কৃষকেরা শনপাট, মাশকলাই, খেশারি ও ভুট্টা চাষ করে। এছাড়া সরকারি উদ্যোগে নেপিয়ার, গিনি, প্যারা চাষ হতে দেখা যায়।

সাইলেজ : রসালো আঁশযুক্ত খাদ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফসল চাষ করে তাজা ঘাস সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বছরের সবসময়ই তাজা ঘাস সরবরাহ পাওয়া যাবে তার কোনো

নিশ্চয়তা নেই। এ কারণে গো-খাদ্য ফসল চাষ করে সবুজ অবস্থায় কেটে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রসালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে সংরক্ষিত খাদ্যকে সাইলেজ বলে।

গোচারণ ভূমির ঘাস : বিশাল এলাকা যেখানে ফসল জন্মায় অথবা প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো ঘাসের মধ্যে গরু-মহিষ ঘুরে ফিরে খেতে পারে তাকে গোচারণ ভূমি বলে। এরূপ মাঠে বর্ষজীবী অথবা বহুবর্ষী প্রকারের ফসল থাকতে পারে। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি প্রায় নেই বললেই চলে।

গাছের পাতা : বিভিন্ন বৃক্ষের পাতা অনেক সময়ে গো-খাদ্য হিসেবে কাঁচা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। ইপিল-ইপিল, রেইনট্রি প্রভৃতির পাতাও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

মূলজাতীয় ফসল : শীতের মৌসুমে যখন কাঁচা ঘাসের অভাব থাকে তখন শালগম, গাজর, বীট, কাসাভা ইত্যাদি চাষ করা যায়

(২) **শুকনো আঁশযুক্ত খাদ্য :** বিভিন্ন প্রকার ফসলের বিটপ শুকিয়ে পরে ব্যবহার করা হয়।

(ক) **খড়/বিচালি :** ডাল ফসল পরিপক্ক হওয়ার পর কেটে রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন- কলাই/ভূষি। গম ও ডালের ভূষিতে আমিষের পরিমাণ বেশি।

(খ) **হে :** গো-খাদ্য ফসলকে চাষ করার পর ফুল উৎপাদনের পূর্বে কেটে শুকিয়ে রাখা খাদ্যকে 'হে' বলে। খড়ের চেয়ে হে-এর পুষ্টিমাণ বেশি। পুষ্টির উপাদানসমূহ ফল উৎপাদনে আত্তীকৃত হওয়ার আগেই গাছ কেটে নেওয়া হয়।

(গ) **দানা বা কনসেনট্রেট** (Concentrate) : এসব খাদ্যে আঁশের পরিমাণ কম এবং মোট পাচ্য উৎপাদান (TDE) বেশি থাকে। আমিষের উপস্থিতির পরিমাণের ভিত্তিতে দানা খাদ্যকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

১. **স্বল্প আমিষযুক্ত :** ডালের মূল ভূষি এতে আমিষের পরিমাণ ৫-১৫%।

২. **মধ্যম আমিষযুক্ত :** যেমন নানা প্রকার বীজের খৈল ডাল—এতে আমিষের পরিমাণ ২০-২৫%।

৩. **অধিক আমিষযুক্ত :** যেমন বীজসমূহের আটা (Meal) অর্থাৎ ডাল অথবা চীনাবাদামের আটা ইত্যাদি। আমিষের পরিমাণ ২৫-৩০%।

৪. **অত্যধিক আমিষযুক্ত :** ডালের গুড়া, আমিষ ৩০-৪০%।

(৩) **গো-খাদ্য ফসলের চাষ :** গো-খাদ্য ফসলের চাষের সাধারণ নিয়ম এই যে, বীজ কিছুটা ঘন করে বপন করতে হয় এবং যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও নরম আছে এরূপ অবস্থায় কেটে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে গাছের বিটপের বৃদ্ধির জন্য কিছুটা অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সারও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডাল ফসল, তেল ফসল ও সবুজ সার ফসলের অংশে পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন ফসলের চাষাবাদ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে অন্যান্য ফসলের চাষ বর্ণনা করা হলো।

লেগ্যুম ও অলেগ্যুম সকল খাদ্য ফসলই ফসল বিন্যাস পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করে চাষাবাদ করতে হয়। কারণ এসব ফসল এককভাবে চাষ করার সুযোগ বাংলাদেশে এখনো অনেক কম। তাই এখানে ঘাসজাতীয় এবং লেগ্যুমজাতীয় বিভিন্ন ফসলের চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

মানুষের প্রাকৃতিক খাদ্য চক্রে দুই প্রকার খাদ্য রয়েছে। যথা-

(ক) সরাসরি খাদ্য

(খ) পরোক্ষ খাদ্য

এখানে সরাসরি ও পরোক্ষ খাদ্যের একটি চক্রায়ন উল্লেখ করা হলো।

৪. **নেপিয়ার প্রজাতির ঘাস** *(Pennisetum spp)* :

নেপিয়ার ঘাসের দুটি প্রধান প্রজাতি হচ্ছে *P. clanuclestimum* এবং *P.purpureum* স্থায়ী ঘাসের মধ্যে নেপিয়ার ঘাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি উন্নত জাতের অধিক ফলনশীল সবুজ ঘাস। এর পাতা এবং কাণ্ড দেখতে অনেকটা আখ গাছের মতো। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় নেপিয়ার ঘাস ভাল জন্মায়। কচি অবস্থায় এতে খাদ্যমান বেশি থাকে এবং গবাদির জন্য পুষ্টিকর।

চাষ পদ্ধতি : প্রায় সব রকম মাটিতে এ ঘাস রোপণ করা যায়, তবে বেলে দোআঁশ মাটি বেশি উপযোগী। এ ঘাস চাষাবাদের জন্য উঁচু জমি ভাল। ডোবা জলাভূমিতে কিংবা প্লাবিত অঞ্চলে এ ঘাস ভাল জন্মে না।

জমি চাষ : জমিতে ৪-৫টি চাষ এবং মই দিয়ে আগাছা মুক্ত করার পর রোপণ করতে হয়। কাণ্ড অথবা শিকড়যুক্ত খণ্ডিত ঘাসের গোড়া চারার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চারা রোপণ সময় : সারা বর্ষা মৌসুমেই এ ঘাস রোপন করা যায়। তবে বর্ষার প্রারম্ভেই রোপণের উৎকৃষ্ট সময়। মে-জুন মাসে প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে রোপণ করা হলে প্রথম বছরেই ৩-৪ বার পর্যন্ত ঘাস কাটা যেতে পারে।

কাটিং রোপণ : কাটিং বা কাণ্ডসহ খণ্ডিত ঘাসের গোড়া সারিবদ্ধভাবে লাগাতে হয়। এক সারি হতে অন্য সারির দূরত্ব ৬০-১০০ সেন্টিমিটার হতে হয়।

এক চারা হতে অন্য চারার বা কাটিং-এর দূরত্ব ৪-৫০ সেন্টিমিটার হবে। চারা লাগানোর সময় মাটি দিয়ে গোড়া শক্ত করে লাগাতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে চারা লাগানোর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। রোপণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১৭-২০ হাজার চারা বা কাটিং হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : এ জাতীয় ঘাস হতে ফলন এবং পুষ্টি পেতে হলে জমিতে নিয়মিত সার প্রয়োগ ও পানি সেচের প্রয়োজন। তবে বাংলাদেশে বর্ষার সময় ৫-৭ মাস পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। ভাল ফলনের জন্য বিভিন্ন প্রকার সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে জমি তৈরির সময় গোবর সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে ফলন ভাল হয়ে থাকে।

নেপিয়ার ঘাসে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২৫০ কেজি
টিএসপি	১৮০ কেজি
এমপি	১০০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	১৫০-৫০০ কেজি

সারের কিস্তি প্রয়োগ

ঘাস দু'বার কাটার পর হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া জমিতে ছিটিয়ে দিলে বেশি ফলন আশা করা যায়। সার ছিটানোর পূর্বে দুই সারির মধ্যে ফাঁকা স্থান লাঙল বা কোদাল দিয়ে আলগা করে দিতে হয়।

ঘাসের পরিচর্যা : প্রতিবার সার দেওয়ার পূর্বে সবসময় সম্ভব না হলেও বছরে দু'বার কোদাল অথবা লাঙল দিয়ে নেপিয়ার ঘাসের সারির মধ্যবর্তী জায়গায় মাটি আলগা করে দিতে হয়। শীতের তীব্রতা ও শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য এদেশে এর ফলন কমে যায়। এ সময় বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গরু-ছাগল চরে ঘাসের নতুন ডগা নষ্ট না করে। সুবিধা থাকলে শুষ্ক মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘাস কাটা : নেপিয়ার ঘাস গবাদিকে কেটে খাওয়ানো সবচেয়ে ভাল। এতে অপচয় কম হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে ফসলের ফলন বাড়ে। জমিতে চারা বা কাটিং লাগানোর পর ৭০-৮০ দিনের মধ্যে গবাদিকে কেটে খাওয়ানো যায়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ৩-৪ সপ্তাহ পর পর গরুকে কেটে খাওয়ানো যায়। ঘাস কাটার সময় ঘাসের গোড়ার সাথে ১০-১৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ কাণ্ড রেখে কাটা ভাল

ফলন : প্রথম বছর এর ফলন কিছুটা কম হয়, কিন্তু পরবর্তী ২-৩ বছর পর্যন্ত ফলন বেড়ে যায়। বছরে এ ঘাস ৮-১০ বার কাটা যায়। প্রতি হেক্টরে ১৫০-১৭০ টন কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করা যায়।

খাওয়ানোর নিয়ম : জমি থেকে কেটে এনে এ ঘাস সরাসরি গবাদিকে খাওয়ানো যেতে পারে। এছাড়া নেপিয়ার ঘাসকে ৫-৮ সেন্টিমিটার পরিমাণ লম্বা করে কেটে খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়।

সংরক্ষণ : নেপিয়ার ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ করা সুবিধাজনক নয়। তবে কাঁচা ঘাস সাইলেজ করে শুষ্ক মৌসুমে সংরক্ষণ করা যায়।

৫. **পারা ঘাস** *(Brachiaria mutica)*

পারা বহুবর্ষী বা স্থায়ী ঘাস। জমিতে একবার রোপণ করলে কয়েক বছর পর্যন্ত বিনা চাষবাসে ফলন দিয়ে থাকে।

উৎপত্তি : এটি একটি বিদেশী ঘাস। পারা ঘাসের উৎপত্তিস্থল ব্রাজিল হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

জমি ও মাটি : পারা ঘাস প্রায় সবরকম জমিতে আবাদ করা যায়। উঁচু, নিচু, ঢালু, জলাবদ্ধ এমনকি লোনা মাটিতেও ভাল জন্মায়। বাংলাদেশের সর্বত্রই এর ফলন বেশ সন্তোষজনক। গাছের নিচে ও স্যাঁতসেঁতে জমিতেও এর ভাল ফলন হয়। পারা ঘাস শীত সহ্য করতে পারে না। তাই শীতকালে এর উৎপাদন কম। জমি তৈরির জন্য ২-৩টি চাষ ও মই দিতে হয়।

ঘাস রোপণ : পারা ঘাস বর্ষার কয়েক মাসই রোপণ করা চলে। এ ঘাস সারি করে অর্থাৎ ৪৫×৪৫ সেন্টিমিটার সারিতে রোপণ করতে হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : এ ঘাস পচা গোবরের সার এবং গোশালা-বিধৌত পচা পানিতে ভাল জন্মায়। রাসায়নিক সারের অভাবে ঘাস কাটার পর পচা গোবর জমিতে ছিটিয়ে দিলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পারা ঘাসের সার সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২২০ কেজি
টিএসপি	১৪০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	২৫০-৫০০ কেজি

ঘাস কাটা : এ ঘাস লতাজাতীয় বলে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। ঘাস কাটার উপযোগী সময়ে ৬০-৯০ সেন্টিমিটার পরিমাণ উঁচু হয়ে জমিতে ছড়িয়ে থাকে। এ ঘাস গরুকে কেটে খাওয়ানো যায়। তবে গরু চরিয়ে খাওয়ানো সবচেয়ে লাভজনক। প্রতি বছর ৩-৪ সপ্তাহ পর পর ৮-১০ বার কাটা যায়। প্রায় ৩-৪ সপ্তাহ পর পর পারা ঘাস ছোট করে কেটে অথবা গরু চরিয়ে খাওয়ানো যায়।

ফলন : এ ঘাসের ফলন বছরে হেক্টর প্রতি ১০০-১২৫ টন।

সংরক্ষণ : এটি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা সুবিধাজনক নয়। বরং সাইলেজ সংরক্ষণ করে শুকনো মৌসুমে খাওয়ানো যায়।

৬. গিনি ঘাস *(Panicum maximum)*

গিনি এক প্রকার গ্রীষ্মকালীন ঘাস। এ ঘাস ভাল যত্ন পেলে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে কিছুটা ভাল ফলন দিয়ে থাকে। এটি দেখতে অনেকটা ধান গাছের মতো। এতে জলীয় ভাগ কম এবং পুষ্টিমান বেশি।

জমি ও মাটি : গিনি ঘাস উঁচু ও ঢালু জমিতে ভাল হয়। স্যাঁতসেঁতে, জলাবদ্ধ এবং নিচু জমিতে গিনি ঘাস জন্মায় না। এ ঘাস ফল বা অন্যান্য গাছের ছায়ায়ও ভাল জন্মায়। ২-৩টি চাষ মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাতে হয়।

বংশবিস্তার : গিনি ঘাস হতে বছরে একবার সামান্য পরিমাণ বীজ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু অনেক অসুবিধার জন্য বীজ বপন না করে ঘাসের গোড়াসহ পুরাতন ঘাসের কাণ্ড চারা হিসেবে রোপণ করা হয়। এক হেক্টর জমি রোপণ করার জন্য প্রায় ২০-২৫ হাজার চারার প্রয়োজন হয়।

রোপণ সময় : গিনি ঘাস বর্ষার মৌসুমে রোপণ করতে হয়, তবে বেশি বৃষ্টি বা জলাবদ্ধ অবস্থায় চারার গোড়া পচে মারা যেতে পারে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস অথবা সেচ ব্যবস্থা থাকলে গ্রীষ্মের প্রথমে রোপণ করতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

রোপণ দূরত্ব : ৬০-৯০ সেন্টিমিটার দূরত্ব সারিবদ্ধভাবে চারা লাগিয়ে চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে টিপে দিতে হয়।

গিনি ঘাসে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২৫০ কেজি
টিএসপি	১২০ কেজি
এমপি	৭৫ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটি)	২৫০-৫০০ কেজি
জৈব সার	প্রাপ্তি সাপেক্ষে

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : গিনি ঘাসে ফলন বাড়াতে হলে সার দিতে হয়। প্রতি গোছার কাছে সার দিলে ঘাস তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে। জমিতে রস না থাকলে পানি সেচ দিতে হয়। শুষ্ক মৌসুমেও এ ঘাসের ফলন ভাল। অম্ল জমিতে প্রতি শতকে ১-২ কেজি ডলোচুন দিতে হয়।

ঘাস কাটা : গিনি ঘাস কাটতে হয়। এ ঘাস নেপিয়ার ঘাসের মতো তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায় না। সেজন্য ৪০-৪৫ দিন পর পর কাটলেও চলে। তবে ঘাসের পুষ্টিমান বেশি পেতে হলে কচি অবস্থায় কেটে গবাদিকে খাওয়াতে হয়।

ফলন : এ ঘাস বৎসরে ৮-১০ বারেরও বেশি কাটা যায়। বৎসরে হেক্টর প্রতি ফলন ১২০-১৪০ টন।

ঘাসের পরিচর্যা : গিনি ঘাসের জমি বছরে ১-২ বার মাটি আলগা করে দিতে হয়। প্রয়োজনমতো পানি সেচ ও সার প্রয়োগ করলে উচ্চ ফলন পাওয়া যায়।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম : গিনি ঘাস গরুকে কেটে খাওয়ানো সবচেয়ে ভাল। খড়ের সাথে মিশিয়েও গরুকে দেওয়া যেতে পারে। গরু চরিয়েও খাওয়ানো যায়। অধিক বৃষ্টির সময় যখন ভেজা থাকে তখন গরু দিয়ে সরাসরি চরিয়ে খাওয়ানো ঠিক নয়।

সংরক্ষণ : গিনি ঘাস শুকিয়ে রাখা যায়। প্রয়োজনবোধে এ ঘাস সাইলেজ করেও সংরক্ষণ করা যায়।

৭. সপ্লেন্ডিডা ঘাস *(Setaria splendida)*

সপ্লেন্ডিডা ঘাস প্রায় সব রকম জমিতে জন্মায় কিন্তু উঁচু শুকনো জমি এর জন্য রসযুক্ত উঁচু ও মধ্য জমিতে এর ফলন ভাল হয়। এ ঘাসের পাতা লম্বা, ভারি ও মসৃণ।

জমি তৈরি : জমি ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে আগাছা মুক্ত করে নিতে হয়।

চারা রোপণ : এর চারা বা কাটিং প্রস্তুত করে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হয়। বর্ষা কালে রোপণ করা যায়। এ ঘাসের কোনো বীজ হয় না। এ ঘাস চাষের জন্য মূলসহ কাণ্ডাংশ চারা হিসেবে রোপণ করতে হয়।

চারার সংখ্যা : এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২০-২২ হাজার চারার প্রয়োজন হয়

রোপণ সময় : মে-জুন মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর হতে সমস্ত বর্ষাকালই চারা রোপণ করা যায়। পানি সেচ ব্যবস্থা থাকলে শুষ্ক মৌসুমেও চাষ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : জমিতে প্রয়োজনমতো পানি ও সার দিতে হবে।

সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২০০ কেজি
টিএসপি	১৩০ কেজি
এমপি	৬৫ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	৩০০-৫০০ কেজি

ঘাস কাটার নিয়ম : মাটি হতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পরিমাণ উপরে ঘাস কাটতে হয়। এতে পরবর্তী কাটিং তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

ফলন : এ ঘাস ৩-৪ সপ্তাহ পর পর বছরে ১০-১২ বার কাটা যা। বছরে প্রতি হেক্টরে জমিতে ১৫০-১৮০ টন পর্যন্ত কাচা ঘাস পাওয়া যায়। শীতের কয়েক মাস এ ঘাসের ফলন কম হয়।

ঘাসের পরিচর্যা : এ ঘাসে পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে। আগাছামুক্ত রাখা, সময়মতো সেচ ও সার প্রয়োগ এবং কোদাল অথবা লাঙ্গল দিয়ে দুই সারির মধ্যবর্তী খালিস্থানের মাটি আলগা করে দিতে হয়। এতে ফলন বেশি হয়।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম : ঘাস কেটে অথবা গরু চরিয়ে এ ঘাস গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। তবে কেটে খাওয়ানোই ভাল। ঘাস কম হলে খড়ের সাথে মিশিয়ে গরুকে খেতে দেওয়া যায়।

সংরক্ষণ : এ ঘাস সাইলেজ করে সংরক্ষণ করাই ভাল, তবে শুকিয়ে খণ্ড করে সংরক্ষণ করা যায়।

বড় সিগনাল ঘাস *(Brachiaria decumbens)* : সিগনাল একটি বহুবর্ষী বা স্থায়ী ঘাস। এর পাতা সামান্য চওড়া এবং কাণ্ড চিকন।

জমি : এ ঘাস প্রায় সবরকম জমিতেই হয়। তবে উঁচু ও ঢালু জমিতে ভাল জন্মায়।

৮. সিগনাল ঘাস *(Brachiaria decumbens)*

চারা রোপণ : বর্ষার প্রথমে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সিগনাল ঘাস লাগাতে হয়। ঘাস অতি তাড়াতাড়ি সব জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘাসের কাণ্ড অথবা শিকড়সহ খণ্ডিত অংশ চারা হিসেবে রোপণের জন্য ব্যবহৃত হয়

সংরক্ষণ : এ ঘাস সাইলেজ করে অথবা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : সিগনাল ঘাসের জমিতে নিয়মিত সার ও সেচ দিতে হয়।

সিগনাল ঘাসে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ হেক্টর
ইউরিয়া	১৮০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমপি	৬০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটি)	৪০০-৬০০ কেজি

পরিচর্যা : সময়মতো সার প্রয়োগ, জমিতে পানি সেচ, নিয়মিত ঘাস কাটা ইত্যাদি করাই ঘাসের পরিচর্যা।

ঘাস কাটা : সিগনাল ঘাস কেটে খাওয়াতে হয়। গরু বা ছাগল-ভেড়া দ্বারা চরিয়ে খাওয়ানো সুবিধাজনক।

ফলন : এ ঘাস ২১-২৮ দিন পর পর বছরে ১০-১২ বার কাটা যায়। বছরে হেক্টর প্রতি ফলন ৭৫-১০০ মেট্রিক টন।

৯. শ্যামা বা জার্মান ঘাস *(Echinocloa crusgalli)*

শ্যামা ঘাস বহুবর্ষী বা স্থায়ী ঘাস। এর কাণ্ড বা গোড়াসহ কাণ্ড একবার রোপণ করলে বেশ কয়েক বছর একই জমি হতে ঘাস সংগ্রহ করা যায়।

জমি : নিচু ও জলাবদ্ধ জমিতে চাষ করা যায়। স্যাঁতসেঁতে জমিতেও ঘাসের চাষ করা যায়। সাধারণত মে মাসে এ ঘাস রোপণ করা হয়। এ ঘাসে কোনো বীজ হয় না। ঘাসের কাণ্ড অথবা গোড়াসহ কাণ্ডাংশ চারার জন্য ব্যবহার করা হয়। পারা ঘাসের জমির মতো জমি প্রস্তুত করতে হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : সার ও পানি সেচ অন্যান্য ঘাসের অনুরূপ।

ফলন ও সংরক্ষণ : জার্মান ঘাস বছরে ৮–১০ বার পর্যন্ত কেটে কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করা যায়। প্রতি বৎসর হেক্টরে ১২০–১৪০ টন পর্যন্ত হতে পারে। এ ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ করা তেমন সুবিধাজনক নয়। তবে সাইলেজ করে বেশ সংরক্ষণ করা যায়।

১০. প্যাঙ্গোল ঘাস

প্যাঙ্গোলা ঘাস গ্রীষ্মপ্রধান দেশের একপ্রকার বহুবর্ষী বা স্থায়ী ঘাস। এ ঘাসের কাণ্ড এবং পাতা ধারাল ও অমসৃণ। পাতা ও কাণ্ড উভয়ই সরু।

জমি : প্যাঙ্গোলা ঘাস প্রায় সবরকম জমিতে জন্মায়, তবে উঁচু ও ঢালু জমিতে ভাল জন্মে। এ ঘাসের চাষের জন্য একইভাবে জমি প্রস্তুত করতে হয়। ঘাসের গোড়াসহ কাণ্ডাংশ চারা হিসেবে রোপণ করা হয়। ঘাসের গোড়াসহ কাণ্ডাংশ চারা হিসেবে রোপণ করা হয়।

ঘাস কাটা ও ফলন : প্যাঙ্গোলা ঘাসও কাটা যায়। তবে গরু চরিয়ে খাওয়ানো ভাল। এ ঘাস ছাগল ও ভেড়া চরে খাওয়ার জন্য উপযুক্ত। এ ঘাস বছরে ৭–৮ বার কেটে অথবা গরু ছাগল চরিয়ে খাওয়ানো যায়।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম : এ ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা গরু ছাগল চরিয়ে খাওয়ানো যায়।

সংরক্ষণ : এ ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষন করা সবচেয়ে ভাল। ঘাস শুকিয়ে সংরক্ষণ কিছু পরিমাণ পুষ্টি বিনষ্ট হয়।

১১. বাকশা ঘাস

বাকশা ঘাস একটি স্থায়ী দেশীয় ঘাস। বাংলাদেশে জলাভূমিতে এ ঘাস জন্মাতে দেখা যায়। এ ঘাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি শীত সহ্য করতে পারে। শীতের সময় বেশি ফলন দেয়।

জমি : নিচু স্যাঁতসেঁতে জমি যেখানে অন্য ফসল কম হয় সেসব জমিতেও এর চাষ করা যায়। বাকশা ঘাসের কাণ্ড বা গোড়াসহ কাণ্ড চারা হিসেবে বিস্তারের জন্য রোপণ করা হয়।

রোপণ : বাকশা ঘাস সারিবদ্ধভাবে ৪.৫ × ৪.৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ব্যবধানে ঘাসের কাণ্ড অথবা গোড়াসহ কাণ্ড চারা হিসেবে রোপণ করতে হয়। শীতকালীন ঘাস বলে অক্টোবর মাসে রোপণের জন্য সবচেয়ে ভাল সময়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : নিয়মিত সার প্রয়োগ ও সেচ দিতে হয়।

বাকশা ঘাসের সার সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২৫০ কেজি
টিএসপি	১১৫ কেজি
এমপি	১৫০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	৪০০-৬০০ কেজি

ফলন : বাকশা ঘাস ৩–৪ সপ্তাহ পর পর কেটে ঘাস সংগ্রহ করা হয়। এ ঘাস বছরে ৮–১০ বার পর্যন্ত কাটা যায়। বছরে হেক্টর প্রতি এর ফলন ১১০–১৩০ টন।

সংরক্ষণ : এ ঘাস শুকিয়ে বা সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা সম্ভব

১২. ভুট্টা (*Zea mays*)

ভুট্টার কচি সবুজ গাছ গবাদির ঘাস হিসেবে খুব পুষ্টিকর। ভুট্টা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কম বেশি জন্মে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ করে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যাচ্ছে।

জমি : উঁচু এবং নিচু জমিতে ভুট্টার চাষ করা সম্ভব। এ দেশে বছরে দু'বার ভুট্টার চাষ করা যায়।

বীজ বপন সময় : নিচু জমিতে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পানি সরে যাওয়ার পর এবং একই সময়ে উঁচু জমিতে যেখানে সেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে ভুট্টার চাষ করা যায়। শীতের শেষে পানি সেচ দিয়ে বা বৃষ্টি হওয়ার পর বীজ বপন করা চলে। ভুট্টা অধিক শীত এবং অধিক বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না।

জমি তৈরি : জমি ৫-৭ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয়।

বীজ হার : চাষের জন্য ভুট্টা দানা বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজের জন্য হেক্টরে ৪০-৫০ কেজি ভুট্টার প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন : ভুট্টার বীজ সারিবদ্ধভাবে বপন করতে হয়। সারি ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং বীজ ৩-৪ সেন্টিমিটার পর পর বপন করতে হয়

পরিচর্যা : জমিকে সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। ভুট্টার চারা যখন ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার উঁচু হবে তখন এক সারির পর অপর সারির সমস্ত চারা কেটে গবাদির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। অবশিষ্ট সারির চারা ১৫ সেন্টিমিটার পরপর একটি করে চারা রেখে অন্য চারা কেটে সবুজ ঘাস হিসেবে গরুকে দিতে হবে।

এ পদ্ধতিতে বীজ বপন ও জমি পরিচর্যা করলে ভুট্টার মোচা হওয়ার পূর্বেই হেক্টরে ২০ টন ভুট্টা সবুজ ঘাস হিসেবে পাওয়া যায়। যেসব চারার ভুট্টার মোচা হওয়ার জন্য রাখা হবে এগুলোর গোড়ায় মাটি দিয়ে বেঁধে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : জমি তৈরির সময় প্রাপ্তি অনুসারে জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২৫০ কেজি
টিএসপি	৮০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
ডলোচুন (অম্ল মাটির ক্ষেত্রে)	৬০০-৮০০ কেজি

অধিক ফলনের জন্য অতিরিক্ত ৫০ কেজি ইউরিয়া গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়ার পূর্বে ছিটিয়ে দিতে হয়। অম্লমাটির প্রতি শতকে ১-২ কেজি ডলোচুন দিতে হয়। জমিতে রস না থাকলে পানি সেচ দিতে হয়।

ফলন : ভুট্টার চারা ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে ভুট্টার জমি পরিচর্যা করে প্রায় ২০ টন সবুজ দ্রব্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া ভুট্টার দানা বা বীজ সংগ্রহ করার পর ভুট্টার খড় প্রতি হেক্টরে ৩-৫ টন পাওয়া যেতে পারে।

সংরক্ষণ : ভুট্টার খড় ভাল করে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। ভুট্টার মোচা যখন অর্ধপক্ব হয় অথবা কচি থাকে তখন মোচাসহ গাছ কেটে সাইলেজ করে গবাদির জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এভাবে সাইলেজ করে ভুট্টা সংরক্ষণ করতে পারলে গোখাদ্য হিসেবে এর খাদ্যমান বেশি থাকে।

১৩. জোয়ার *(Sorghum vulgare)*

জোয়ার সবুজ অবস্থায় গবাদিকে কাঁচা ঘাস হিসেবে খাওয়ানো হয়। এর দানা বা বীজ মানুষের, হাঁস-মুরগির ও গরুর জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য। জোয়ারকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা চলে, যেমন–

(ক) শস্য হিসেবে জোয়ার

(খ) কাঁচা ঘাস হিসেবে জোয়ার

(গ) শস্য হিসেবে জোয়ার এটিতে শস্য বা দানা ভাল জন্মায়। কাঁচা ঘাস হিসেবে জোয়ার এটিতে অধিক পরিমাণে গবাদির জন্য সবুজ ঘাস পাওয়া যায়।

চাষ পদ্ধতি : জোয়ার প্রায় সবরকম জমিতে আবাদ করা চলে, তবে বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মায়। বছরে সব ঋতুতেই এর চাষ করা যায়।

মাটি : বাংলাদেশে আশ্বিন-কার্তিক এবং বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসে দুই ঋতুতেই এর চাষ করার উপযুক্ত সময়।

চাষ সময় : ভুট্টার জমি কয়েক বার চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে নিতে হয়।

বীজ বপন : বীজ বা দানা সংগ্রহ করার জন্য সারিবদ্ধভাবে বপন করতে হয়। সবুজ ঘাস হিসেবে এর বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়। জোয়ার শস্যের জন্য বপম করলে প্রতি হেক্টরে ২৫-৩০ কেজি এবং ঘাসের জন্য ৬০-৮০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

পরিচর্যা : বীজ সংগ্রহ করার জন্য জোয়ারের জমি ভাল করে নিড়িয়ে আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। প্রয়োজনমতো ঘন স্থানের চারা উঠিয়ে পাতলা করে নিতে হয়। সবজি ঘাসের জন্য জোয়ার চাষে বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না।

সেচ ও সার প্রয়োগ : ভাল ফলন পেতে হলে জমিতে সার প্রযোগ করতে হয়।

একর প্রতি ১০ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তীব্র অম্ল মাটিতে ডলোচুনের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়।

জোয়ারে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৮০ কেজি
টিএসপি	৮৫ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	৪০০-৬০০ কেজি

ঘাস কাটা : জোয়ার সবুজ ঘাস হিসেবে ফুল আসার বা ফুল আসার কিছু সময় পূর্বে বা পরে কেটে খাওয়াতে হয়। কচি অবস্থায় এতে "সাইয়োজেনেটিক গ্লুকোসাইড" নামক একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় যা গবাদি পশুর জন্য বিষাক্ত।

ফলন : জোয়ার গরুকে কেটে খাওয়ানোর পর বিনা চাষে আর একবার ফলন পাওয়া যায়। ভাল ফলন হলে হেক্টর প্রতি ২৫-৩৫ টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম : ঘাস জমি থেকে কেটে এনে গরুকে ছোট করে কেটে দিতে হয়। খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায় এবং সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়। ভাল আবহাওয়ায় শুকিয়েও রাখা যায়।

বাজরা *(Pennisetum typhoides)*

বাজরা (Pearl millet) গাছ মধ্যম উঁচু। নিয়মিত পানি সেচ ও সার প্রয়োগ করতে পারলে এ ঘাস ভাল ফলন দিয়ে থাকে। এ ঘাস একবার চাষ করলে ২-৩ বছর পর্যন্ত সবুজ ঘাস সংগ্রহ করা যায়

চাষাবাদ : উঁচু ও ঢালু জমিতে এই ঘাসের চাষ করতে হয়। সাধরণত রবি ফসলের সাথে এর চাষ বেশি করা হয়। তা ছাড়া বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য মাসেও এর চাষ করতে দেখা যায়। জমিতে চার পাঁচ বার চাষ ও মই দেবার পর অথবা সারিবদ্ধভাবে বীজ বুনতে হয়।

বীজহার : হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ ২৫-৩০ কেজির প্রয়োজন হয়।

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : একবার বপন করলে বাজরা কাঁচা ঘাস হিসেবে ২/৩ বার সংগ্রহ করা যায়। বাজরা ঘাস কেটে খড়ের সাথে মিশিয়ে গরুকে খাওয়ানো যায়।

ফলন : প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ টন কাঁচা ঘাস পাওয়া যায়। বীজ বপনের ৬০/৭০ দিনের মধ্যে ঘাস পাওয়া সম্ভব হয়।

সংরক্ষণ : সাইলেজ করে বা রোদে শুকিয়ে এটা সংরক্ষণ করতে হয়।

বার্লি *(Hordeum vulgare)*

বার্লি গমের মতোই শুষ্ক মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ করা যায়। শস্য হিসেবে এটা যেমন মানুষের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে থাকে, ঘাস হিসেবেও এর চাষ করে গবাদির সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটানো যায়। বার্লি একবার চাষ করলে কাঁচা ঘাস হিসেবে ২-৩ বার কেটে খাওয়ানো যায়।

চাষ পদ্ধতি : গম চাষের মতোই বার্লি শীতের প্রারম্ভে তৈরি করে বপন করতে হয়।

বীপ বপন : জমিতে ছিটিয়ে বা সারিবদ্ধভাবে বপন করা যেতে পারে। তবে সারিবদ্ধভাবে বপন করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

ফসল কাটা : বপনের পর ৬০-৭০ দিনের মধ্যে একবার কেটে খাওয়ানো যায়। জমিতে প্রয়োজনমতো সার ও পানি সেচ দিতে পারলে একমাস পর আরও কেটে গরুকে দেওয়া যায়। তৃতীয়বার গবাদিকে না খাওয়ায়ে দানাবীজ সংগ্রহের জন্য রাখা ভাল।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : এরপর প্রতি কাটিং একর হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হয়। তীব্র অম্ল মাটিতে ডলোচুন কিছু বেশি দিতে হয়।

ফলন ও সংরক্ষণ : হেক্টর প্রতি কাঁচা ঘাসের ফলন ৩০-৪০ টন। রোদে শুকিয়ে বা সাইলেজ করেও এ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।

বার্লি ঘাসে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২২০ কেজি
টিএসপি	১৪৫ কেজি
এমপি	৯০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	৬০০-৮০০ কেজি

বড় ওট (*Avena savita*)

ওট শস্য হিসেবে গম এবং বার্লির পরই এর স্থান। গবাদির জন্য কাঁচা ঘাস হিসেবে এর চাষ বাংলাদেশে করা যায়। বিদেশ থেকে বীজ আমদানি করে দেখা গেছে যে কাঁচা ঘাস হিসেবে এর ফলন খুব ভাল এবং একবার আবাদ করলে ২-৩ বার কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করা যায়। সুবিধামতো বীজ সংগ্রহ করা যায় না বলে এ দেশে এর চাষ কম হয়।

চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশে শীতের প্রারম্ভে রবি ফসলের সময়ে এর চাষ করতে হয়। প্রায় সব জমিতে ওট জন্মায়, কিন্তু বেলে মাটিতে ভাল জন্মায় না। জমির চাষ করে বীজ বুনতে হয়। ওট চাষে উঁচু ও ঢালু জমির প্রয়োজন। হেক্টর ৭৫-১০০ কেজি বীজ ছিটিয়ে বা সারিবদ্ধভাবে বুনতে হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : ওট চাষে নিয়মিতভাবে সার প্রয়োগ ও পানি সেচ দিতে হয়। জমি তৈরির সময় জৈব সার প্রয়োগ করতে হয়। বপনের ৪-৫ সপ্তাহ পর হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হয়। পরবর্তী কাটিং থেকে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য প্রতিবারেই কাটার পর হেক্টর প্রতি ৫০–৭০ কেজি ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হয়।

ওটে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩০ কেজি
টিএসপি	৫০ কেজি
এমপি	২৫ কেজি
ডলোচুন (অম্ল মাটির ক্ষেত্রে)	৪০০–৬০০ কেজি

ফলন : কাঁচা ঘাস হিসেবে ২-৩ বার কাটতে পারলে হেক্টর প্রতি এর ফলন ৫০-৬০ টন।

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : এ ঘাস ছোট ছোট করে কেটে গরুকে খাওয়াতে হয়। বপনের পর ৬০–৮০ দিনের মধ্যে গরুকে খাওয়ানো যায়। ছোট করে কেটে খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো যায়।

সংরক্ষণ : রোদে শুকিয়ে অথবা সাইলেজ করে সংরক্ষণ করা যায়।

গোমটর গো-মটর (*Vigna unguiculata*)

কাঁচা ঘাস হিসেবে গোমটর গবাদির জন্য খুবই পুষ্টিকর ও উপাদেয়। গোমটর একটি লেগুম উদ্ভিদ। এর দ্বারা জমির উর্বরা শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর বীজ ডাল হিসেবে মানুষের প্রিয় খাদ্য।

চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশের আবহাওয়ায় গোমটর বছরে ২–৩ বার চাষ করা চলে, বীজ নেওয়ার জন্য শীতের প্রারম্ভে রবি ফসলের সাথে চাষ করতে হয়। জমিতে রস থাকলে বা সেচ ব্যবস্থা থাকলে শীতের শেষেও চাষ করা চলে। বৃষ্টি কম থাকলে উঁচু জমিতে বর্ষার সময়েও চাষ করা চলে।

জমি : উঁচু বা ঢালু জমিতে ৩–৪ বার চাষ ও মই দিয়ে বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়।

বীজ : বীজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে চাষ করলে হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ ২৫-৪০ কেজি প্রয়োজন হয়। কিন্তু গরুকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কিংবা সবুজ সার হিসেবে চাষ করা হলে হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ ৭৫–১০০ কেজি জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হয়।

সার ও পানি সেচ : জমিতে রস না থাকলে হালকা পানি সেচ দেওয়া ভাল।

গো-মটরে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩৫ কেজি
টিএসপি	৫৫ কেজি
এমপি	৫০ কেজি
ডলোচুন (অম্ল মাটির ক্ষেত্রে)	৬০০-৩০০ কেজি

ফলন ও সংরক্ষণ : কাঁচা ঘাস হিসেবে এর ফলন খুবই ভাল। ভাল ফলন হলে হেক্টরে ২৫–৩০ টন কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করা যায়। রোদে শুকিয়ে ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : গরুকে কেটে খাওয়ানো সবচেয়ে সুবিধাজনক। কারণ গরুকে চরিয়ে খাওয়ালে খুব বেশি অপচয় হয়। এতে খাদ্যমান বেশি, তাই খড়ের সাথে মিশিয়েও খাওয়ানো ভাল।

মাশকলাই *(Phaseolus mungo)*

মাশকলাই সবুজ ঘাস হিসেবে গবাদির জন্য উত্তম খাদ্য। মাশকলাই দানাদার খাদ্য হিসেবেও গরুকে দেওয়া হয়। এ ছাড়া এ দেশের অনেকেই ডাল হিসেবে খেয়ে থাকে।

চাষ পদ্ধতি : মাশকলাই দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মায়।

চাষ মৌসুম : বাংলাদেশে বীজ সংগ্রহের জন্য রবি মৌসুমে আবাদ করা হয়। গরুকে কাঁচা ঘাস হিসেবে খাওয়ানোর জন্য জুন মাসেও চাষ করা যায়। বাংলাদেশের কোনো কোনো স্থানে বর্ষার শেষে ধানের জমি হতে পানি চলে যাওয়ার পর ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

জমি তৈরি : চর ও হাওর এলাকায় পানি চলে যাওয়ার পর বিনা চাষে ছিটিয়ে বুনলেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। উঁচু জমিতে হালকা ধরনের ৩–৪ বার চাষ ও মই দিয়ে বুনতে হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : জমিতে রস না থাকলে হালকা পানি সেচ দেওয়া ভাল।

মাশকলাইয়ে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩০ কেজি
টিএসপি	৭০ কেজি
এমপি	৫০ কেজি
ডলোচুন (অম্ল মাটির ক্ষেত্রে)	৪০০–৬০০ কেজি

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : হেক্টর প্রতি কাঁচা ঘাসের ফলন ১৫–২০ টন। এ ঘাস গরুকে কেটে খাওয়ানেই সবচেয়ে ভাল। গরু চরিয়েও খাওয়ানো যায়। এ ঘাস শুকিয়ে পরবর্তীকালেও খাওয়ানো যায়।

খেশারি (*Lathyrus sativus*)

খেশারি কাঁচা ঘাস হিসেবে বাংলাদেশের গবাদির জন্য প্রিয় খাদ্য। শীতকালীন ফসল বলে এটি কাঁচা ঘাস হিসেবে বছরের সব ঋতুতে পাওয়া যায় না। খেশারির ডাল বা ভুষি গবাদির জন্য পুষ্টিকর ও উপাদেয়।

চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খেশারির চাষ করা হয়। খেশারি পলি মাটিতে ভাল জন্মায়।

চাষ মৌসুম : বর্ষার শেষে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে ধানের জমি হতে যখন পানি সরে যায় তখন ধানের জমিতে ছিটিয়ে বুনতে হয়। তা ছাড়া চর বা হাওর এলাকার পানি চলে যাওয়ার পর বিনা চাষেই ছিটিয়ে বোনা যায়।

জমি তৈরি : উঁচু জমিতে ৩–৪ বার চাষ ও মই দিয়ে বুনতে হয়।

বীজ হার : বপনের জন্য হেক্টর প্রতি ৫০–৬০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ ও পানি সেচ : খেশারি পলি মাটিতে বোনা আমন ধানের সাথে অনুফসল হিসেবে বপন করা হলে সার প্রয়োগ ও পানি সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে এককভাবে চাষ করলে সার দিতে হয়। জমি তৈরির সময় ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে বপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মাটিতে রস না থাকলে হালকা সেচ দিতে হয়।

খেশারিতে সার প্রয়োগ সুপারিশ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩৫ কেজি
টিএসপি	৬৫ কেজি
এমপি	২০ কেজি
চুনাচুন (অম্ল মাটির ক্ষেত্রে)	৩০০–৫০০ কেজি

ফলন : বপনের পর ৬০–৮০ দিনের মধ্যে এটি কাঁচা ঘাস হিসেবে গরুকে খাওয়ানো যায়। এটি বছরে মাত্র একবার আবাদ করা যায়। প্রতি হেক্টরে কাঁচা ঘাসের ফলন দাঁড়ায় ১৫–২০ টন।

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : এ ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যায়। চর ও হাওড় এলাকায় গরু চরিয়ে খেশারি খাওয়ানো হয়। বীজ সংগ্রহ করার পর এর খড় গবাদির জন্যও ভাল খাদ্য।

সংরক্ষণ : খেশারি কাঁচা অবস্থায় রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। এটি দিয়ে সাইলেজ করা সুবিধাজনক নয়।

শন (*Crotroalaria juncea*)

শন বা পাট বাংলাদেশে রবি ফসল হিসেবে চাষ করা হয়ে থাকে। গরুর কাঁচা ঘাসের চাহিদা মিটানোর জন্য এবং জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য এ দেশের কৃষকরা এর চাষের উপর

গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে আঁশ সংগ্রহ করার জন্য সাধারণ পাটের মতো এর আবাদ করা হয়ে থাকে।

চাষ পদ্ধতি : দোঁআঁশ মাটিতে এর ফলন ভাল হয়। এঁটেল মাটি, লোনা মাটি এবং নিচু জমিতে ফলন ভাল হয় না। বাংলাদেশে শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়।

জমি তৈরি : অন্যান্য ঘাসের জমির মতো ৩–৪ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হয়।

বীজ হার : হেক্টর প্রতি বীজের পরিমাণ ৫০–৬০ কেজি দরকার।

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : গবাদির জন্য কাঁচা ঘাস হিসেবে এটি একটি পুষ্টিকর খাদ্য। বপনের পর ৬০–৮০ দিনের মধ্যে কাঁচা ঘাস হিসেবে গরুকে খাওয়ানো হয়। কাঁচা ঘাস হিসেবে এর ফলন প্রতি হেক্টরে ২০–২৫ টন।

ফলন : জমিতে শন চাষ করলে জমির উর্বরতা শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

সার প্রয়োগ : জমিতে রস না থাকলে পানি সেচ দিতে হয়। এতে সার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ৪০–৫০ কেজি ফসফেট ছিটিয়ে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। অম্ল মাটিতে প্রতি শতকে ১–২ কেজি ডলোচুন দিতে হয়।

ফসল কাটা : এ ফসল কেটে বা গরু চরিয়ে খাওয়ানো যায়।

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : কেটে গরুকে খাওয়ানো সবচেয়ে ভাল। ছোট করে কেটে খড়ের সাথে মিশিয়েও গবাদিকে খাওয়ানো যায়।

সংরক্ষণ : সাইলেজ করে বা রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করে পরবর্তীকালে খাওয়ানো যায়।

ইপিল ইপিল *(Leucana leucocephala)*

ইপিল-ইপিল অধিক প্রোটিনযুক্ত একপ্রকার লেগুম গাছ। এ গাছের পাতা এবং কচি ডগা গবাদিকে কাঁচা অথবা শুষ্ক অবস্থায় খাওয়ানো যায়। গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ গাছ ৬–৮ মিটার লম্বা হতে পারে। উত্তর আমেরিকা এ গাছের আদি জন্মস্থান।

চাষ পদ্ধতি : বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ইপিল-ইপিল চাষ করা সম্ভব। এ গাছ উঁচু বা ঢালু জমিতে চাষ করতে হয়। নিচু স্যাঁতসেঁতে বা জলাবদ্ধ ভূমিতে চাষ করা যায় না।

রোপণ : ইপিল-ইপিল-এর বীজ মে মাসে কাঁচা ঘাসের জন্য সারিবদ্ধভাবে বপন করতে হয়। গিনি বা পারা ঘাসের সংমিশ্রণে চাষ করতে পারলে ঘাসের খাদ্যমান বাড়ানো যায়।

বীজ বপন পদ্ধতি : গবাদির ঘাস সংগ্রহ করার জন্য ইপিল ইপিল দ্বিসারি পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে স্থায়ী ঘাসের সংমিশ্রণে বপন করতে হয়। স্থায়ী ঘাস বপনের তিন মাস পরে দ্বিসারির মাঝে ১৫–২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ২–৩ সেন্টিমিটার গভীরতায় বপন করতে হয়।

বীজ বপন সময় : মে মাস এ গাছের বীজ বপনের উৎকৃষ্ট সময়। অন্য স্থায়ী ঘাসের সংমিশ্রণ ছাড়াও পৃথকভাবে চাষ করা যায়। জমির আইলের ধার দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বপন করা হলে জমির বেড়ার কাজ করে এবং গবাদির জন্য কাঁচা ঘাসও সংগ্রহ করা যায়।

পানি সেচ ও সার প্রয়োগ : জমিতে রস না থাকলে প্রথম অবস্থায় পানি সেচ দিতে হবে। ইপিল ইপিলের শিকড় মাটির নিচে অনেক দূর চলে যেতে পারে এবং শিকড় চারদিকে

বিস্তার করে রস সংগ্রহ করতে পারে। এ জন্য পানি সেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অম্ল মাটিতে তীব্র ডলোচুন ছিটিয়ে দিয়ে বীজ বপন করতে হয়।

ইপিল ইপিল সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৫০ কেজি
টিএসপি	৯০ কেজি
এমপি	৬০ কেজি
ডলোচুন (অম্লমাটির ক্ষেত্রে)	৬০০-৮০০ কেজি

পশুকে খাওয়ানোর নিয়ম : এ গাছের ডগা কেটে অন্য ঘাস বা খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো সবচেয়ে ভাল, কারণ এতে খাদ্যমান অনেক বেশি থাকে। গাছ ১-১.৫ মিটার হলে গরু ছাগল চরিয়েও খাওয়ানো হয়। পশুকে চরিয়ে বা কেটে খাওয়ানোর পর ৪০-৫০ দিনের মধ্যে আবার ঘাস সংগ্রহ করার সময় হয়।

সংরক্ষণ : ইপিল ইপিল চাষ করলে বছরে ৫-৬ বার কাঁচা ঘাস সংগ্রহ করা যায়। জমিতে একবার বপন করলে বহু বছর এর পাতা ও কচি ডগা গবাদিকে খাওয়ানো যায়।

ফলন : হেক্টর প্রতি বছরে কাঁচা ঘাসের ফলন ৫০-৬০ টন। পাতা শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়।

লেগ্যুম ঘাস

লেগ্যুম বা শুটি Leguminosae গোত্রভুক্ত উদ্ভিদ। এই গোত্রভুক্ত ১৫,০০০ প্রজাতির লেগ্যুম পৃথিবীব্যাপী চাষ করা হয় অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মে থাকে। এই বিশাল ভান্ডারের লেগ্যুম প্রজাতির উদ্ভিদ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং মানুষ, পশু-পাখিকে পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দিয়ে থাকে।

Leguminosae গোত্রের হাজার হাজার প্রজাতির লিগিউমের মধ্যে পশু খাদ্য হিসেবে আমাদের দেশের আবহাওয়ায় চাষযোগ্য কয়েকটি প্রজাতির চাষ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

লেগ্যুম উদ্ভিদের শিকড়ে নডিউলের মধ্যে যে বায়বীয় নাইট্রোজেন সঞ্চিত থাকে তা থেকে উদ্ভিদ তার নাইট্রোজেন চাহিদা মেটায়।

জলবায়ু : মাটির প্রকৃতি, দিনের দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির উপর লেগ্যুমের চাষ নির্ভরশীল। যেখানে দশ থেকে বারো ঘন্টা দিনের দৈর্ঘ্য ১৭০° সেন্টিমিটার থেকে ৩০০° সেন্টিমিটার তাপমাত্রা এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৮০০-২০০০ মিলিমিটার, সেখানে আবহাওয়ায় লেগ্যুম ভাল জন্মে।

প্রজাতি : বাংলাদেশের আবহাওয়ার বেশ কয়েক প্রজাতির লেগ্যুম বা শুঁটির চাষ করা যায়। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ক্লোভার, স্টাইলো, সেন্ট্রোসেমা, সিরাট্রো, গ্লাইসিন, ডেসমোডিয়াম, এক্সিলারিস, বারশিম, শিম, অ্যারাকিস, গ্লিরিসিডিয়া প্রভৃতি প্রধান।

স্টাইলোসেনথেস *(Stylosanthes sp.)*

স্টাইলো বহুবর্ষজীবী লেগুম। স্টাইলোর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ আমেরিকা। স্টাইলো সব প্রকারের মাটিতে জন্মে। স্টাইলো একটি উত্তম চারণযোগ্য লেগুম।

বীজ শোধন : স্টাইলো বীজ ০.২% পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে ৭-৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে তারপর বপন করতে হয়।

বীজহার : হেক্টর প্রতি ১৫-২০ কেজি বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়। স্টাইলো এককভাবে বা অন্যান্য ঘাসের সাথেও চাষ করা যায়।

বপন সময় : বর্ষার প্রথমে অর্থাৎ এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে স্টাইলো চাষ করা যায়। রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, বাঁধের ধারে পাহাড়ের ঢালে স্টাইলো চাষ করা যায়।

পশুকে খাওয়ানো : একবার চাষ করলে ৩-৪ বছর পর্যন্ত গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। স্টাইলো গোচারণ সহিষ্ণু। সে কারণে স্টাইলো চরিয়েও খাওয়ানো যায়।

ফলন : ভাল ফলন পেতে হলে বীজ বপনের সময় জমি ৩-৪ বার চাষ করে হেক্টর প্রতি ১৫০ কেজি টিএসপি সার প্রয়োগ করে বীজ বপন করতে হয়।

সার প্রয়োগ : বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পরে হেক্টর প্রতি ৭০ কেজি ইউরিয়া উপরি সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

সংরক্ষণ : স্টাইলো ৩০-৪৫ সেন্টিমিটার বড় হলে ৬-৭ সেন্টিমিটার রেখে কেটে গবাদি পশুকে খাওয়াতে হয়। স্টাইলো ছাগলেরও একটি উত্তম খাদ্য। বছরেও ৩-৪ বার কেটে খাওয়ানো যায়। হেক্টর প্রতি ৪০-৫০ টন সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। শুকনা অবস্থায় স্টাইলোতে ১১% প্রোটিন থাকে।

সেন্ট্রোসেমা *(Centrosema pubescens)*

সেন্ট্রোসেমা দ্রুত বর্ধনশীল বহুবর্ষজীবী লেগুম। সেন্ট্রোসেমা প্রচুর পরিমাণে বীজ তৈরিতে সক্ষম। লতাজাতীয় গাছ হওয়ায় নেপিয়ার, গিনি, রোডস সিগন্যাল প্রভৃতি ঘাসের সাথে একত্রে চাষ করা যায়। ঘাসের সাথে সেন্ট্রোসেমা চাষ করলে ঘাসের সাথে একত্রে সেন্ট্রোসেমা কেটে গবাদি পশুকে খাওয়ানো চলে। ফলে লেগুম এবং ঘাস একত্রে গবাদি পশুকে খাদ্য সুষম করতে সাহায্য করে। বাড়তি কোনো দানাদার খাদ্য না দিলেও চলে।

বীজ বপন সময় : মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সেন্ট্রোসেমার বীজ বপন করতে হয়। লতাজাতীয় উদ্ভিদ হওয়ায় গাছ বড় হলে মাচা করে দিতে হয়।

বীজহার : হেক্টর প্রতি ৭-১০ কেজি বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করতে হয়।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি হারে টিএসপি সার দিতে হয়। প্রথমবার চাষ করলে সেন্ট্রোসেমা ঠিকমতো তৈরি হতে ৩-৪ মাস সময় লাগে। পরবর্তী সময়ে বারে বারে কেটে খাওয়ানো যায়। বছরে ৪-৫ বার কেটে খাওয়ানো যায়।

ফলন : প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ টন সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। মাটি থেকে ১৫-২০ সেন্টিমিটার উপর থেকে কাটলে গাছ পুনরায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সেন্ট্রোসেমা জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে সেন্ট্রোসেমায় ১৭-১৮% ক্রুড আমিষ থাকে।

বারশিম *(Trifolium alexandernum)*

বারশিম শীত মৌসুমের এক ঋতুর লেগ্যুম। বারশিম এক ঋতুর শুঁটি হলেও এক ঋতুতেই ৪-৫ বার কেটে খাওয়ানো যায়। মিশর বারশিমের উৎপত্তিস্থল।

মৌসুম : শীতকালে যখন তাপমাত্রা ১৫°-১৮° সেঃ তাপমাত্রা না হলে বারশিম বীজ হয় না। বীজ হলেও বীজ ক্যারিওপসিস হয় না। ফলে বীজ বন্ধ্যা হয়। বারশিম চাষের জন্য সেচের প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি হারে টিএসপি সার দিতে হয়।

বীজ হার : হেক্টর প্রতি ২০-২৫ কেজি বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়। সেচের পানিতেই বারশিমের বীজ ছিটিয়ে দিতে হয়। পরে বীজসহ পানি মাটির সাথে লেগে যাবে এবং ৩-৪ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়। বারশিমের জমিতে ১৫-২০ দিন পর পর সেচ দেওয়ার দরকার পড়ে।

ফসল কাটা : বপনের ৫০-৬০ দিনের পর প্রথম কাটার উপযুক্ত হয়, এর পরে ২২-২৫ দিন পর পর কেটে খাওয়ানো যায়। বারশিম কাটার সময় মাটির উপর ৪০-৪৫ মিমি. রেখে কাটলে পরবর্তী কাটিং-এর জন্য গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ফলন : হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ টন সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে বারশিম ১৭-১৮% স্থূল আমিষ পাওয়া যায়।

ল্যাবল্যাব শিম *(Lablab purpurens)*

জলবায়ু : ল্যাবল্যাব শিম গ্রীষ্মঋতুর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ লেগ্যুম। ল্যাবল্যাব রংগি (rongai) জাত গোমটর প্রতিস্থাপক হিসেবে এখন চাষ করা হয় কারণ শিম চরিয়ে খাওয়ানো যায় এবং শরৎ ঋতু পর্যন্ত। এই জাতের শুটির শিকড়, কাণ্ড এবং পাতা বিনরাস্ট (bean rust) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ : জমিতে ৪-৫ বার চাষ দিয়ে হেক্টর প্রতি ১০০-১২০ কেজি টিএসপি সার দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরি করতে হয়।

বীজহার : হেক্টর প্রতি ১০-১৫ কেজি বীজ সারি করে বপন করতে হয়। ছিটিয়েও বীজ বোনা যায়। তবে এক্ষেত্রে বীজের প্রয়োজন হেক্টর প্রতি ২০-২৫ কেজি।

বীজ বপন সময় : সাধারণত বর্ষার প্রথমার্ধে শিমের বীজ বপন করার সময়। বীজ বোনার অল্পদিনের মধ্যে শিম সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে যায় এবং গাঢ় ঘন সবুজ উদ্ভিদে ঢেকে যায়। শিম দ্রুত বর্ধনশীল লেগ্যুম।

ফলন : হেক্টর প্রতি ৭০-৮০ টন সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। শিম দ্রুত রেটুন হয় এবং প্রথম চাষের চেয়ে রেটুনের ফলন কোনো অংশে কম হয় না। সবুজ গাঢ় ঘন উদ্ভিদ হওয়ায় শিম পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে কারণে কাটার পূর্বে ১৫-২০ দিন পর পর কীটনাশক স্প্রে করা প্রয়োজন।

এরাকিস *(Arachis sp.)*

ফরেজ পিনাট (forage peanut) বর্তমান সময়ের একটি অতি উত্তম শুঁটি বা লেগ্যুম। বাগানেও এ জাতের শুটি চাষ করা যায়।

জলবায়ু : এ জাতের শুঁটি বহুবর্ষজীবী। গরমকালে চাষ করতে হয়। প্রায় সব প্রকারের মাটিতে চাষযোগ্য। ১০০০-১৫০০ মিমি. বৃষ্টিপাত হয় এমন অঞ্চলে চাষ করা যায়, তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

বীজ বপন সময় : এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত এ জাতের শুঁটি বোনা যায়। হেক্টর প্রতি ১৫-২০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ ২-৩ সেন্টিমিটার মাটির নিচে বপন করতে হয়। এরাকিস ধাবকের সাহায্যে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং খুব কম সময়ে সমস্ত মাঠ ভরে যায়।

ফসল সংগ্রহ : বপনের ২-৩ মাসে মধ্যে ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার বড় হয় এবং বছরে ৩-৪ বার কেটে খাওয়ানো যায়। একবার চাষ করলে ৫-৬ বছর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

ফলন : বছরে হেক্টর প্রতি ৭০-৮০ টন সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। এই জাতের শুঁটিতে ১৯% পর্যন্ত স্থূল প্রোটিন পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ছায়াযুক্ত স্থানে, বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগানে এই জাতের শুঁটি চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

ডাল ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

১. ডাল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ১৫-৩০% বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব। তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে সীমিত জমি থেকে অধিক ফলন লাভের জন্য উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারকে বর্তমানে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে সরকারিভাবে যে উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয় তার পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত যা প্রধান প্রধান ফসল যথা- ধান, পাট, গম, তেলবীজ ও গোলআলুর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪%, ১৬%, ২২%, ৩% ও ৫% মাত্র। এসব ফসলের চাহিদাকৃত বাকি বীজ ছাড়াও সব বছর ধরে চাষের আওতায় শাক-সবজিসহ অন্যান্য ৮০-৯০টি ফসলের প্রায় সব বীজই চাষীরা নিজেদের উৎপাদিত ফসল থেকে সংরক্ষণ করে। চাষীদের নিজস্ব উৎপাদিত বীজ চাষী পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষিত হয় না বলে এগুলোর গুণগত মানও ভাল হয় না। ফলে চাষীদের সংরক্ষিত বীজ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ফলনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকে না। দেশে উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য স্বল্প পরিসরে বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। তাই ফসল উৎপাদনের জন্য চাষীদের নিজস্ব উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বীজের মান উন্নত করা গেলে চাষীদের সংরক্ষিত বীজ দ্বারা আবাদকৃত ফসল থেকে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক ফলন লাভ করা সম্ভব।

২. বীজ উৎপাদন পর্যায়

স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও উৎপাদিত বীজ পরবর্তী মৌসুমে ব্যবহারের পূর্ব পর্যন্ত তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণের জন্য বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের জন্য দুটি পর্যায় হয়-

(১) মাঠ পর্যায়ের (Field operation) এবং

(২) বীজ ফসল কর্তন পরবর্তী পর্যায়ে (Post Harvest Technology) কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বা প্রযুক্তিগত নিয়ম নীতি মেনে চলা প্রয়োজন।

বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের উদ্দেশ্যে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিচে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

মাঠ পর্যায়ে মাঠ নির্বাচন : উন্নত জাতের ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের জন্য জমি নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেসব জমিতে ভাল ফসল উৎপাদন হয় সেসব জমি বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট। আলো বাতাস পাওয়া যায় এমন জমি ডাল ফসল উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করা দরকার। কোনো জমিতে একটি ফসল আবাদ করা হয়ে থাকলে পরবর্তী মৌসুমে সেই একই ফসল সে জমিতে চাষ করা উচিত নয়। বীজ ফসল

আবাদের জন্য নির্বাচিত কোনো জমিতে পূর্ববর্তী মৌসুমে আবাদকৃত ফসল রোগ-বালাই বা পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকলে সে জমি ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়।

জাত নির্বাচন : ডাল ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় চাষাবাদের জন্য সুপারিশকৃত উচ্চ ফলনশীল ডাল জাতের ফসল নির্বাচন করতে হবে। জানা-শোনা বীজ ডিলার বা দোকান থেকে ট্যাগযুক্ত প্রত্যয়িত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। মানসম্পন্ন উপায়ে নিজেদের উৎপাদিত ও সংরক্ষিত বীজও বীজ ফসল আবাদের জন্য ব্যবহার করা যায়।

সময়মতো বপন ও রোপণ : জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিশ অনুসারে ফসলের জীবনকালের প্রতি খেয়াল রেখে সময়মতো ফসল বপন ও রোপণ করা দরকার। অবশ্য স্থানীয় জাতের ফসলের বপন ও রোপণ কাল চাষীগণ তাদের নিজেদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে স্থির করা যায়। অধিক ফলন লাভের জন্য ডাল বীজ ফসল সময়মতো বপন ও রোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাল বীজ বপনের পূর্বে অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বীজ শোধন করে নেওয়া ভাল।

পৃথকীকরণ দূরত্ব : পরপরাগায়নশীল কোনো উন্নত জাত যাতে অন্য কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত জাত দ্বারা পরপরাগায়নের মাধ্যমে নিজস্ব গুণাগুণ ও স্বকীয়তা না হারায় সে জন্য ডাল বীজ ফসল চাষ করার সময় অনাকাঙ্ক্ষিত জাত থেকে পৃথকীকরণ দূরত্ব রেখে চাষ করা প্রয়োজন। পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের সাথে পরামর্শ করে একই জাতের বীজ ফসল ব্লক আকারে চাষ করে পরপরাগায়নের সমস্যা সমাধান করা যায়। অনেক ফসল আগাম বা দেরিতে চাষ করেও পরপরাগায়ন এড়িয়ে চলা সম্ভব, কারণ সে সময় মাঠে সাধারণত ফসল চাষ করা হয় না।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা : অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন আগাছা পরিষ্কারকরণ ও রোগ-বালাই দমন ডাল বীজ ফসল উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোনো ফসল বীজবাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হলে সে ফসল হতে সংগৃহীত বীজ পরবর্তী মৌসুমে ফসল আবাদের জন্য ব্যবহার করা হলে তা মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। সে জন্য বপনের পূর্বে অনুমোদিত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বীজ শোধন করে নেয়া প্রয়োজন।

অজাত বাছাই : আবাদকৃত জাতের বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান ঠিক রাখার জন্য অজাত বাছাই করা প্রয়োজন। ফসল বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে অজাত বাছাই করা যায়। ফসলের চারা বা গাছ বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত জাতের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে অজাত বাছাই করতে হয়।

ডাল সঠিক সময়ে ফসল কর্তন : বীজ ফসল সঠিক সময়ে কর্তন না করা হলে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়, যেমন অপরিপক্ব ফসল থেকে সংগৃহীত সকল দানা বীজ হিসেবে উপযুক্ত নাও হতে পারে। অপর দিকে ফসল দেরিতে কর্তনের ফলে দানা ঝরে গিয়ে উৎপাদিত বীজের পরিমাণ কমে যেতে পারে। বেশি পরিপক্ব হলে বা দেরিতে ফসল কর্তনের ফলে বীজ নিম্ন মানের হতে পারে।

৩. ফসল কর্তন পরবর্তী পর্যায়ে করণীয়

বীজ ফসল মাড়াই : মাটি থেকে বীজ যাতে আদ্রতা শুষে নিতে না পারে সে জন্য পাকা মেঝে বা পলিথিন ত্রিপল আচ্ছাদিত মেঝেতে বীজ ফসল মাড়াই করা ভাল। আধুনিক বীজ

মাড়াই যন্ত্রের দ্বারা ভাল বীজ ফসল মাড়াই করলে বীজের গুণগতমান ভাল হয়। ফসল কর্তনের পর ৩/৪ দিনের মধ্যে মাড়াই করা উত্তম। বীজের পরিমাণ কম হলে হাত দ্বারা বীজ সংগ্রহ করলে বীজের গুণাগুণ ভাল থাকে। মেঝেতে বীজ ফসল মাড়াই করার সময় যাতে অন্য জাতের বীজের সাথে মিশ্রিত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বীজ ঝাড়াই ও শুকানো : সংগৃহীত বীজ ভালভাবে ঝাড়াই করে অপরিপক্ক বীজ, অ-বীজ, রোগাক্রান্ত বীজ এবং, খড়-কুটা ধুলা-বালি ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হয়। সংগৃহিত বীজ কয়েকবার রোদে শুকাতে হবে যাতে বীজের আদ্রতার পরিমাণ নিম্ন পর্যায়ে থাকে।

বীজ বাছাই : বীজের আকার বা ছোট বড় বীজের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য বীজ বাছাই করা ভাল। বড় আকারের বীজ ক্রেতা সাধারণ পছন্দ করে। তাছাড়া বড় আকারের বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশি থাকে। ছোট আকারের বীজ থেকে অঙ্কুরিত চারা দুর্বল হয়ে অকালে মরে যেতে পারে।

৪. বীজ সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ

বীজ ফসল কর্তন হতে পরবর্তী মৌসুমে বপনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করতে না পারলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ঠিক থাকে না। সে জন্য বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজ রাখার পাত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীজের গুণাগুণ সঠিক পর্যায়ে রাখার জন্য বীজ সংগ্রহ হতে পরবর্তী মৌসুমে বীজ বপনের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে বীজ সংরক্ষণের উপর কড়া নজর রাখা প্রয়োজন।

(ক) বীজ ফসল কর্তন হতে মাড়াই পর্যন্ত;

(খ) বীজ সংরক্ষণের গুদাম পাত্র;

(গ) বীজ পরিবহনের সময় রেল, স্টিমার, গাড়ী সাময়িকভাবে বীজ ডিলারের দোকানে বীজ রাখা,

(ঘ) বীজ বপনের পূর্ব পর্যন্ত চাষীর বাড়িতে বীজ রাখা।

সাবধানতা অবলম্বন না করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে এবং সর্বোপরি বীজের গুণাগুণ কমে যায়।

সংরক্ষিত বীজ মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করা : বীজ সংরক্ষণের গুদাম বা পাত্র মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয়– যাতে সংরক্ষিত বীজের আর্দ্রতা বেড়ে গেলে বা বীজ পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। বীজের আর্দ্রতা বাড়তে দেখা গেলে বীজ রোদে শুকিয়ে নিতে হয়।

ভাল ফসলে জীবাণু সার ও তার ব্যবহার পদ্ধতি : জীবাণু যখন মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর নিমিত্তে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে জীবাণু সার বলা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি : দু'রকমভাবে জীবাণু সার ব্যবহার করা হয়; যথা–

(১) প্রথমে আঠালো তরল বস্তু (যেমন-চিটা গুড়, ভাতের মাড়) জীবাণু সারের সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে পরিমাণমতো বীজ এই আঠালো দ্রবণে মিশানো হয়। এতে জীবাণু বীজাবরণের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। তরল বস্তুটির পরিমাণ

বেশি হয়ে গেলে বীজ ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিয়ে জমিতে বপন করা হয়। জীবাণু সার মিশানো বীজ রোদে শুকানো উচিত নয়, কারণ এতে জীবাণু সার উবে যায়।

(২) এ পদ্ধতিতে প্রথমে বীজ চিটাগুড়ের সাথে মেশানো হয় এবং পরে জীবাণু সার চিটাগুড় মিশ্রিত লালচে বীজে মেশানো হয়। পদ্ধতিটি সহজতর ও সুবিধাজনক বিধায় এক কেজি মুগ বীজের জন্য এর বিভিন্ন ধাপ পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো:

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

(১) বীজ : সুস্থ সতেজ ও শুকনো ১ (এক) কেজি।

(২) চিটাগুড় : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩ থেকে ৫% বড় বীজ ২ থেকে ৩%)

(৩) জীবাণু সার : ২০ থেকে ৫০ গ্রাম (ছোট বীজে ৩ থেকে ৫% বড় বীজে ২ থেকে ৩%)।

(৪) পলিথিন ব্যাগ/গামলা/ছোট বালতি : ১টি।

(৫) পরিবেশ রোদবিহীন/ছায়াময় পরিবেশ।

ব্যবহার পদ্ধতি

(১) পলিথিন ব্যাগে ১ কেজি বীজে ৫০ গ্রাম চিটাগুড় মিশিয়ে নিতে হয়।

(২) চিটাগুড়ের অভাবে ভাতের ঠাণ্ডা মাড় ব্যবহার করা যায়।

(৩) আঠালো বীজগুলোর সাথে জীবাণু সার ঢেলে ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হয়– যাতে বীজে একটি কালো প্রলেপ পড়ে যায়।

(৪) প্রথম বার অর্ধেক জীবাণু সার দিয়ে মিশিয়ে অবশিষ্ট জীবাণু সার দ্বিতীয় বার মিশালে মিশ্রণ ভাল হয়।

(৫) এতে বীজে কালো প্রলেপ সমভাবে পড়ে।

(৬) জীবাণু সার মিশানো বীজ দলা হয়ে থাকলে ছায়ায় সামান্য শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজগুলো গায়ে গায়ে লেগে না থাকে।

(৭) বেশি শুকালে বীজ থেকে জীবাণু সার পড়ে যায় এবং বীজ প্রতি জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়।

(৮) জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রোদহীন বা খুব অল্প রোদে বপন করতে হয় এবং সাথে সাথে বপনকৃত বীজগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

(৯) ঠাণ্ডা, শুষ্ক ও রোদমুক্ত স্থানে জীবাণু সার মিশ্রিত বীজ রাখতে হয়।

(১০) কীটনাশক বা রোগনাশক ওষুধ মিশ্রিত বীজে জীবাণু সার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়, তবে উক্ত বীজ ভালভাবে ধুয়ে জীবাণু সার ব্যবহার করা যায়।

(১১) জীবাণু সার উৎপাদনের ৯০ দিনের মধ্যে তা ব্যবহার করতে হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

ডাল ফসলের আয়-ব্যয়

কৃষিক্ষেত্রে প্রতিটি ফসল চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানা থাকলে সেগুলোর উৎপাদন সুবিধাজনকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর। এজন্য এ অধ্যায়ে ছয়টি ডাল ফসল চাষের আয়-ব্যয়ের সংশ্লিষ্ট তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

১. ফসলের নাম : মাশকলাই (গ্রীষ্মকালীন)

শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার ৫০.০০ টাকা	ব্যয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
হাল	৮	গরু	১০০	৮০০	
হাল চাষ	৮	চাষকারী	৬০	৪৮০	
জমি চাষ বিন্যাস	২	নালা আইল	৪০	৮০	
সার প্রয়োগ	৪	ছিটানো	৫০	২০০	
বীজ বপন	১	ছিটানো	৫০	৫০	
ওষুধ প্রয়োগ	২	ছিটানো	৬০	১২০	
পরিচর্যা	৬	নিড়ানি	৪৫	২৭০	
পানি সেচ	০	০	০		
পরিবহন	২	০	৬০	১২০	
প্রক্রিয়াকরণ	৩	০	৫০	১৫০	
বিবিধ	২	০	৫০	১০০	
মোট	৩৮	০	৫৬৫	২৩৭০	

তুলনামূলক ব্যয় (টাকা)		
ব্যয় খাত	সাধারণ পদ্ধতি	উন্নত পদ্ধতি
জমি চাষ ও বিন্যাস	১৩৬০	১৭২০
উপকরণ প্রয়োগ	৩৭০	৪৫০
পরিচর্যা পরিবহন, ইত্যাদি	৬৪০	৭৫০
বিবিধ	১০০	২০০
মোট	২৪৭০	৩১২০

উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হর (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
বীজ	৪০		৩০	১২০০	
সার					
ইউরিয়া	২০		৬	১২০	
অ্যামোসালফেট	-	-	-	-	
টিএসপি	৫০		৮	৪০০	
এসএসপি					
এমপি	৩০		১০	৩০০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তাসার					
বোরন সার					
ডলোচুন	৩০০		৪	১২০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট					
খৈল					
বিবিধ					
অণুজীব সার					
কীটনাশক	৩		৬০	১৮০	
রোগনাশক	২		৫০	১০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি					
অন্যান্য সার					
মোট					

উপকরণ ব্যয় = সাধারণ পদ্ধতি : ৩৫০০.০০ টাকা
= উন্নত পদ্ধতি : ৪৫০০.০০ টাকা।

মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	বিবরণ	হর (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				৯৫০	
বেতন				১৩০০	
ভাতা				৫০০	

ডেপ্রিসিয়েশন				৬০০	
আকস্মিক ব্যয়				১০০	
ট্যাক্স				৪০	
ফি					
ইজারা				৯০	
চিকিৎসা					
বিবিধ					
অন্যান্য				১৫০	
মোট					

মোট আয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা/কেজি)	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	৮০০		২০	১৬,০০০	
উপদ্রব্য	১৫০০		.৫০	৭৫০	
অন্যান্য					
মোট				১৬,৭৫০	

মূলধন ব্যয়

সাধারণ পদ্ধতি : ৩,৭৩০.০০ টাকা

উন্নত পদ্ধতি : ৪,৩২০.০০ টাকা

আয়

সাধারণ পদ্ধতি : ১৬,৭৫০.০০ টাকা

উন্নত পদ্ধতি : ২১,৫০০.০০ টাকা

মোট ব্যয়

সাধারণ পদ্ধতি : ৯,৭০০.০০ টাকা

উন্নত পদ্ধতি : ১১,৬৪০.০০ টাকা

গ্রস আয়

সাধারণ পদ্ধতি : ৭,০৫০ টাকা

উন্নত পদ্ধতি : ৯,৮৬০.০০ টাকা

প্রকৃত আয়

গ্রস আয় − (ঝুঁকি % + গৃহস্থ ব্যয়)

উদাহরণ

৫,০০০.০০ টাকা

৭,০০০.০০ টাকা

মাসিক আয় ÷ (৫ বা ৬) মাস

২. ফসল : অড়হর

শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার/দিন (টাকা)	ব্যয় টাকা (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
হাল	১০	হালা	৬০	৬০০	
হাল চাষ	১০	চাষী	৫০	৫০০	
জমি বিন্যাস	৫		৫০	২৫০	
সার প্রয়োগ	৫		৬০	৩০০	
বীজ বপন	৩		৬০	১৮০	
ওষুধ প্রয়োগ	২		৫০	১০০	
পরিচর্যা	৮		৫০	৪০০	
পানি সেচ	৩		৫০	১৫০	
পরিবহন	৪		৬০	২৪০	
প্রক্রিয়াকরণ	৩		৪০	১২০	মহিলা
বিবিধ	২		৫০	১০০	
মোট	৫৫		৫৮০	২৯৪০	

উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা/কেজি)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
বীজ	১৫		৩০	৪৫০	
সার					
ইউরিয়া	৫০		৭	৩৫০	
অ্যামোসালফেট					
টিএসপি	৭০		১০	৭০০	
এসএসপি					
এমপি	৩০		১০	৩০০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তাসার	৫		৩০	১৫০	
বোরন সার					
ডলোচুন	৩০০		৪	১২০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট					

জিংক					
বিবিধ					
অণুজীব সার					
কীটনাশক	৬			৬০০	
রোগনাশক	৫			৫০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি	৬			৬০০	
অন্যান্য সার					
মোট					

মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				১০০০	
বেতন				১০০০	
ভাড়া				৭০০	
ডেপ্রিসিয়েশন				৩০০	
আকস্মিক ব্যয়				১০০	
ট্যাক্স				১৫০	
ফি					
ইজারা				২০০	
চিকিৎসা				১০০	
বিবিধ					
অন্যান্য				১০০	
মোট					

মোট আয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	১২০০		২০	২৪০০	
উপদ্রব্য	৩০০০		০.৫০	১৫০০	খড়ি
অন্যান্য					
মোট				২৫,৫০০	

৩. ফসলের নাম : মুগ কলাই

শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার/দিন (টাকা)	ব্যয় টাকা (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
হাল	১৩		৫০	৬৫০	
হাল চাষ	১৩		৫০	৬৫০	
জমি বিন্যাস	৩		৫০	১৫০	
সার প্রয়োগ	২		৫০	১০০	
বীজ বপন	৩		৫০	১৫০	
ওষুধ প্রয়োগ	৩		৫০	১৫০	
পরিচর্যা	১০		৪০	৪০০	
পানি সেচ					
পরিবহন	২		৬০	১০০	
প্রক্রিয়াকরণ	৫		৪০	২০০	
বিবিধ	৩			১৫০	
মোট	৫৭		৪৪০	২৭০০	

উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
চারা	৪০ আঁটি		২৫	১০০০	
সার					
ইউরিয়া	৪০		৬	২৪০	
অ্যামোনিয়াম সালফেট					
টিএসপি	৪০		১০	৪০০	
এসএসপি					
এমপি	৩০		১০	৩০০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তা সার					
বোরন সার					
ডলোচুন	৩০০		৪	১২০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট	২৫০		৪	১০০০	

তৈল					
বিবিধ					
জীবাণু সার					
কীটনাশক	৬ কেজি			৭০০	
রোগনাশক	৩ কেজি			৩০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি				৩০০	
অন্যান্য সার					
মোট				৫০২০	

মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				৯৫০	
বেতন				১৩০০	
ভাতা				৮০০	
ডেপ্রিসিয়েশন				১৫০	
আকস্মিক ব্যয়				১০০	
ট্যাক্স				৫০	
ফি					
ইজারা				১৫০	
চিকিৎসা				১৫০	
বিবিধ					
অন্যান্য				১০০	
মোট				৩৭৫০	

মোট আয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	৯৫০		৩০	২৮,৫০০	
উপদ্রব্য	১,৫০০		১	১,৫০০	
অন্যান্য					
মোট					

৪. ফসলের নাম : মশুর

শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার ৫০.০০ টাকা (টাকা/কেজি)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
হাল	১৭		৫০	৮৫০	
হাল চাষ	১৭		৫০	৮৫০	
জমি বিন্যাস	৩		৫০	১৫০	
সার প্রয়োগ	৩		৫০	১৫০	
ওষুধ প্রয়োগ	২		৫০	১০০	
পরিচর্যা	১০		৪০	৪০০	
পানি সেচ					
পরিবহন	৪			১০০	
প্রক্রিয়াকরণ	৪			১৫০	
বিবিধ	৪			১০০	
মোট	৬৪			২৮৫০	

উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
বীজ	২০		৩০	৬০০	
সার					
ইউরিয়া	৪০		৭	২৮০	
অ্যামোসালফেট					
টিএসপি	৬০		১০	৬০০	
এসএসপি					
এমপি	২৫		১০	২৫০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তা সার					
বোরন সার					
ডলো চুন	৩০০		৪	১২০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট	২০০		৫		
খৈল					

বিবিধ					
অণুজীব সার	১০০ গ্রাম			১০০	
কীটনাশক	৬ কেজি			৬০০	
রোগনাশক	৫ কেজি			৪০০	
আগাছা নাশক					
হরমোন					
[illegible]					
অন্যান্য দ্রব্য				১০০	
মোট					

মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধনের সুদ				৮০০	
[illegible]				৯০০	
[illegible]				৬০০	
ডেপ্রিসিয়েশন				৩০০	
যান্ত্রিক ব্যয়				১০০	
[illegible]				৫০	
[illegible]					
[illegible]				১৫০	
চিকিৎসা					
বিবিধ					
অন্যান্য				২০০	
মোট					

মোট আয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	৮০০ কেজি		২৫	২০,০০০	
উপদ্রব্য	১,৫০০ কেজি		৫০	৭৫০	
অন্যান্য					
মোট					

৫. ফসলের নাম : ছোলা (একক ফসল)

শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার ৫০ টাকা	ব্যয় টাকা (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
হাল	১২		৫০	৬০০	
হাল চাষ	১২		৫০	৬০০	
জমি বিন্যাস	৩			১৫০	
সার প্রয়োগ	৪		৪০	২০০	
বীজ বপন	২			১০০	
ওষুধ প্রয়োগ	২			১৫০	
পরিচর্যা	১৫		৪০	৬০০	
পানি সেচ	৪			২০০	
পরিবহন	২		৬০	১২০	
প্রক্রিয়াকরণ	৬		৪০	২৪০	
বিবিধ	৪			৩০০	
মোট					

উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	ব্যয় টাকা	মন্তব্য
বীজ	৫০		৩০	৩,০০০	
সার					
ইউরিয়া	৩০		৭	২১০	
অ্যামোসালফেট					
টিএসপি	৪০		১০	৪০০	
এসএসপি					
এমপি	২০		১০	২০০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তা সার					
বোরন সার				১০০	
ডলোচুন	৩০০		৪	১২০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট গুড়া	১০০		৫	৫০০	
খৈল					

বিবিধ					
জীবাণু সার					
কীটনাশক	৫		৬০	৩০০	
রোগনাশক	৮		৫০	৪০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি সেচ					
অন্যান্য সার					
মোট					

মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধনে সুদ				৬০০	
বেতন				১১০০	
ভাড়া				৯০০	
ডেপ্রিসিয়েশন				৪৫০	
আকস্মিক ব্যয়				৩০০	
ট্যাক্স				৫০	
ছি				২০০	
ইঁদুর				১৫০	
চিকিৎসা				১৫০	
বিবিধ				১০০	
অন্যান্য					
মোট					

মোট আয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	১৩০০		২০	২৬,০০০	
উপদ্রব্য	১৫০০	২	.০৫	৭৫০	
অন্যান্য					
মোট					

৬. **ফসলের নাম : খেশারি (একক ফসল)**

শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার ৫০.০০ (টাকা)	ব্যয় টাকা (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
হাল	৭		৫০	৩৫০	
হাল চাষ	৭		৫০	৩৫০	
জমি বিন্যাস					
সার প্রয়োগ	৩		৫০	১৫০	
বীজ বপন	২		৫০	১০০	
ওষুধ প্রয়োগ	২		৫০	১০০	
পরিচর্যা	৮		৪০	৩২০	
পানি সেচ	—				
পরিবহন	৬			৩০০	
প্রক্রিয়াকরণ	৫			২৫০	
বিবিধ	৬			৩০০	
মোট					

উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
বীজ	৫০		৩০	১৫০০	
সার					
ইউরিয়া	৩০		৭	২১০	
অ্যামোসালফেট					
টিএসপি	৪০		১০	৪০০	
এসএসপি					
এমপি	২০		১০	২০০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তা সার					
বোরন সার					
ডলোচুন	৩০০		৪	১২০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট					
খৈল					

বিবিধ					
অণুজীব সার	[illegible]			২০০	
কীটনাশক	৪			৪০০	
রোগনাশক	৩			৩০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি সেচ					
অন্যান্য সার					
মোট					

মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				৯০০	
বেতন				১২০০	
ভাতা				৯০০	
ডেপ্রিসিয়েশন				৪০০	
অনিশ্চিত ব্যয়				৩০০	
ট্যাক্স				৫০	
ফি					
ইজারা				২০০	
চিকিৎসা				১০০	
বিবিধ				১০০	
অন্যান্য				২০০	
মোট					

মোট আয়					
বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	১০০০		১৫	১৫,০০০	
উপদ্রব্য	৩,০০০	১		৩,০০০	
অন্যান্য					
মোট					

অষ্টাদশ অধ্যায়

ডালজাতীয় ফসলের আন্তঃফসল

মুগ/মাসকালাই + তুলা আন্তফসল

দীর্ঘ মেয়াদী ফসল এর সাথী ফসল হিসেবে অনায়াসে মুগ বা মাসকালাই উৎপাদন করা হয়। তুলাবীজ গজানোর পর থেকে প্রথম ৬০-৭০ দিন পর্যন্ত চারা গাছের বৃদ্ধি মন্থর থাকে, শাখা-প্রশাখা ছড়ায় না তাই তুলার দুই সারির মাঝে মুগ/মাসকালাই চাষাবাদ করে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

প্রযুক্তি এলাকা	রংপুর, যশোহর, দিনাজপুর ও তুলা উৎপাদন এলাকা
জাত ও তুলা মুগ মাসকালাই	রূপালি কান্তি/বারি মুগ-৩/বারিমুগ-৪ বারিমাস-২/বারিমাস-৩
জমি নির্বাচন ও তৈরি	১. উঁচু ও সমতল দোআঁশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উত্তম খরিপ মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ২. মাটিতে জো থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হবে। ৩. চাষের পর মই দিয়ে মাটি সমান করে দিতে হবে।
বপন সময়	মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র অগাস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ .
বীজের তুলা হার মুগ/মাস	১০ কেজি/হেক্টর ৮ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের ৩৩%)
বীজ শোধন	তুলার বীজ বপনের আগে ২-৩ ঘন্টার পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর শুকনা বালি অথবা গোবর দ্বারা ঘসে তুলার আঁশ ছড়িয়ে দিতে হবে।
বপন পদ্ধতি	১. প্রচলিত পদ্ধতিতে তুলা বপন করে তার মাঝে এক সারি মুগ অথবা মাসকালাই বপন করতে হবে ২. তুলার সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার ৩. এছাড়া ২ জোড়া সারি তুলার মাঝে ২ সারি মুগ/মাসকালাই বপন করতে হবে। ৪. মুগ/মাসকালাইয়ের সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টিমিটার ৫. দ্বিতীয় পদ্ধতিতে তুলার গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৩০ সেন্টিমিটার।
সারের পরিমাণ	ইউরিয়া : ১৯০-২১০ কেজি/হেক্টর টিএসপি : ১০০-১২০ কেজি/হেক্টর এমপি : ৯০-১১০ কেজি/হেক্টর জিপসাম . ১০০-১২০ কেজি/হেক্টর
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	১. সমুদয় টিএসপি, এমপি ও জিপসাম ও ১/৩ অংশ ইউরিয়া দুভাগ করে বপনের ৩০ ও ৫০ দিন পর তুলার সারির পাশে প্রয়োগ করতে হবে। ২. মাসকালাই/মুগে উপরি সারের প্রয়োজন হয় না
সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা	১. তুলা চারা গজানোর পর প্রতি গুছিতে ১টি সুস্থ গাছ রেখে বাকী গাছগুলো তুলে ফেলতে হবে। ২. ইউরিয়া সার প্রয়োগের আগে একবার আগাছা (২৫ দিন পর) দমন করতে হবে। ৩. জমিতে রস পর্যাপ্ত থাকলে উপরি ইউরিয়া সার প্রয়োগের সময় সেচের প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে খরা দেখা দিলে ১-২ বার সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল কর্তন সময় — তুলা মুগ ও মাসকালাই	মধ্য জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি শেষ সপ্তাহ (মাঘ থেকে মধ্য ফাল্গুন) মধ্য অক্টোবর থেকে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ (কার্তিকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)

ফলন	গম	২০০০ কেজি/হেক্টর
	মুগ	৮০০ কেজি/হেক্টর
	মাষকলাই	৯০০ কেজি/হেক্টর

ছোলা চাষ + গম আন্তঃফসল

বিদ্যমান পরিবেশে গম ছোলা মিশ্র ফসল হিসাবে উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সঠিক বপন পদ্ধতি ও সারের মাত্রা ব্যবহার করে আশাপ্রদ ফলন ও মুনাফা অর্জন সম্ভব। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র (বিএআরআই) ঈশ্বরদী প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

উপযুক্ত এলাকা		ঈশ্বরদী, রাজশাহী এবং যশোহর এর সেচবিহীন এলাকা।
জাত	গম	কাঞ্চন
	ছোলা	বারি ছোলা-২/বারিছোলা-৩/বারিছোলা-৪/বারিছোলা-৫/বারিছোলা-৬
জমি নির্বাচন ও তৈরি		১. মধ্যম উঁচু বেলে দোআঁশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত। ২. মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হবে। ৩. মই দিয়ে জমি সমান করে দিতে হবে।
বপনের সময়		মধ্য নভেম্বর থেকে শেষ সপ্তাহ (কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণের ৩য় সপ্তাহ)
বীজের হার	গম	৮০ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের ৬৭%)
	ছোলা	১০ কেজি/হেক্টর (২৫%)
বীজ শোধন		ভিটাভেক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম করে ব্যবহার করে বীজ শোধন করতে হবে।
বপন পদ্ধতি		১. দুই সারি গমের পর এক সারি ছোলা বপন করতে হবে ২. গমের সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ সেন্টিমিটার। ৩. বীজ বপনের গভীরতা মাটিতে প্রাপ্য রসের উপর নির্ভর করে।
সারের পরিমাণ		ইউরিয়া : ১২০-১৩৬ কেজি/হেক্টর টিএসপি : ৯৫-১০৫ কেজি/হেক্টর এমপি : ৪৫-৫০ কেজি/হেক্টর
সার প্রয়োগ পদ্ধতি		জমি তৈরির সময় শেষ চাষে সকল সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে
নিড়ানি		আগাছা বেশি হলে বীজ বপনের ২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে।
রোগ ও পোকা মাকড় দমন		ছোলায় পোকা দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।
ফসল সংগ্রহ	গম	মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য চৈত্র থেকে শেষ সপ্তাহ)।
	ছোলা	মধ্য মার্চ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)।
ফলন	গম	৩০০০ কেজি/হেক্টর
	ছোলা	৭০০ কেজি/হেক্টর

BANSDOC Library Dhaka

ছোলা মশুর + তামাক আন্তঃফসল

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদীতে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। এই পদ্ধতিতে তামাকের দুই সারির মাঝে ছোলা বা মশুর চাষ করে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়।

উপযুক্ত এলাকা		কুষ্টিয়া, রংপুর, ঈশ্বরদী ও অন্যান্য তামাক উৎপাদন এলাকা।
জাত	তামাক	ভার্জিনিয়া গোল্ড
	ছোলা	বারিছোলা-২/বারিছোলা-৪/বারিছোলা-৫/বারিছোলা-৬
	মশুর	বারিমশুর-২/বারিমশুর-৩/বারি মশুর-৪
জমি নির্বাচন ও তৈরি		১. মধ্যম উঁচু বেলে দোআঁশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত। ২. মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকার ভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হবে। ৩. চাষের পর মই দিয়ে মাটি সমান করে নিতে হবে
বপনের সময়		মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর (কার্তিক)

বীজের হার তামাক ছোলা মসুর	৫০০ গ্রাম/হেক্টর ২৫ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের ৫০%) ১৫ কেজি/হেক্টর
বপন পদ্ধতি	১. তামাকের জোড়া সারির মাঝে তিন সারি ছোলা বপন করতে হবে ২. ছোলার গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেন্টিমিটার হবে। ৩. তামাকের সারির দূরত্ব ৩৭.৫ সেন্টিমিটার (১৫ ইঞ্চি) এবং গাছের দূরত্ব হবে ৬০ সেন্টিমিটার (চিত্র ১৩ ক) ৪. মসুরের ক্ষেত্রে তামাকের জোড় সারির মাঝে শতকরা ৫০ ভাগ বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে (চিত্র ১৩)।
সারের পরিমাণ	ইউরিয়া : ১১০-১২০ কেজি/হেক্টর টিএসপি : ১০০-১২০ কেজি/হেক্টর এমপি : ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	১. এই পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া সার, সমুদয় টিএসপি, ও এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ২. বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সার রোপনের ৩০ দিন পর তামাকের সারির পাশে প্রয়োগ করতে হবে।
পরিচর্যা	১. তামাক চারা গজানোর পর প্রতিটি গুছিতে একটি সুস্থ গাছ রেখে বাকি গাছগুলো তুলে ফেলতে হবে। ২. ইউরিয়া সার প্রয়োগের আগে একবার আগাছা (২৫ দিন পর) দমন করতে হবে।
রোগ ও পোকা মাকড় দমন	তামাক গাছে অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।
ফসল কাটার সময় তামাক ছোলা মসুর	মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে (বৈশাখ) মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল (চৈত্র) মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল (চৈত্র)
ফলন তামাক ছোলা মসুর	১৪০০ কেজি/হেক্টর ৭০০ কেজি/হেক্টর ৬০০ কেজি/হেক্টর

ছোলা + ভুট্টা আন্তঃফসল

প্রযুক্তি এলাকা	জয়দেবপুর, জামালপুর, রংপুর-এর ভুট্টা আবাদ এলাকা।
জাত ভুট্টা ছোলা	বর্ণালি বারি ছোলা-২
বপনের সময়	নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ।
জমি ও মাটি	১. উঁচু, মাঝারি উঁচু বেলে দোআঁশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উত্তম। ২. মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হবে। ৩. চাষের পর মই দিয়ে মাটি সমান করে দিতে হবে।
বীজের হার ভুট্টা ছোলা	৩০ কেজি/হেক্টর ২০ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ)
বপন পদ্ধতি	১. ভুট্টার জোড়া সারির মাঝে ১৫০ সেন্টিমিটার দূরত্ব রেখে মধ্যবর্তী স্থানে চার সারি ছোলা বপন করতে হবে। ২. ছোলার সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১০ সেন্টিমিটার। ৩. ভুট্টার জোড়া সারির দূরত্ব ৩৭.৫ সেন্টিমিটার এবং গাছের দূরত্ব হবে ২৫ সেন্টিমিটার (চিত্র)। ৪. ভুট্টার স্বাভাবিক সারির ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্থানে দুই সারি ছোলা ও বপন করা যায় (চিত্র খ)।
সার কেজি/হেক্টর	ইউরিয়া : ২৩০-২৫৫ টিএসপি : ১৩০-১৩৫ এমপি : ৮০-৮৬ জিপসাম : ১৫০-১২০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	১. অর্ধেক ইউরিয়া, সমুদয় টিএসপি, এমপি এবং জিপসাম সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ২. বাকি ইউরিয়া সার দুভাগ করে বপনের ৩৫ ও ৬০ দিন পর ভুট্টা গাছের পাশে প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা	১. বীজ গজানোর ১৫ দিনের মধ্যে গোছা প্রতি একটি সুস্থ সবল ভুট্টার চারা রেখে বাকিগুলো কেটে বা তুলে ফেলতে হবে। ২. ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের আগে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ	ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পর দুবার অর্থাৎ ৩৫ ও ৬৫ দিন পর জমিতে সেচ দিতে হবে।
রোগ ও পোকা দমন	১. ভুট্টার মাজরা পোকা এবং ছোলার ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হয়। ২. প্রতি হেক্টর জমিতে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১.১২ মিলিলিটার ৫০০-১০০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৩. ছোলার সারিতে এক মিটারের মধ্যে ৫টি ক্ষতিগ্রস্থ ফল দিলে তখন রিপকর্ড ১০ ইসি ১ মিলিলিটার হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল কাটার সময় — ভুট্টা, ছোলা	এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহ (মধ্য চৈত্র থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)
ফলন — ভুট্টা	৪০০০-৫০০০ কেজি/হেক্টর
ফলন — ছোলা	৮০০-১০০০ কেজি/হেক্টর

ভুট্টার আন্তঃফসল হিসেবে খেসারি মটর + ভুট্টা আন্তঃফসল

আমন ধান কাটা হলে বা বন্যার পর কর্দমাক্ত জমিতে ভুট্টার বীজ বপন করতে হবে। তবে জমি বেশি কর্দমাক্ত না হলে লাঙ্গল এর সাহায্যে ৫-৮ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে জমির আগাছা শেওলা ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিতে হবে।

উপযোগী এলাকা	টাঙ্গাইল, যশোর, ফরিদপুর এবং বগুড়া এর ভুট্টা আবাদ এলাকা
জাত — ভুট্টা	বর্ণালী
জাত — খেসারি	বারি খেসারি-১/বারি খেসারি-২
জাত — মটর	স্থানীয়
জমি ও মাটি	বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর কর্দমাক্ত মধ্যম উঁচু জমিতে আবাদ করতে হয়।
বপনের সময়	মধ্য অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ (কার্তিক - মধ্য অগ্রহায়ণ
বীজের হার — ভুট্টা	৩০ কেজি/হেক্টর ১০০%
বীজের হার — খেসারি	৪৫ কেজি/হেক্টর ১০০%
বীজের হার — মটর	৪০ কেজি/হেক্টর ১০০%
বপন পদ্ধতি	১. ভুট্টার সারির দূরত্ব ৯০ সেন্টিমিটার এবং গাছের দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার। ২. দুই সারি ভুট্টার মাঝে ৩ সারি ৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে মটর বীজ বপন করতে হবে এবং খেসারির ক্ষেত্রে ২ সারি ভুট্টার মাঝে বীজ বপন করতে হবে
সার কেজি/হেক্টর	ইউরিয়া : ২১৫ টিএসপি : ১০০-১২০ এমপি : ৪০-৫৫ জিপসাম : ১১০-১৩০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	১. টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও অর্ধেক ইউরিয়া সার বপনের পূর্বে বীজের সারির পাশে দিতে হবে ২. বাকি ইউরিয়া বীজ গজানোর ৩০ ও ৬০ দিন পর ভুট্টা গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।
পরিচর্যা	ভুট্টার বীজ গজানোর ১৫-২০ দিন পর প্রতি গোছাতে একটি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে
ফসল কাটার সময় — ভুট্টা	ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ (মধ্য ফাল্গুন থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)
ফসল কাটার সময় — খেসারি মটর	মধ্য জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ (মাঘের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ)
ফলন — ভুট্টা	৩০০০-৫০০০ কেজি/হেক্টর
ফলন — খেসারি	৫০০-৬০০ কেজি/হেক্টর
ফলন — মটর	৭০০-৮০০ কেজি/হেক্টর

ভুট্টার আন্তঃফসল হিসেবে মুগ/মাসকালাই+ভুট্টা আন্তঃফসল

খরিপ মৌসুমে ভুট্টা একক ফসল হিসেবে আবাদ করতে কৃষকরা বেশি আগ্রহ দেখায় না। এছাড়া অতিবৃষ্টিতে ভুট্টার অনেক সময় ভালো ফলন পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে ভুট্টার সাথে মুগ/মাসকালাই আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে অন্তত একটি ফসল রক্ষা পেতে পারে।

প্রযুক্তি এলাকা	যশোর, জয়দেবপুর, রংপুর, কিশোরগঞ্জ এবং ঈশ্বরদী
জাত ভুট্টা মুগ মাসকালাই	বর্ণালি কান্তি, বারিমুগ-৩-বারিমুগ-৪ বারিমাস-১/বারিমাস-২, বারিমাস-৩
জমি ও মাটি	১. উঁচু, মাঝারি উঁচু বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম ২. পানি নিকাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ৩. বীজ বপনের আগে জমি প্রয়োজনীয় চাষ দিয়ে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে হবে।
বপনের সময়	মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল (চৈত্র মাস)
বপন পদ্ধতি	১. ভুট্টার জোড়া সারির মাঝে ১৫০ সেন্টিমিটার দূরত্ব রেখে মধ্যবর্তী স্থানে চার সারি মুগ/মাসকালাই বীজ বপন করতে হবে। ২. মাসকালাই/মুগ বপনে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং গাছের দূরত্ব ১০ সেন্টিমিটার। ৩. ভুট্টার জোড়া সারির দূরত্ব ৩৭.৫ সেন্টিমিটার এবং গাছের দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার। ৪. ভুট্টার স্বাভাবিক সারির ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্থানে দুই সারি মুগ/মাসকালাই বপন করতে হবে
সার কেজি/হেক্টর	ইউরিয়া : ২৫৫-২৬৫ টিএসপি : ১৩০-১৩৬ এমপি : ৮০-৮৬ জিপসাম : ১০০-১২০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	১. এই পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া, সমুদয় টিএসপি, এমপি, জিপসাম সার প্রয়োগ হবে। ২. বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বপনের ২৫ ও ৪৫ দিন পর ভুট্টা গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। ৩. মাসকালাই/মুগ ফসলে কোনো উপরি সারের প্রয়োজন হয় না।
আগাছা দমন ও অন্যান্য পরিচর্যা	১. ভুট্টার গাছ গজানোর পর প্রতি গোছাতে একটি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে ২. ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের আগে একবার আগাছা ২৫ দিন পর পরিষ্কার করতে হবে। ৩. ভুট্টা গাছের গোড়ার দুই পাশে অল্প পরিমাণে মাটি তুলে দিতে হবে এর ফলে বাতাসে বা বৃষ্টিতে গাছ হেলে পড়বে না এবং অতিরিক্ত পানি নালা দিয়ে সহজে বের হয়ে যাবে।
সেচ প্রয়োগ	১. খরিপ মৌসুমে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। ২. জমিতে রস কম থাকলে বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য হালকা সেচ দিতে হবে।
রোগ ও পোকা মাকড় দমন	১. ভুট্টার চারা অবস্থায় কাটুই পোকার আক্রমণ হলে হাত দিয়ে বেছে মেরে ফেলতে হবে। ২. এছাড়া মুগ/মাসকালাই-এ ফলছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হলে রিপকর্ড ১০ মিলিলিটার/১০ লিটার পানি হিসেবে স্প্রে করতে হবে।
ফসল কাটার সময় ভুট্টা মুগ মাসকালাই	মধ্য জুন থেকে জুন শেষ (আষাঢ়) মধ্য জুন থেকে শেষ জুন (আষাঢ়)
ফলন ভুট্টা খেসারি মটর	৪০০০-৫০০০ কেজি/হেক্টর ৫০০-৬০০ কেজি/হেক্টর ৭০০-৮০০ কেজি/হেক্টর

পরিশিষ্ট

উৎপাদন তথ্য : বাংলাদেশে ডাল উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
ফসল	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন))	একর	উৎপাদন (টন)
ছোলা	২০৯৭৮৫	৬১৪৮০	২০৮৫৫৫	৬১৪৮৫	২০৭৬২৫	৫৯৯০০
অড়হর	১৪২৬০	২৯৪০	১৪০১০	২৯২০	১৩৯৭৫	২৯৭০
মসুর	৫০৮৪৯৫	১৬৯৯৪৫	৫০৯৯০৫	১৭০৫০৫	৫০৮৪৭০	১৬২৭৭৫
মটর	৪৫৩৫০	১৪১৪৫	৪৫৫৬৫	১৪২৮৫	৪৫৫৭৫	১৪১৩০
মুগ	১৩৫৫৬৫	৩২০৭৫	১৩৬৩৫০	৩৩৭৮৫	১৩৫৮৬০	৩৪৪০৫
মাসকলাই	১৬০৩৯০	৫০২২৫	১৫৯৩৩৫	৫০২০০	১৫৮৭৬০	৪৮৫৬৫
খেসারি	৫৮৮৬১০	১৮১০৯৫	৫৬৬৯৯৫	১৭৮৬৭০	৫৫৮৪৯৫	১৮২৭৪৫
ফেলনকলাই	১০৪২৫	২৪২৫	১০৬৩৫	২৬৯৫	১১০৩৫	৩০১০
অন্যান্য	৪৮২৭৫	৯৬০০	৪৭০৪০	৮৯৪৫	৪৬৭৬০	৯০১৫
	১৭২১৩৫৫	৫২৩৯৩০	১৬৯৮৩৯০	৫২৩৪৯০	১৬৮৬৫৫৯	৫১৭৫১৫

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক বিবিধ রবি + খরিফ –১ ডাল উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
অঞ্চল	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	১২৫	৫০	১৩০	৫০	১৩০	৫০
চট্টগ্রাম	২১৪৫	৪৮০	২১৪৫	৪৮০	২০৭০	৪৫০
কুমিল্লা	৩২৫	১০০	৩৪৫	১১৫	৩৩০	৯৫
খাগড়াছড়ি	১০৫	২৫	১১০	২৫	১০০	১৫
নোয়াখালী	২০১৭০	৩৬০৫	১৯৫৪০	৩৩৬০	১৯৫৫৫	৩৩৪৫
রাঙ্গামাটি	৮০	৪০	৮০	৩৫	৮৫	৪০
সিলেট	৫০	১৫	-	-	-	-
ঢাকা	৮৫	১৫	৭৫	১৫	৭৫	২০
ফরিদপুর	৪৬০	১১০	৪৫৫	৯৫	৩৭০	৮০
জামালপুর	১৪০	৪৫	১৩৬	৪০	১৫৫	৫০
কিশোরগঞ্জ	-	-	-	-	-	-
ময়মনসিংহ	-	-	-	-	-	-

টাঙ্গাইল	২৫৫	৭৫	২৫৫	৭৫	২৮০	৮০
বরিশাল	১৮৪৮০	৩৬৭৫	১৭৯১৫	৩২৮০	১৭৭৯০	৩৪৫০
যশোর	৩৫০	১২৫	৩৯০	১৪০	৩৬৫	১২৫
খুলনা	৬৫	২৫	৭০	৩০	৭০	৩০
কুষ্টিয়া	১৭৫	৫৫	১৬৫	৫৫	১৯৫	৬০
পটুয়াখালি	৩৭৫৫	৭৯০	৩৭৩০	৭৮৫	৩৬৭০	৭৫০
বগুড়া	৩৬	১০	৩৫	১০	৩৬	১০
দিনাজপুর	৫০০	১০৫	৪৮৫	১০০	৫১৫	১১০
পাবনা	৬০০	১৫৫	৬১০	১৫৫	৬১৫	১৬০
রাজশাহী	১৫০	৩৫	১৪৫	৩৫	১২০	৩০
রংপুর	২২৫	৬৫	২৫৫	৬৫	২৩৫	৬৫
বাংলাদেশ	৪৮২৭৫	৯৬০০	৪৭০৪০	৮৯৪৫	৪৬৭৬০	৯০১৫

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক মটর ডাল উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
এলাকা	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	৩০	২০	২৫	১৫	৩০	২০
চট্টগ্রাম	২৭০	১২০	২৭৫	১২০	২৮০	১২০
কুমিল্লা	৪৩২০	১৭৬০	৪৩৭০	১৮৯০	৪৪১৫	১৮৯০
খাগড়াছড়ি	৪০	১০	৪০	১০	৪০	১০
নোয়াখালী	২৭৯০	৯৬০	২৭৯৫	৯৭৫	২৮১৫	১০২০
রাঙ্গামাটি	২৪০	৬৫	২৪৫	৬৫	২৪০	৬৫
সিলেট	-	-	-	-	(২.০৪)	(০.৪৫)
ঢাকা	৫৩৪৫	২০৪৫	৫৩৭৫	২০৬৫	৫২৭৫	২০৫০
ফরিদপুর	১৫২৪৫	৪৯২৫	১৫২৬০	৪৮৭০	১৫২৭৫	৪৭৫০
জামালপুর	২১৫	৭৫	২১০	৭৫	২০০	৭০
কিশোরগঞ্জ	১১১০	১৯৫	১১৭০	২০০	১১২০	১৯০
ময়মনসিংহ	৫৩০	১৬০	৫৪১	১৬৫	৫৯৫	১৮৫
টাঙ্গাইল	২৫৫	৯০	২৪৫	৮৫	২২৫	৭৫
বরিশাল	৭২৫	১৪০	৬৭১	১২৫	৬৮৫	১২৫
যশোর	২৯১৫	৭৮৫	২৯৫৫	৮১০	২৯১৫	৭৭৫
খুলনা	১২৩০	২৯৫	১২৪০	৩০০	১২৭০	২৭০
কুষ্টিয়া	৩৯৯০	৯৪০	৪০৩৫	৯৬০	৪০৮০	৯৩৫
পটুয়াখালি	৪৫	১০	৪৫	১০	৫০	১৫
বগুড়া	৬৫	২০	৬৫	২০	৬০	১৫

দিনাজপুর	৩১৫	৯৫	৩২০	৯০	৩৫০	১০৫
পাবনা	১৫১৫	৩৯৫	১৫২০	৩৯৫	১৫০৫	৩৮৫
রাজশাহী	৩৮৬৫	৯৫৫	৩৮৭০	৯৫০	৩৮৫০	৯৭০
রংপুর	২৯৫	৮৫	২৯৫	৮৫	৩০০	৯০
বাংলাদেশ	৪৫৩৫০	১৪১৪৫	৪৫৫৬৫	১৪২৮৫	৪৫৫৭৫	১৪১৩০

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক মটর ডাল উৎপাদন ধারা

	১৯৯৮-৯৯		১৯৯৯-২০০০	
এলাকা	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	২৫	১৫		
চট্টগ্রাম	২৭০	১১৬		
কুমিল্লা	৪২৯০	১৮৫২		
খাগড়াছড়ি	৩৭	৯		
নোয়াখালী	২৬১০	৯২০		
রাঙ্গামাটি	২৩৫	৫৮		
সিলেট				
ঢাকা	৫১৫০	১৯৬৫		
ফরিদপুর	১৪৭৬০	৪৬২০		
জামালপুর	২০১	৭০		
কিশোরগঞ্জ	১১২০	১৯০		
ময়মনসিংহ	৫৩৫	১৬০		
টাঙ্গাইল	২৫০	৮৫		
বরিশাল	৬৭৫	১৩০		
যশোর	৩০৫০	৮২০		
খুলনা	১২৫০	৩৫০		
কুষ্টিয়া	৪০৩৫	৯৫০		
পটুয়াখালি	৪০	১০		
বগুড়া	৭০	২০		
দিনাজপুর	৩১০	৯০		
পাবনা	১৫৭০	৪০০		
রাজশাহী	৩৮০৫	৯৩০		
রংপুর	২৮৫	৮৩		
বাংলাদেশ	৪৪৫৭৩	১৩৮৪০		

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক অড়হর উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
এলাকা	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)
৩বান্দরবান	৬৫	২৫	৭০	২৫	৭৫	৩০
চট্টগ্রাম	৭৫	৩০	৭৫	৩০	৯০	৩৫
কুমিল্লা	১৬০০	২২০	১৬৩০	২৮০	১৫৮৫	২৯৫
খাগড়াছড়ি	৩০০	৫৫	২৬০	৪৫	২৮০	৫০
নোয়াখালী	৩৯৫	১৭০	৩৯০	১৬৫	৩৬৫	১৫০
রাঙ্গামাটি	২২০	৮০	১৫০	৫৫	১৫০	৫৫
সিলেট	-	-	-	-	-	-
ঢাকা	৮০	২০	৯০	২৫	৯০	২৫
ফরিদপুর	৩৯০	৯৫	৪০০	১০০	৩৯৫	৯৫
জামালপুর	৬০	১৫	৬৫	২০	৬০	১৫
কিশোরগঞ্জ	৩৫	১০	৩০	১০	২৫	৫
ময়মনসিংহ	১১৫	৩৫	১২০	৩৫	১২০	৩৫
টাঙ্গাইল	৬০৫	২৪০	৫৯০	২৩৫	৬০০	২৩৫
বরিশাল	-	-	-	-	১৫	৫
যশোর	১৫৮০	৩৯০	১৫৮৫	৪০০	১৫৬৫	৪০৫
খুলনা	৬৫	২৫	৭০	২৫	৭০	৩০
কুষ্টিয়া	৫৭৯৫	৮৬৫	৫৫৮৫	৮২০	৫৫৫০	৮৫০
পটুয়াখালি	-	-	-	-	-	-
বগুড়া	৮৫	২৫	৮৫	২৫	৮৫	২৫
দিনাজপুর	৩৪৫	৬৫	৩৬৫	৬৫	৩৭০	২৫
পাবনা	১৫০	২৫	১৫০	২৫	১৪৫	৭০
রাজশাহী	১৯৫০	৪৫৫	১৯০৫	৪২৫	১৯৩০	৪২০
রংপুর	৩৫০	৯৫	৩৯৫	১১০	৪১০	১১৫
বাংলাদেশ	১৪২৬০	২৯৪০	১৪০১০	২৯২০	১৩৯৭৫	২৯৭০

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক মশুর উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
এলাকা	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)	একর	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	১০০	২৫	১১০	২৫	১২০	৩০
চট্টগ্রাম	১৭৫০	২৪০	১৭৭৫	২৪৫	১৭৩০	২৪০

কুমিল্লা	১০৬৫০	৬৯৮৫	১০৬২০	৬৫২০	১০৪২০	৫৪৭০
খাগড়াছড়ি	২১০	৪০	২৬০	৫০	২৬০	৫০
নোয়াখালী	১৫৭৩৫	৩২২৫	১৫৮৮৫	৩৪৩০	১৫৭৬৫	৩৩৭৫
রাঙামাটি	১৪০	৬৫	৫০	৭৫	১৫০	৬৫
সিলেট	২৪১৫	৬৪৫	২৩১৫	৬৭০	২৩৮০	৬৯৫
ঢাকা	২৪১৪০	৭৬৯৫	২৪৩৪০	৭৮৩৫	২৪২২০	৭৬৩০
ফরিদপুর	২১১৭৩৫	৪৩২১৫	২১১৯২০	৪০৮৪৫	২২১৬২৫	৩৯৫৩৩০
জামালপুর	৪৩২৫	১০৮০	৪৩৪৫	১১০০	৪২৬৫	১০৭০
কিশোরগঞ্জ	১৮৮০	৪৩০	১৯২৫	৫১০	২১৬০	৫৮০
ময়মনসিংহ	২২৭৫	৩৬৫	২২৬৫	৩৭৫	২২৪০	৩৭০
টাঙ্গাইল	২৪১০	৭১০	২৩৬০	৭৩০	২৪০০	৭৮৫
বরিশাল	১৪০৯৫	৩১০০	১৩৭৫৫	৩০২৫	১৩৮৫৫	৩৩৮০
যশোর	১৩৫৮৮০	৫১২২৫	১৩৬৫৪৫	৫৩০২৫	১৩৬১১০	৫০৩৬০
খুলনা	১৪৩৭০	৩২৫০	১৪৫০০	৩৭৭০	১৪৮৩০	৩৪৮৫
কুষ্টিয়া	৭৪৪৬০	২৪৫৭০	৭৪৬৯৫	২৪৫০০	৭৪২৪৫	২২২৭৫
পটুয়াখালী	১৬৮৫	৩৯০	১৭৩৫	৩৮০	১৬৭০	৩৯০
বগুড়া	২৮৫০	৮১৫	২৭৪০	৭৮০	২৭৬০	৭৮০
দিনাজপুর	৭২৮৫	১৮১৫	৭২৮০	১৮০৫	৭১৫০	১৮২৫
পাবনা	৩২৬৫৫	১০১২৫	৩২৯১০	১০৪৬৫	৩২৮১৫	১০৫০০
রাজশাহী	৩৪৪৩৫	৮৭৪৫	৩৪২৭৫	৮৬৩৫	৩৪১৬৫	৮৬৮০
রংপুর	৩০৩৫	৮৯০	৩১৩০	৯১০	৩১৩৫	৮৯০
বাংলাদেশ	৫০৮৪৯৫	১৬৯৯৪৫	৫০৯৯০৫	১৭০৫০৫	৫০৮৪৭০	১৬২৭৭৫

বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক খেশারি উৎপাদন ধারা

	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭		১৯৯৭-৯৮	
অঞ্চল	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন	একর	উৎপাদন টন
বান্দরবান	(৩৫)	(০১)	(৩৫)	(১)	(৩৫)	(১)
চট্টগ্রাম	১৪৯৩৫	৩৮২৫	১৩৭৪৫	৩৫৭৫	১৪৪৪৫	৩৯৮৫
কুমিল্লা	২৬২৮৫	৮২০০	২৮৫২০	৯১২৫	২৮৪০০	৯৫৪০
খাগড়াছড়ি	২৫	১০	৩৬	১০	-	-
নোয়াখালী	৪১৭১০	১১১৮০	৪০৮৫৫	১১৭২৫	৪১৬৪০	১২২৪০
রাঙামাটি	-	-	-	-	-	-
সিলেট	৪৫০	১৪৫	৪৩৫	১৪০	৩২০	৯৫
ঢাকা	১০১৩৩৫	৩১৯২০	১০১২৫০	৩৪৬৩০	৯৯৯৫০	৩১৯৮৫
ফরিদপুর	৬২৩৪৫	২০৮২৫	৬৮০৪০	২২৭২৫	৭০৯২০	২৬২৪০

জামালপুর	৩০২০	৯৯০	২৯২০	৯৫৫	২৯৫০	৯৩৫
কিশোরগঞ্জ	৪৭৯০	১৭৫৫	৪৬৯৫	১৮৮০	৪৮৮০	১৮১৫
ময়মনসিংহ	৫৭০৫	১৮৭৫	৫৬০০	১৮৫০	৬০৬৫	১৯৬৫
টাঙ্গাইল	১৮৫৯৫	৪৩৯০	১৯২০০	৪৭৬০	১৯৪৬০	৫০০০
বরিশাল	১৩৯৫৪০	৪১১৬৫	১১৪১৬০	৩১৯৬৫	১০১৮০০	২৯৮২৫
যশোর	৩০৯৯০	১০৭৫৫	৩০৯৮০	১০৭৮০	৩১৮০৫	১১১০০
খুলনা	৬৪৮০	১৫১০	৬৯৫০	১৮০৫	৭৪৬০	১৭২৫
কুষ্টিয়া	১৫০৩৫	৪৪৩৫	১৫৩০০	৪৬৬৫	১৩৭০৫	৪০৭০
পটুয়াখালি	৬২২৪৫	১৭৮৬৫	৬২৩৩০	১৮৫৭৫	৬৩৬৫০	২১৫০৫
বগুড়া	৬৪০	২৩৫	৫৯৫	২২০	৫৩০	১৯৫
দিনাজপুর	৪৯৭৫	১৫০০	৪৬৪০	১৩৯৫	৪৫৫০	১৩৭৫
পাবনা	১৬৪৪৫	৫৬২৫	১৩৯০০	৪৮৯৫	১৩৯৩০	৬৫৬০
রাজশাহী	২০৪১৫	৮৩১০	২০৫৬০	৮৫৭৫	২০০৫৫	৮৩০৫
রংপুর	১২৬১৫	৪৫৮০	১২২৮৫	৪৪২০	১২০০০	৪২৮৫
বাংলাদেশ	৫৮৮৬১০	১৮১০৯৫	৫৬৬৯৯৫	১৭৮৬৭০	৫৫৮৪৯৫	১৮২৭৪৫

পরিশিষ্ট ২

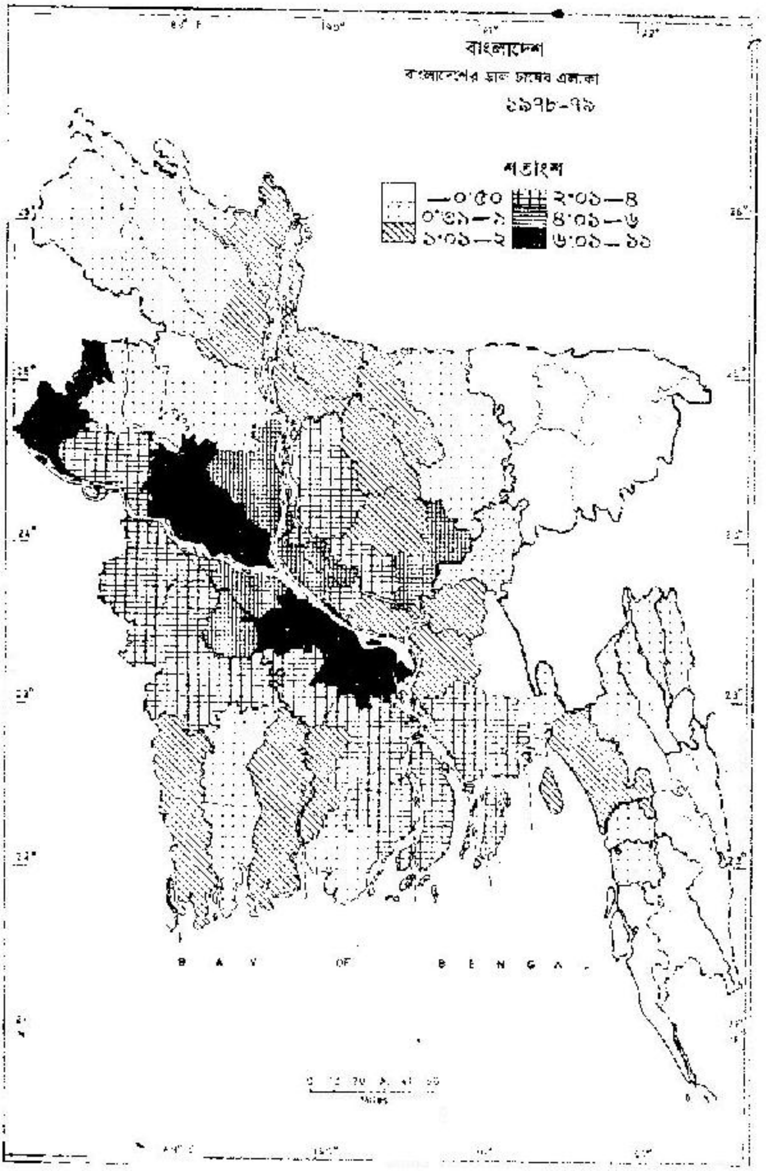
বাংলাদেশ
বাংলাদেশের ডাল চাষের এলাকা
১৯৭৮-৭৯
শতাংশ
—০·৫০
০·৫১—১
১·০১—২
২·০১—৪
৪·০১—৬
৬·০১—১১
BAY OF BENGAL

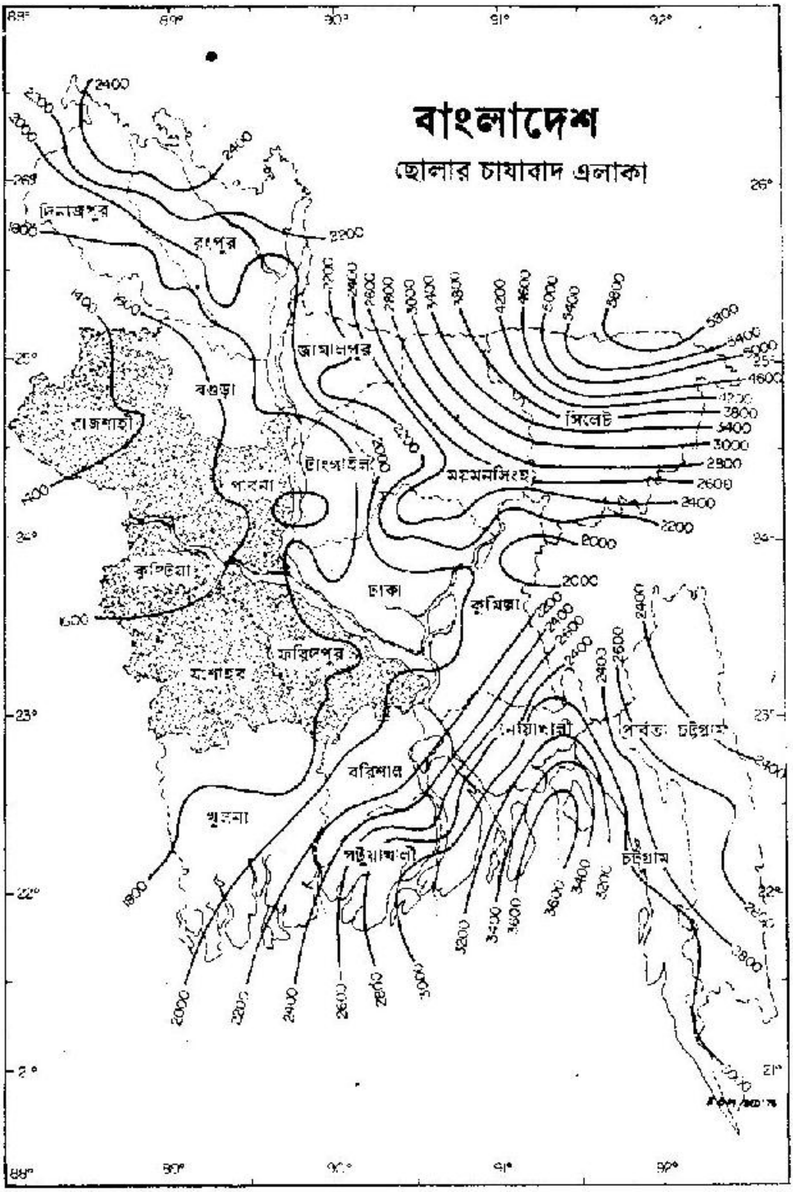
বাংলাদেশ
ছোলার চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
জামালপুর
বগুড়া
রাজশাহী
সিলেট
টাংগাইল
পাবনা
ময়মনসিংহ
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম

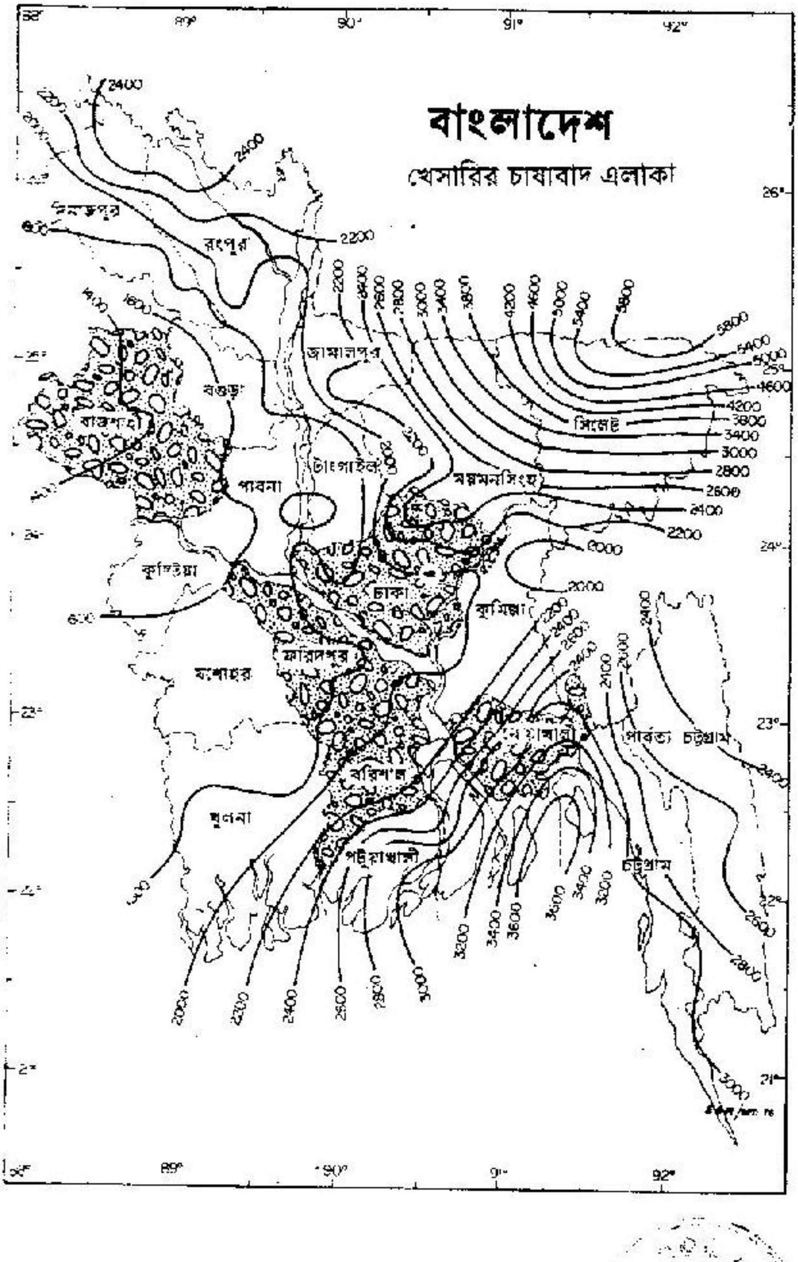
বাংলাদেশ
খেসারির চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
জামালপুর
বগুড়া
রাজশাহী
পাবনা
টাংগাইল
ময়মনসিংহ
সিলেট
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
89°
90°
91°
92°
26°
24°
23°
21°

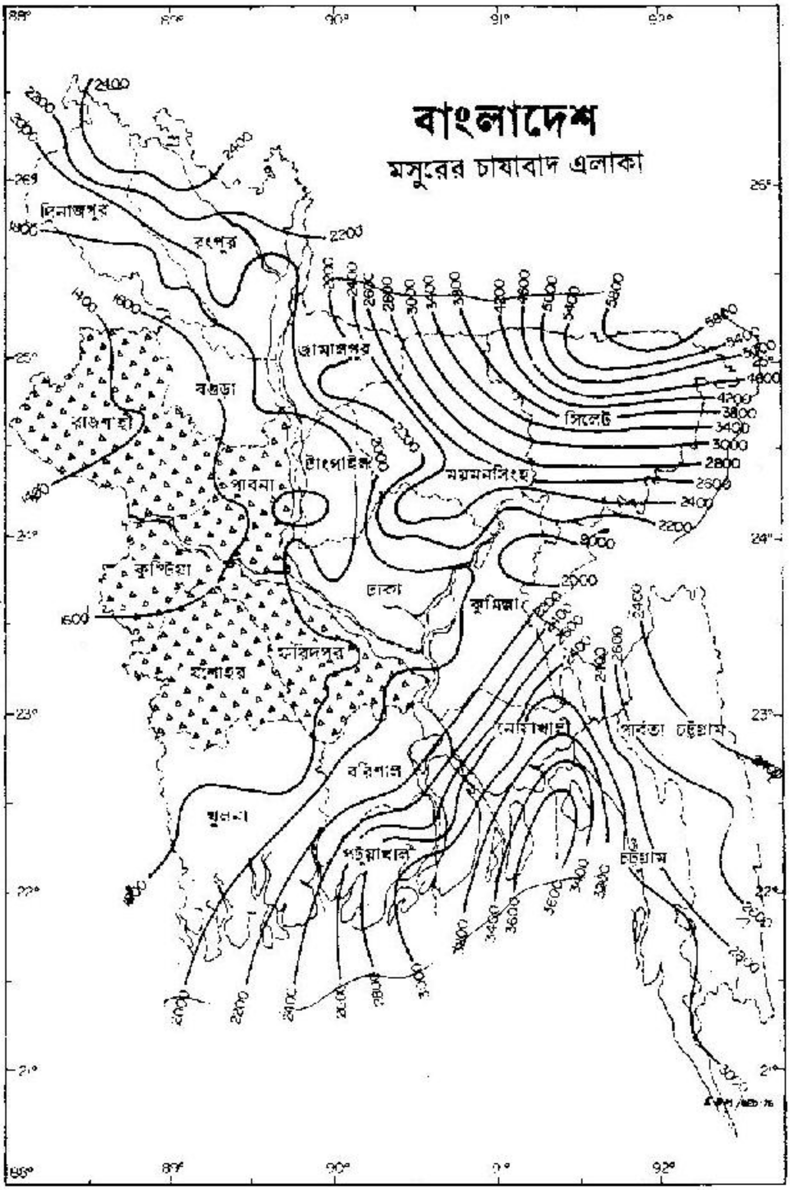
বাংলাদেশ
মসুরের চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
বগুড়া
রাজশাহী
জামালপুর
সিলেট
টাংগাইল
ময়মনসিংহ
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম

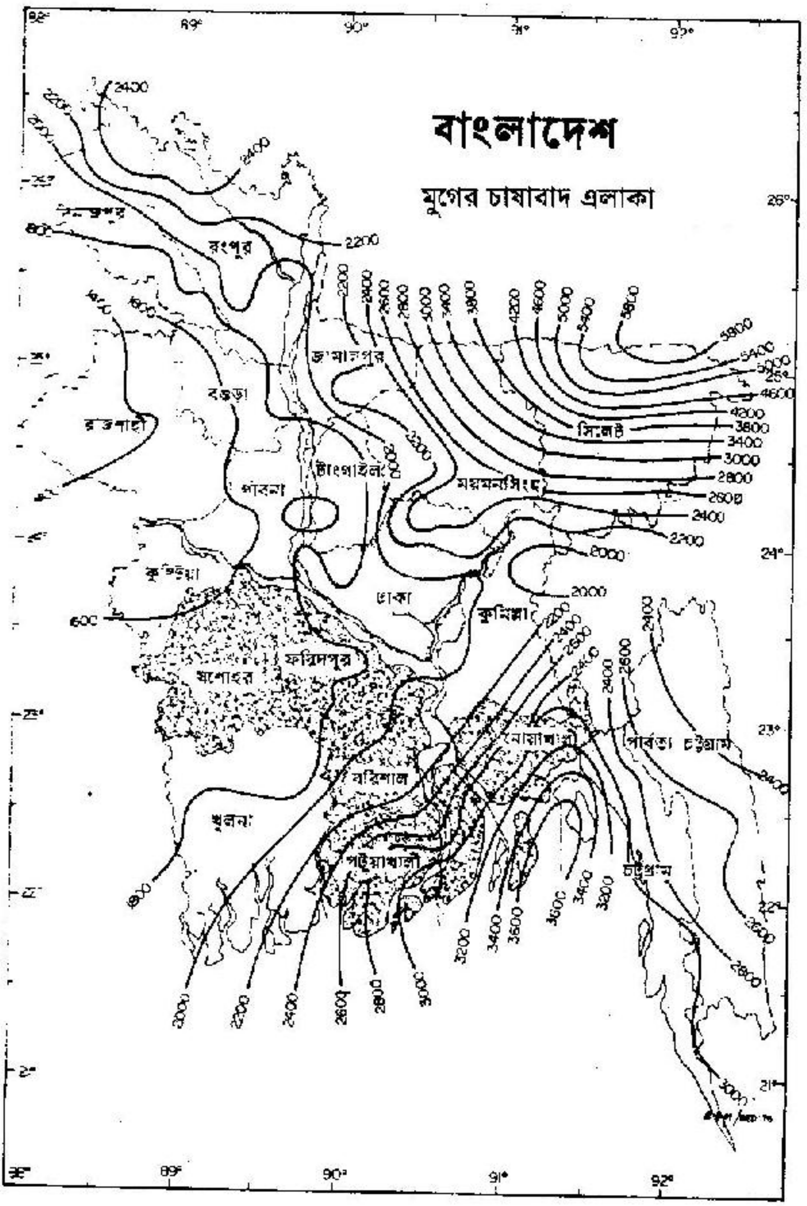
বাংলাদেশ
মুগের চাষাবাদ এলাকা
রংপুর
বগুড়া
রাজশাহী
জামালপুর
সিলেট
ময়মনসিংহ
টাংগাইল
পাবনা
ঢাকা
কুমিল্লা
কুষ্টিয়া
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম
89°
90°
91°
92°
26°
24°
23°
22°
21°

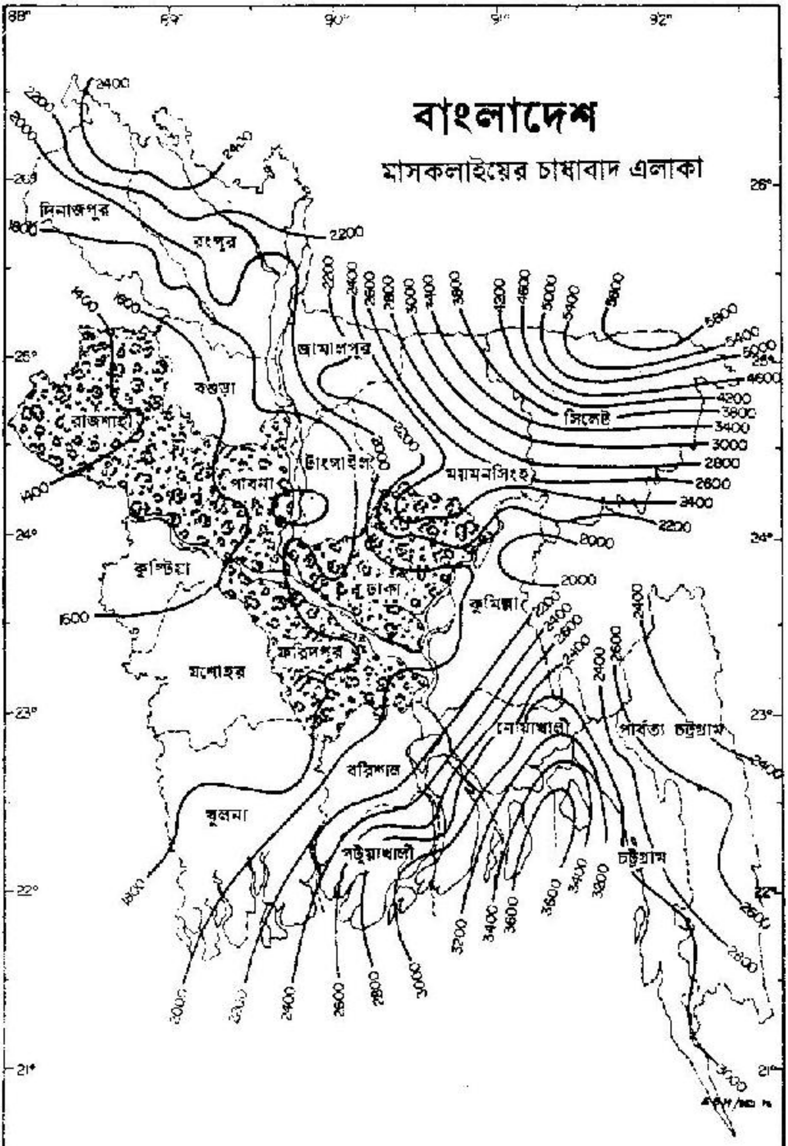
বাংলাদেশ
মাসকলাইয়ের চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
বগুড়া
রাজশাহী
জামালপুর
সিলেট
টাংগাইল
ময়মনসিংহ
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম

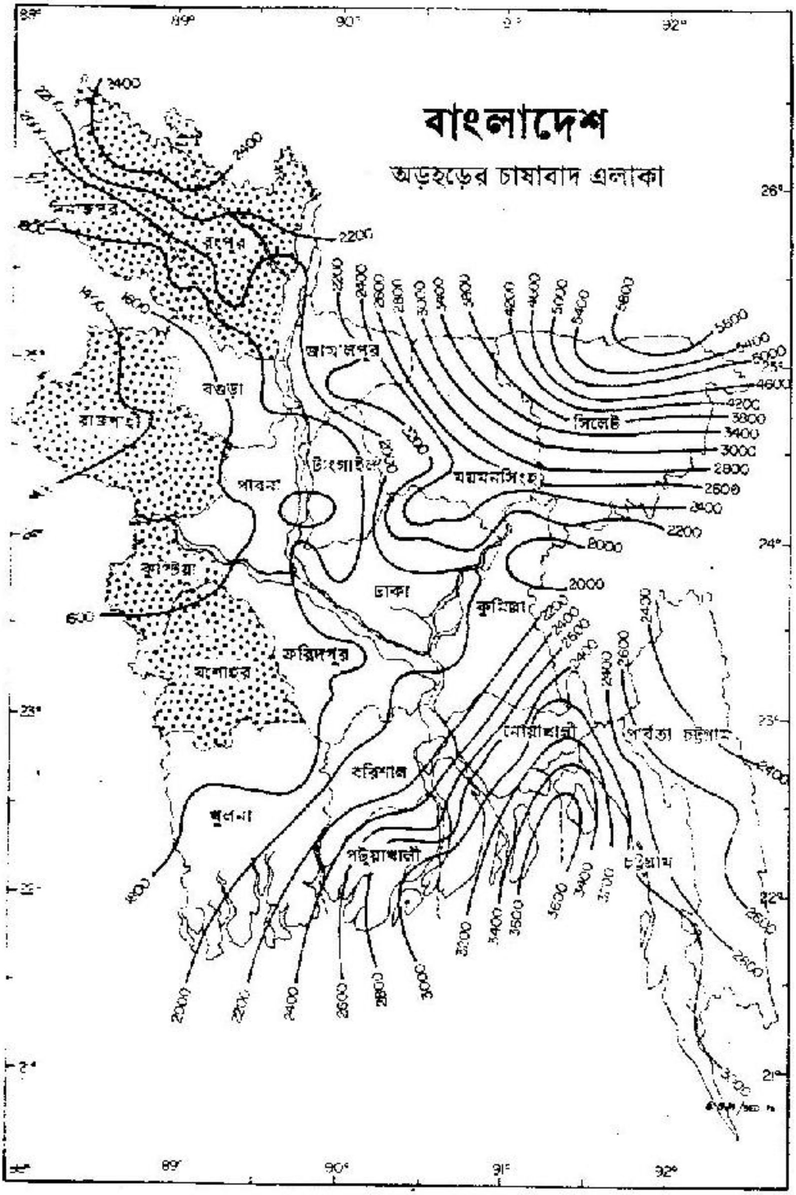
বাংলাদেশ
অড়হড়ের চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
বগুড়া
রাজশাহী
জামালপুর
সিলেট
ময়মনসিংহ
টাংগাইল
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম

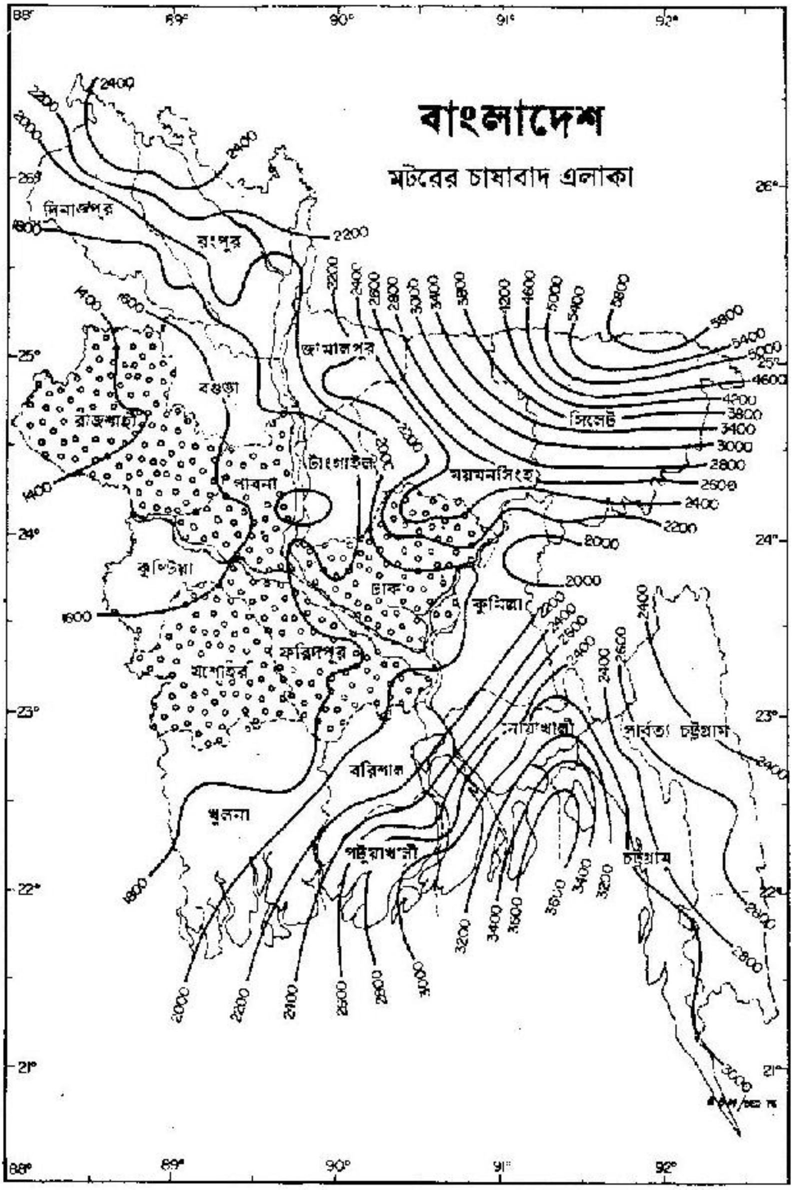
বাংলাদেশ
মটরের চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
জামালপুর
বগুড়া
রাজশাহী
সিলেট
টাংগাইল
ময়মনসিংহ
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম

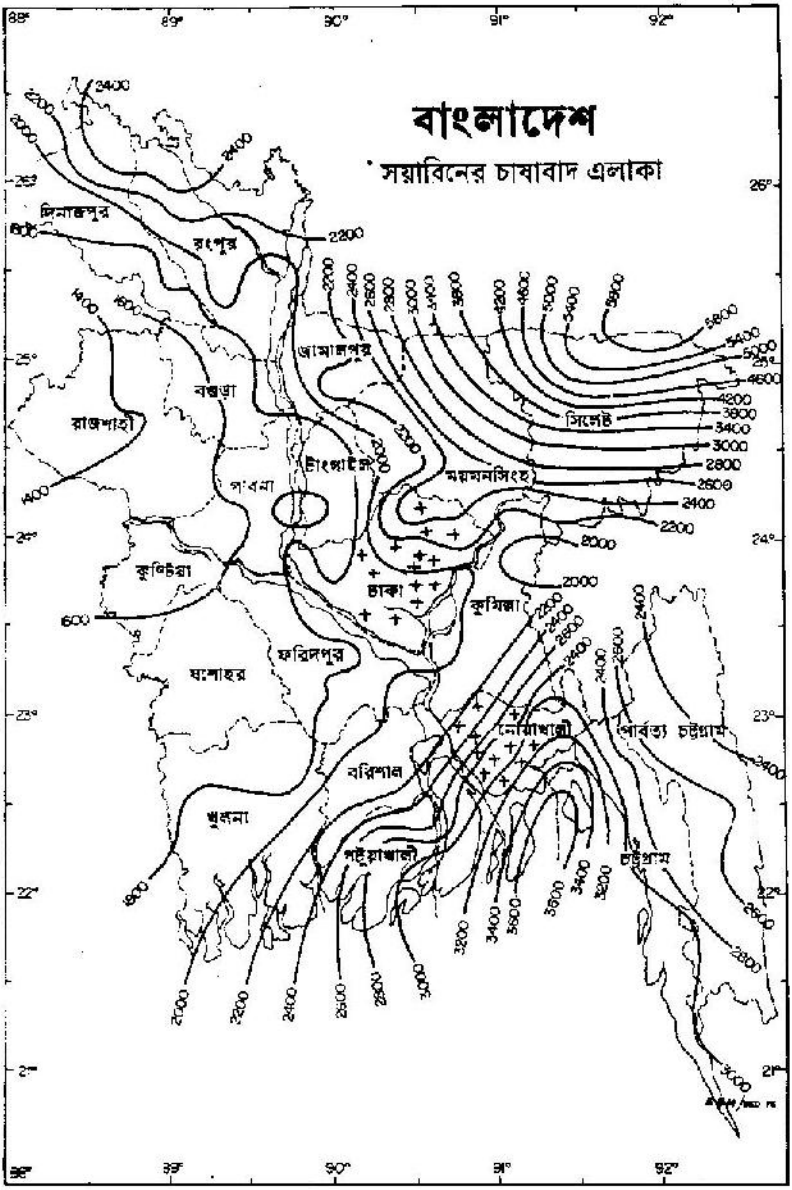
বাংলাদেশ
সয়াবিনের চাষাবাদ এলাকা
দিনাজপুর
রংপুর
রাজশাহী
বগুড়া
জামালপুর
সিলেট
ময়মনসিংহ
টাঙ্গাইল
পাবনা
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
নোয়াখালী
পার্বত্য চট্টগ্রাম
বরিশাল
খুলনা
পটুয়াখালী
চট্টগ্রাম

উর্বরতা-মান

দোআঁশ ও এঁটেল মৃত্তিকাবিশিষ্ট জমির

উপাদান/মাটি					
Total-W %	≤ ০.০৯	.০৯-.১৮	.১৮১-.২৭	০.২১৭-.৩৮	
Pbµ/g	≤ ৭.৫	৭.৫১-১৫	১৫.১-২২.৫	২২.৫১-৩০	
S by/g	≤ ৭.৫	৭.৫১-১৫	১৫.১-২২.৫	২২.৫১-৩০	
K meq/ 100g	≤ ০.০৯	.০৯১-.১৮	.১৮১-.২৭	.২৭১-.৩৬	
Ca meq/ 100g	≤ ১.৫	১.৫১-৩	৩.১-৪.৫	৪.৫১-৬.০	
Mg meq/100g	≤ ০.৩৭৫	০.৩৭৬-.৭৫	০.৭৫১-১.১২৫	১.১২৬-১.৫	
Zn by/g	≤ ০.৪৫	.৪৫১-.৯	.৯১-১.৩৫	১.৩৫১-১.৮	
B by/g	≤ ০.১৫	.১৫১-.৩	.৩১-.৪৫	.৪৫১-.৬	
mg by/g	≤ ০.০৭৫	.০৭৬-.১৫	.১৫১-.২২৫	.২২৬-.৩	

বেলে মাটির জন্য এই উপাদান মাত্রা ১৫-৩০% কম।

তথ্যপঞ্জি

ইংরেজি

Afzal, M. A., A. N. M. M. Murshed, M. A. Bakr and A. B. M. Salahuddin 1997. *Improved Varieties of Blackgram : Barimash-1*, Publication No. 5.

Agrawal. R.L. 1986. *Seed Technology*. Oxford- IBH Pub.Co New Delhi.

Bakr M. A. 1994, *Checklist of Pulse's Diseases in Bangladesh.* Bangladesh Journal of Plant Pathology. 10 (1 & 2) : 13-16.

Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI). 1993. Annual Report 1992-93.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). 1997-1999. *Year Book of Agricultural Statistics of Bangladesh, 1996-2001.* Dhaka, Bangladesh.

BARC. 1985. Fertilizer Recommendation Guide. Bangladesh Annual Reports. 1985-93. BARI, BRRI. BARC. SB/FRG-BFFP,DAE. 2000.

Bentwal. S. P. S., B. Bayaia, S. Weigand, Kh. Makkouk and M. C. Saxena 1993. *Field guide to lentil diseases and insect pest.* International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria.

Chapman. S.R. and Carter, L.P. 1982. *Crop Production Principles and Practices.* Pub. New Delhi.

Chatterjee. B.N. Maiti, and S. Mandal, B.K. 1989. *Cropping system.* Oxford IBH Pub. Co. New Delhi.

Chatterjee. B.N. and S. Maiti 1981. *Principles and Practices of Rice Growing.* IBH Publishing Co. India

Copeland. L.O. 1976. *Principles of Seed Science and Technology.* Sargess Pub.Co. Minnessota, USA.

Crist. D.H. 1965. Rice, Longnam Creen 2 Co. London. Whyte, R.O. 1980. *Crop Production Environment.* Faber and Faber Ltd. London.

De Ge 1992 Fundamentals of Agronomy. Oxford IBH. Pub New Delhi.

Gowda, C. L. L. and A. K. Kaul 1982. *Pulses in Bangladesh.* Bangladesh Agricultural Research Institute and Food and Agricultural Organization of United Nation.

Crafts, A.S. and Robbins,W.W. 1973. *Weed Control.* Tata- Mc-Graw Hill Pub. Co. Ltd. New Delhi.

Gupta, O.P. and Lamba. P.S. 1978 *Modern Science Today and Tomorrow.* Printers & Pub. New Delhi.

Hebblewaite, P.B. 1980. *Seed Production.* Bulter Wath, England.

Hance, R.J. and Holy, K. 1990. *Weed Control Handbook.* Black Well Scientific Pub. Oxford.

Haque, M. S. and M. A. Satter, 1991. Status of microbial research on pulses pp. 103-110. In : BARI Advances in Pulses Research in Bangladesh.

Proceedings of the second national workshop in pulses, 6-8 June 1989. Gazipur, Bangladesh.

ICAR. 1978. *Handbook of Agriculture.* New Delhi, India.

ISTA. 1976. International Seed Testing Assosiation. *Seed Science and Technology.*

Justice, O.L. and Bass, L.N. 1978. *Principles and Practices of Seed.* USDA.

Kay D. E. 1979. Food Legumes, *Crop and Product Digest No. 3.* Tropical Products Institute, London.

Kipps M.S. 1978. *Production of Field Crop.* Tata Mc-Graw. Hill Pub Co. Ltd. New Delhi..

Martin, J.H, Leonard, W.H. and Stamp. D.L. 1976. *Principles of Field Crop Production.* McMillan Pub. Co. New York.

Ministry of Agriculture. 1976. *Seed Certification Manual,* Seed Certification Agency. GOB.

Mudaliar, V.I.S. 1984. *Principles of Agronomy.* The Bangalore Printing & Pub. Co. India.

Murshed, A. N. M. M., M. A. Afzal and M. A. Bakr. 1997. *Improved Varieties of Blackgram : Barimash-2.* Publication No. 15.

Murshed, A. N. M., M. A. Afzal, M. A. Bakr and A. B. M. Salahuddin. 1997. *Improved Variety of Blackgram : Barimash-3.* Publication No. 16.

Pearson, L.C. 1973. *Principles of Agronomy.* East-West Press. New Delhi.

Pulses Research Center (PRC). 1994. *Annual Report.* 1994-1996 BARI.

R.O. 1960. *Crop Production and Environment.* Faben and Taben, London.

Siddique Kabir, 1994. *Ranna Khaday Posti in Bengali.* Taj Publishing House, Dhaka, Bangladesh.

Singh. R. C. and Faroda. A. S. 1979. *Weed control in blackgram. Indian Agrono.* 24(1) : 102-103.

Thakur, C. 1979. *Scientific Crop Production,* T & H. Metropolitan Book Co., New Delhi.

IRRI, 1989. *A Farmers Primer on Growing* Soybean in rice. IRRI.

IRRI, 1989. *A Farmers Primer on Growing Cowpea in Rice.* Manila, Philippins.

IRRI, 1991. *A Primer on Organic Based Rice Farming* (R.K. Pandey). IRRI, Manila, Philippines.

BBS, 1995-1999. *Statistical Pocket Book of Bangladesh.* Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh.

BARI, 1995. *Sustainabiliy of Rice-Wheat systems in Bangladesh.* (ed. Razzaque, M.A. *et al.*) Proc. WRC, BARI, Nashipur Dinajpur.

MARTIN, J.H. *et al.* 1985. *Principle of Field Crop Production.* McMillan Pub. Co. USA

PIPPS, M.S. 1978. *Production of Field Crops.* McGraw Hill Book Co. USA.

বাংলা

বিএআরআই। ১৯৯৩। *প্রযুক্তি পরিচিতি।* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

কৃষি প্রযুক্তি হাত বই। ২০০০। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। গাজীপুর।

মমিন মোঃ মনজুরুল। ১৯৯৮। *পরিবেশ বিজ্ঞান : সার ব্যবহার নির্দেশনা।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মমিন মোঃ মনজুরুল। ২০০০। *পরিবেশ বিজ্ঞান : কৃষি বনায়ন।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মজুমদার, ম। ১৯৮১। *পূর্বভারতের ফসল।* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলকাতা।

বিআরআরআই। ১৯৯৯। *আধুনিক ধানের চাষ।* জয়দেবপুর, গাজীপুর।

বিআরআরআই। *ধান চাষের সমস্যা।* জয়দেবপুর, গাজীপুর।

ইসলাম ও আমিন। ১৯৮৮। *সার ব্যবহার নির্দেশিকা।* ঢাকা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ১৯৮৮। *ধানের শ্রেণীবিভাগ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া।* খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা

বিএআরআই। ১৯৯৩। *ভুট্টা উৎপাদন ও ব্যবহার।* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট। জয়দেবপুর, গাজীপুর

ভুট্টা। ১৯৯১। *শুভ্রা বর্ণালী ও মোহর।* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর
চিনার সহ : তুষার। ১৯৯৪। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

বিএআরআই। ১৯৯০। *লাভজনক পদ্ধতিতে গম উৎপাদনের উপায়।* গম গবেষণা কেন্দ্র, নশীপুর, দিনাজপুর।

বিএআরআই। *কাউনের চাষ।* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

বিএআরআই। *বিভাগীয় বুকলেট।* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

বিআইএনএ। ১৯৯৮। *উন্নত কৃষি প্রযুক্তি পরিচিতি।* বিআইএনএ, ময়মনসিংহ।

ইসলাম, ম, ও ক্র্যাইটন (সম্পাদিত)। ১৯৯২। ডাল ও তেল ফসলের সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়া ও ব্যবহার। শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ইসলাম, ন। ১৯৯৭। কৃষি অনিষ্টকারী পোকামাকড় জীবনবৃত্তান্ত ও নিয়ন্ত্রণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

BANSDOC Library Dhaka

চিত্রাবলী

বাংলাদেশ
বাংলাদেশে ডাল চাষাধীন এলাকা

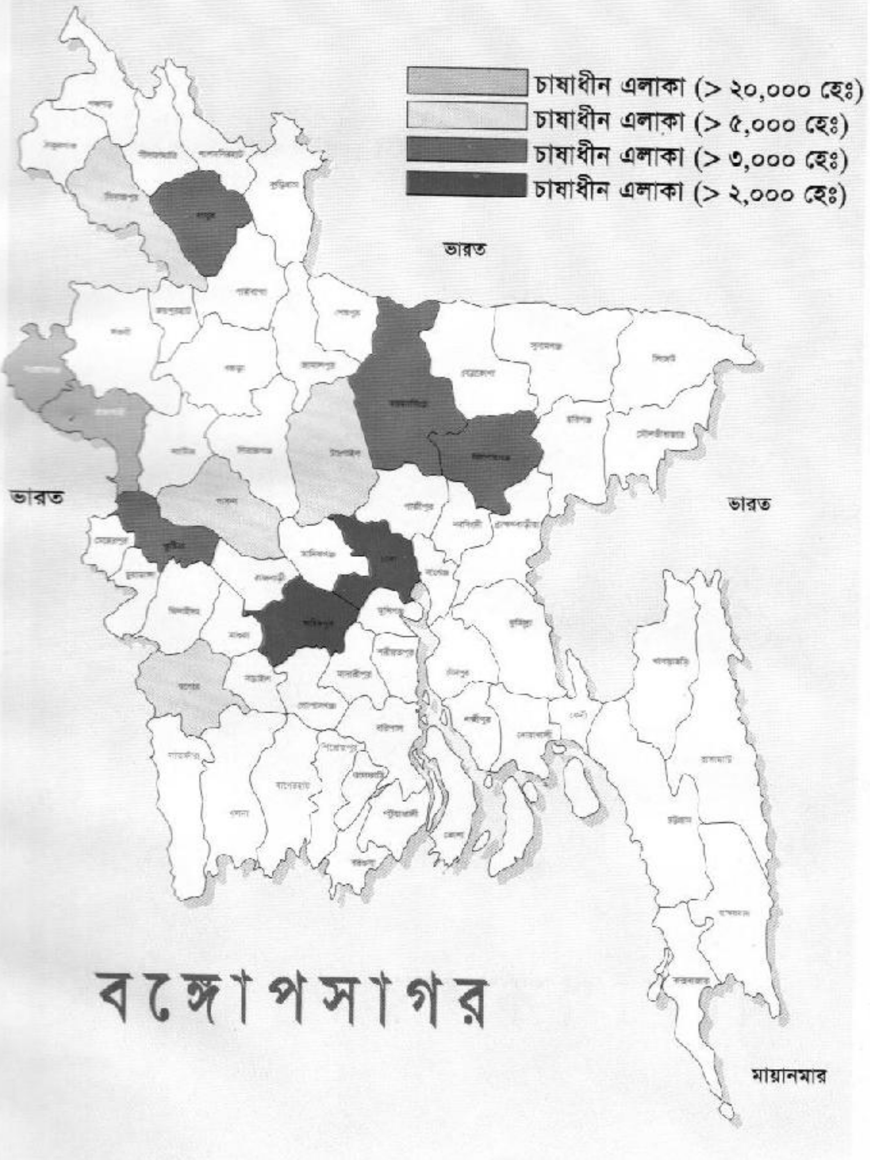

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে খেশারিকলাই চাষাধীন এলাকা

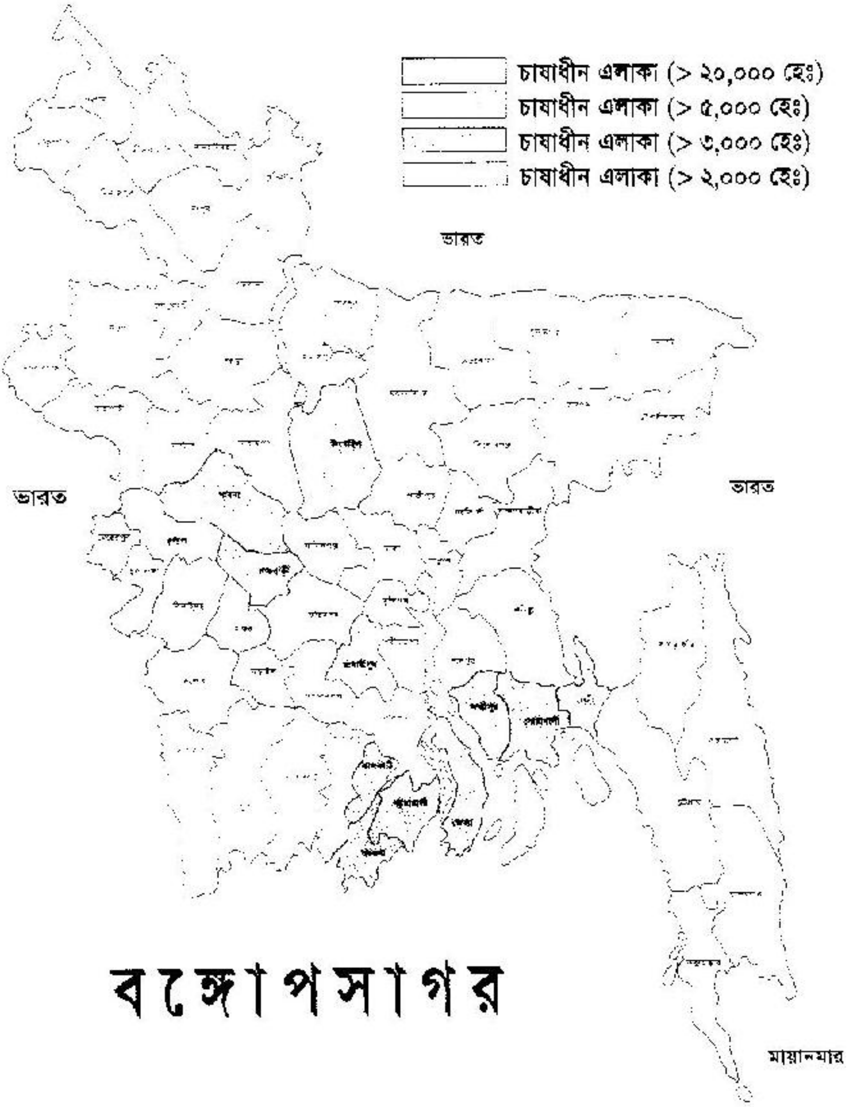

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মশুরকলাই চাষাধীন প্রধান প্রধান এলাকা

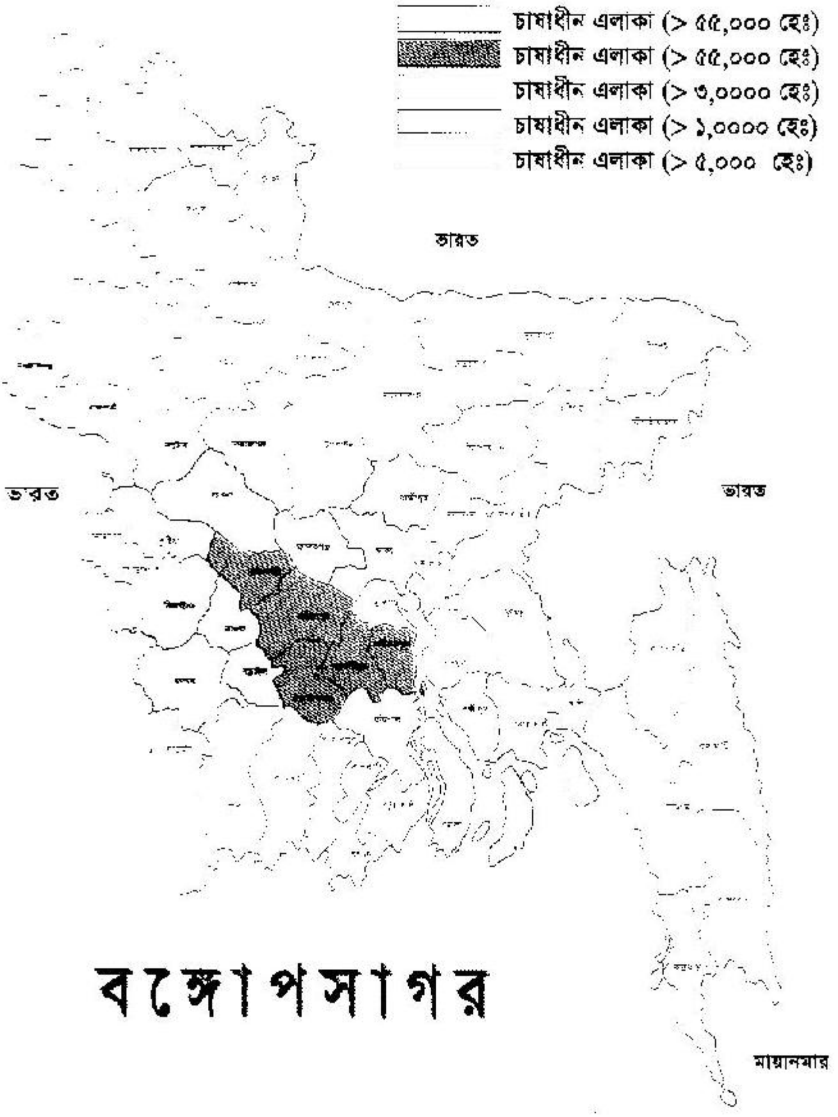

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মুগকলাই চাষাধীন এলাকা (খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুম)

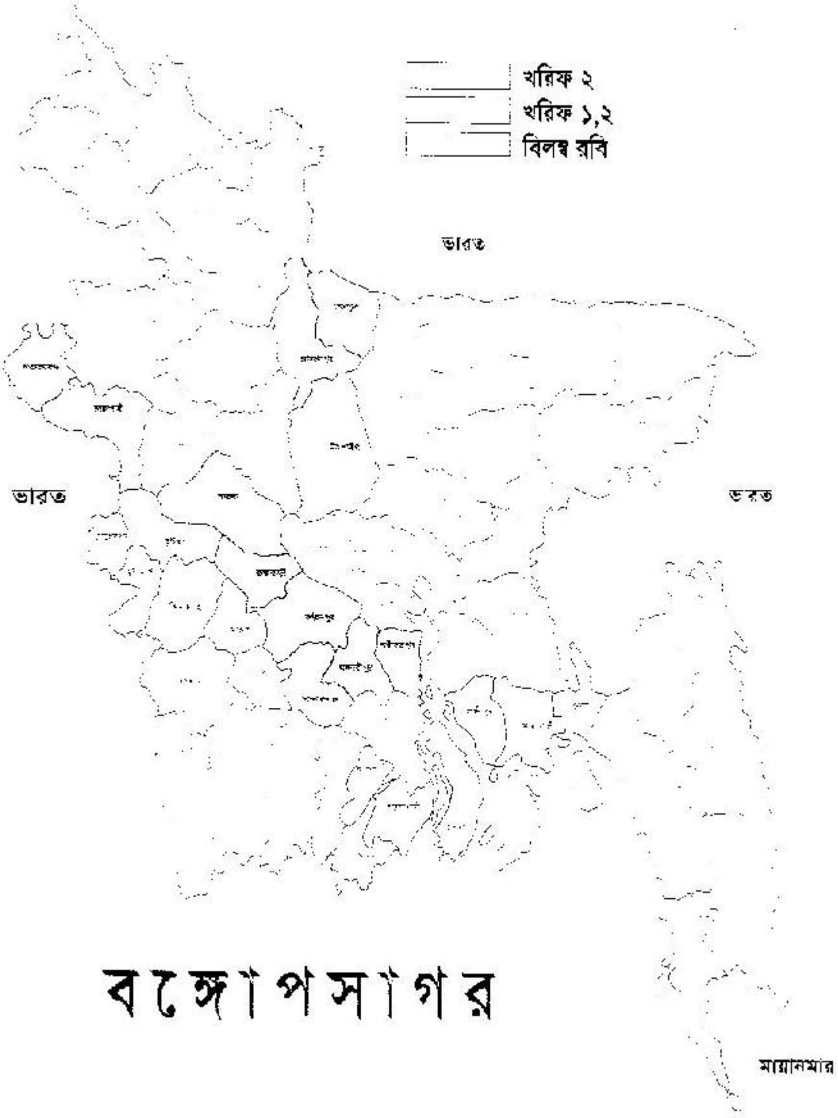

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে মাশকলাই চাষাধীন এলাকা

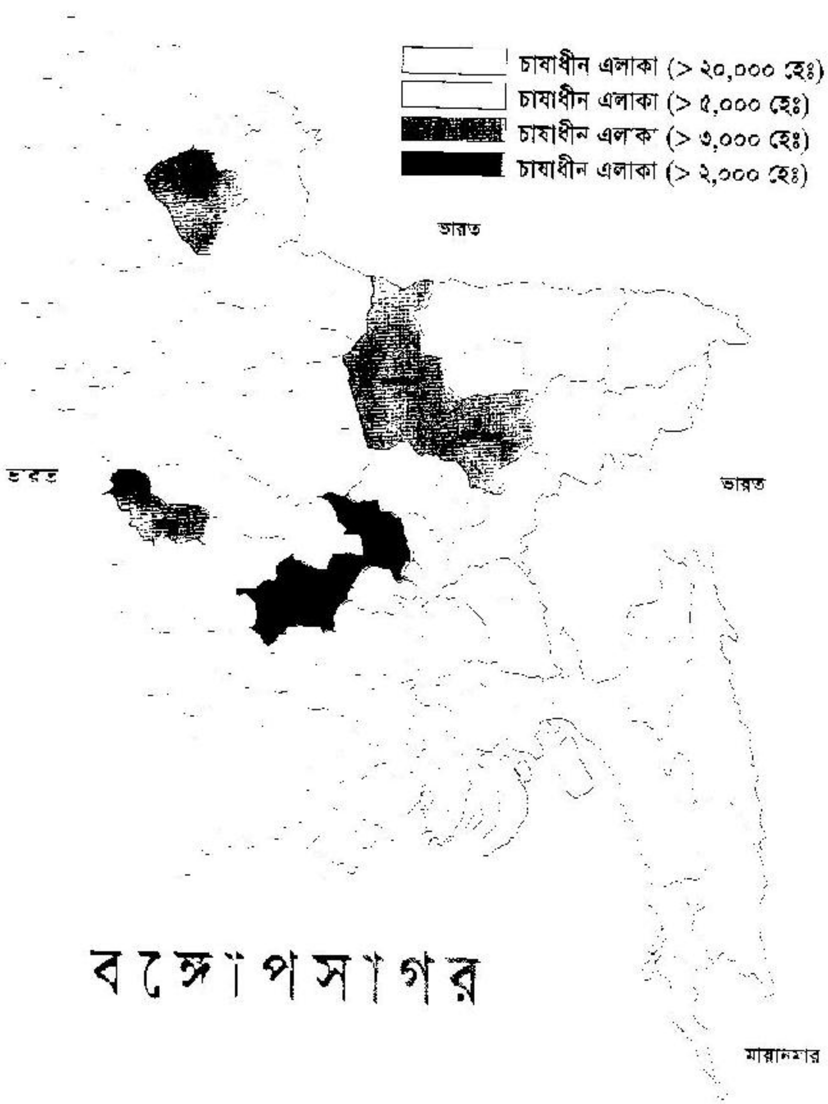

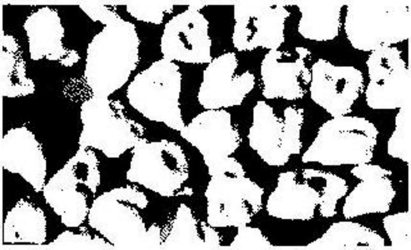

দেশী ছোলা

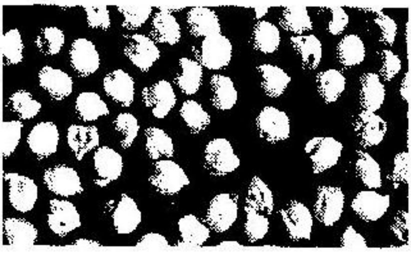

কাবুলী ছোলা

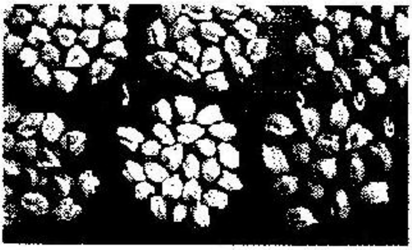

বারি ছোলার বিভিন্ন জাতের তুলনামূলক চিত্র

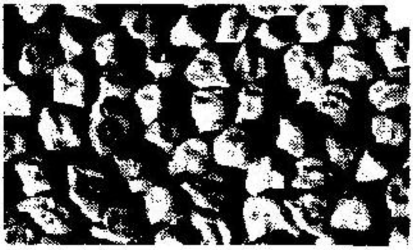

নবীন ছোলা

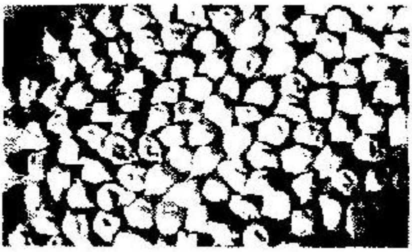

বারি ছোলা ৫

বারি ছোলা ৬

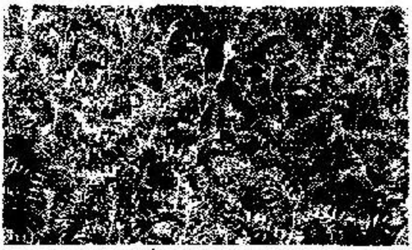

ছোলার উন্নত ফসল মাঠ (NPKS+B– Composed) প্রয়োগকৃত

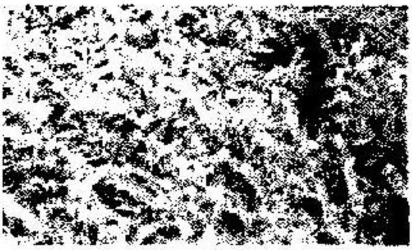

NPKSB+ কম্পোস্ট প্রয়োগকৃত ছোলা ৩

P-প্রয়োগে বারি ছোলা ৩-এর ফলন বৃদ্ধি

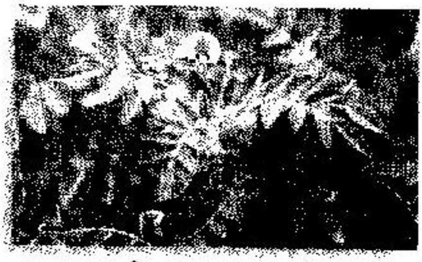

P-প্রয়োগে বারি ছোলা ৫-এর ফুলের উৎপাদন বৃদ্ধি

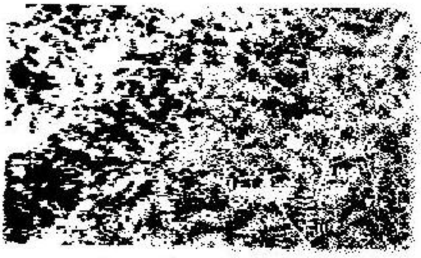

[illegible]-এর মাটিতে বারি ছোলা ৫-এর ফলন কম

হাইপ্রোছোলা

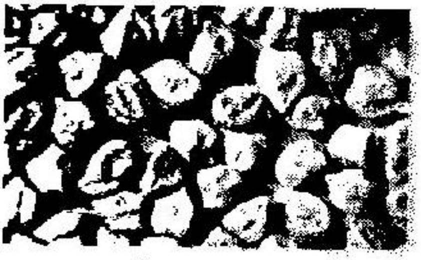

বারি ছোলা ২

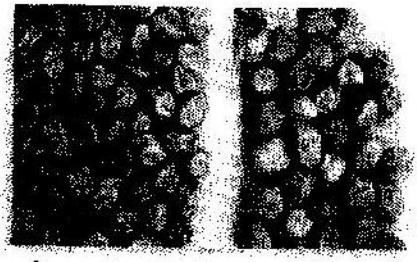

বারি ছোলা ৩ (বামে) ও বারি ছোলা ৪ -এর তুলনামূলক চিত্র

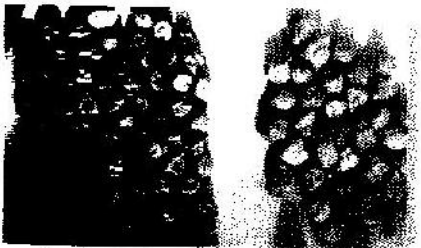

[illegible] ও বারি ছোলা ৬ -এর তুলনামূলক চিত্র

বিনাছোলার মিউট্যান্ট লাইন ৮৪

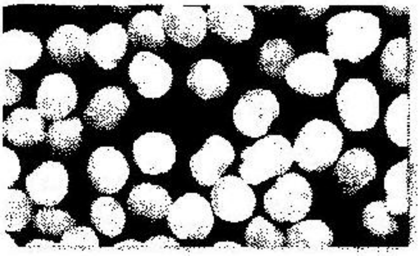

উন্নতমানের খেশারি দানা

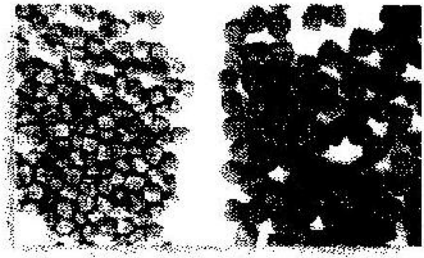

বারি খেশারি ২ (বামে) ও দেশী খেশারি ১

খেশারি শাক

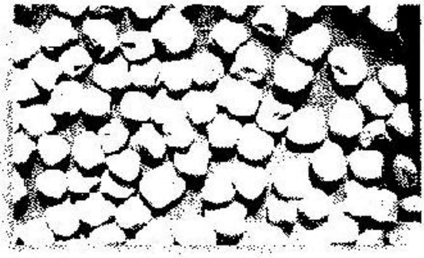

বারি খেশারি ২ দানা

বারি খেশারি ১ (ফুলসহ)

বারি খেশারি ১ (মাঠ ফসল)

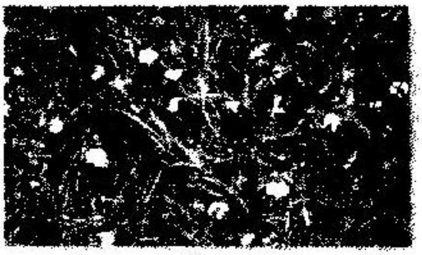

নেত্রকোনার স্থানীয় জাতের খেশারি

বারি খেশারি ২ ফসল

বারি খেশারি (লাল ফুলসহ)
ইনসেটে পলিনেটর

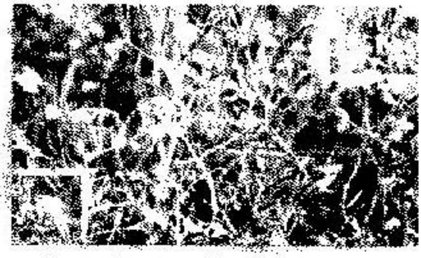

বারি খেশারি ৩ (লাল নীল ফুলসহ)
ইনসেটে পলিনেটর

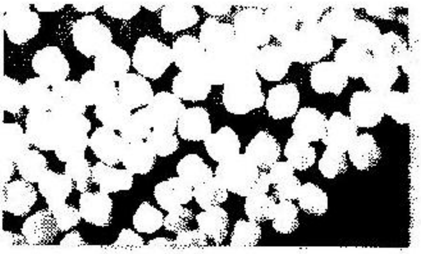

ভাঙা খেশারি কলাই

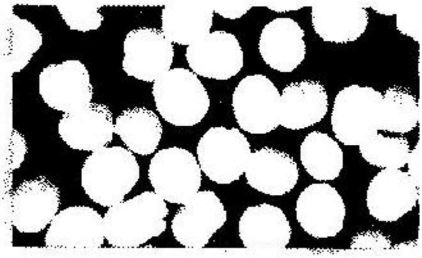

অ্যাংকর খেশারি কলাই

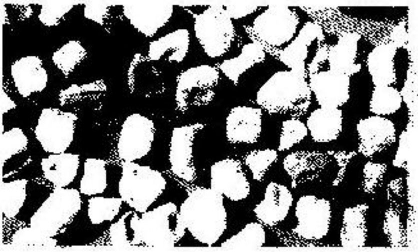

বারি খেশারি ১

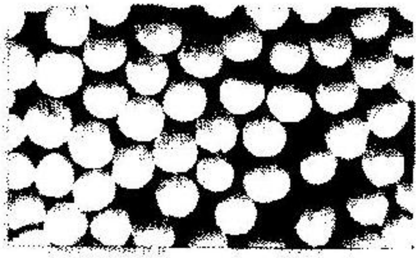

উন্নতমানের মশুর দানা

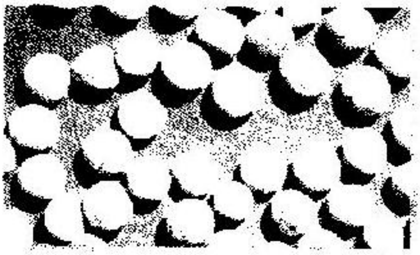

বারি মশুর ১ দানা

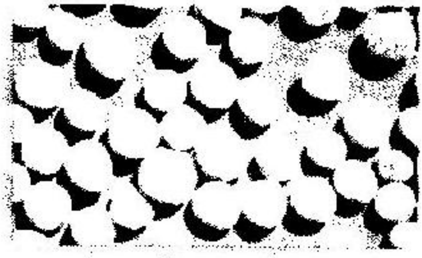

বারি মশুর ২ দানা

মশুর চাষ

বাকৃবিজিয়া সার-বীজ ছিটানো যন্ত্র: সন্মুখ দৃশ্য (বামে) পশ্চাদ দৃশ্য (ডানে)

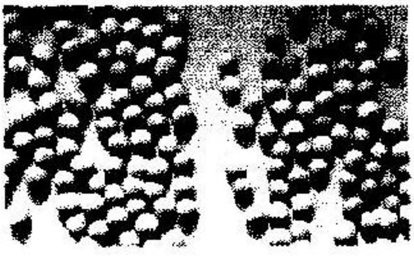

দেশী বিদেশী মশুর দানার তুলনা

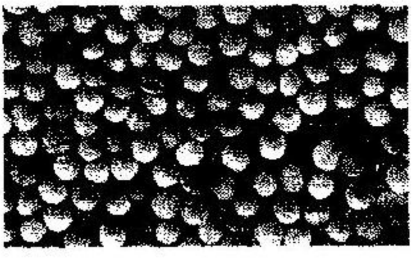

দেশী মশুর

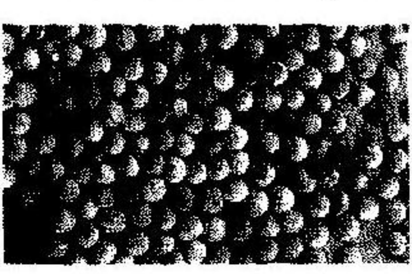

দেশী মশুর দানা

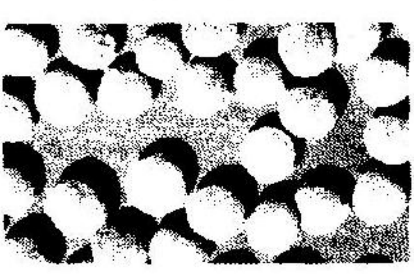

বারি মশুর ১ দানা

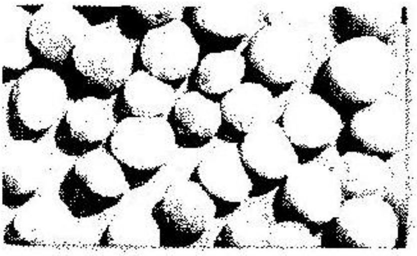

বারি মশুর ২ দানা

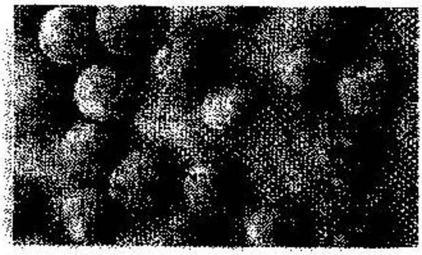

বারি মশুর ৩ দানা

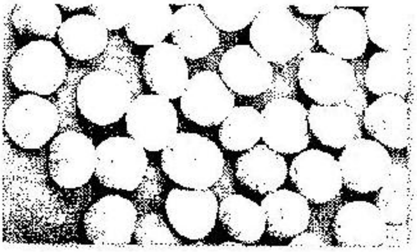

বারি মশুর ৪ দানা

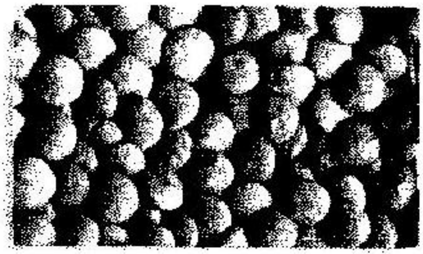

আমদানিকৃত বড় আকারের মশুর

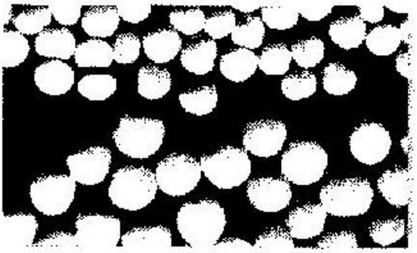

বড় ও মাঝারি আকারের মশুরের দানার তুলনা

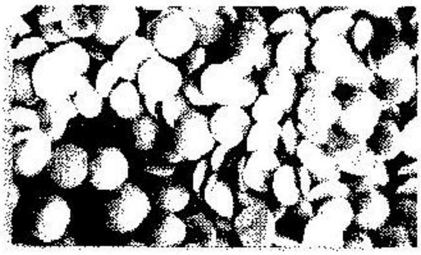

ভাঙা মশুর দানা

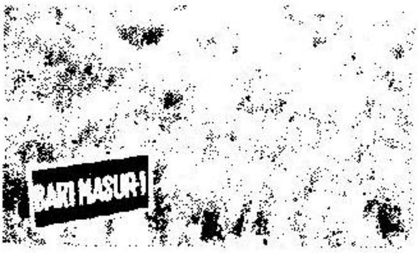

বারি মশুর ১ ফসল

বারি মশুর ১ গাছের অগ্রাংশ

বারি মশুর ১ বাড়ন্ত পর্যায়

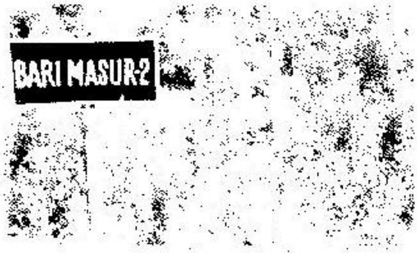

বারি মশুর ২ ফসল

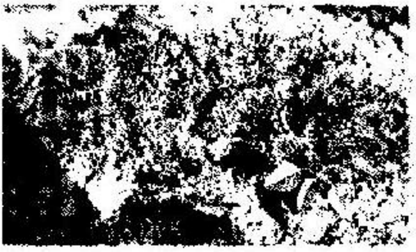

বারি মশুর ২-এর অঙ্গজ পর্যায়

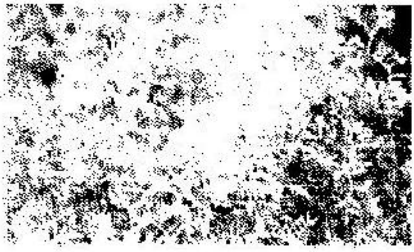

বারি মশুর ২-এর পুষ্পায়ন পর্যায়

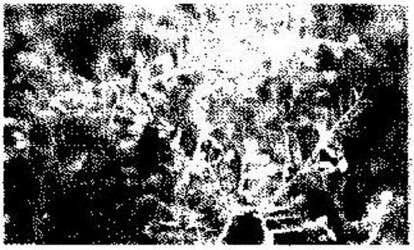

বারি মশুর ২-এর বাড়ন্ত পর্যায়

বারি মশুর ২-এর নডিউল

বারি মশুর ৩ ফসল

বারি মশুর ৩-এর অঙ্গজ পর্যায়

বারি মশুর ৩-এর পুষ্পায়ন পর্যায়

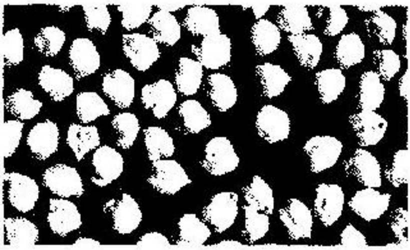

বারি মশুর ৩-এর ফল ধরা পর্যায়

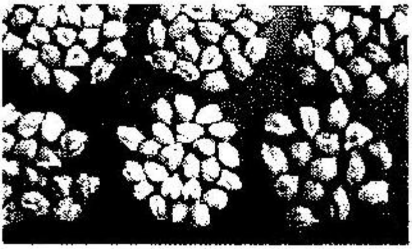

বারি মশুর ৪-এর ফসল

বারি মশুর ৩-এর পুষ্পায়ন পর্যায়

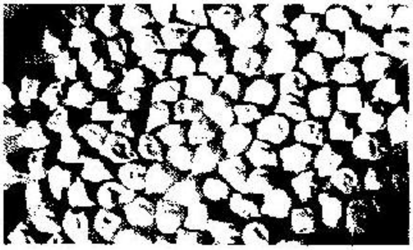

ফলসহ মশুর গাছের অগ্রভাগ

মশুর ফসলে আগাছা

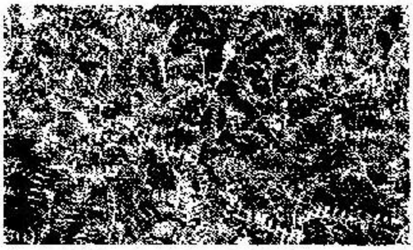

বারি মশুরের একক গাছ

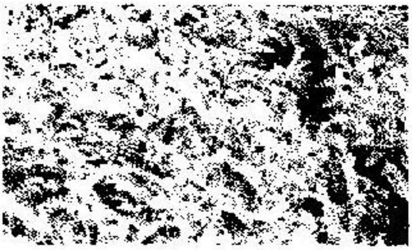

মশুর গাছের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

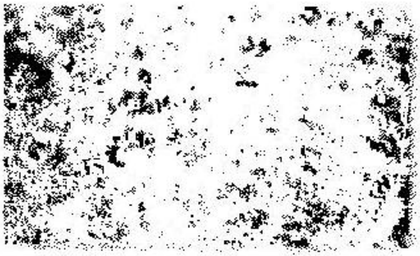

বারি মশুর ২-এর অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

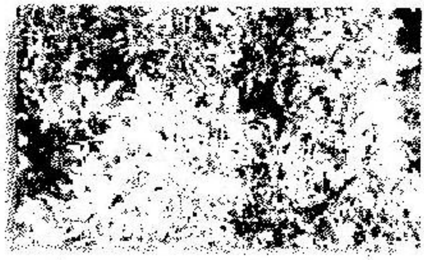

বারি মশুর ৪-এর অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

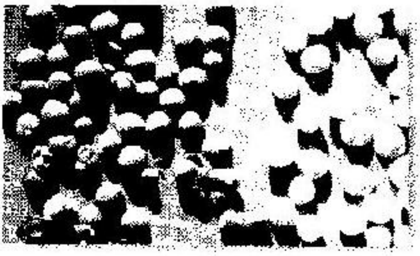

ভেচ ও মশুর দানার তুলনামূলক চিত্র

মশুর গাছের জিঙ্ক ঘাটতিজনিত লক্ষণ

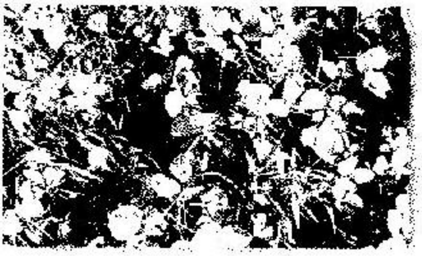

ভেচ ও মশুর দানার তুলনামূলক চিত্র

মশুর গাছের জিঙ্ক ঘাটতিজনিত লক্ষণ

মশুর দানার অপুষ্টির লক্ষণ

মশুর দানার অপুষ্টির লক্ষণ

বিনা মুগ-এর পড

বিনা মুগের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

বিনা মুগ ৫ ফসল

বিনা মুগে অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

বিনা মুগে অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত ফসলের মাঠ

বন্যা কবলিত বিনা মুগ ফসলের মাঠ

বিনা মুগের অপুষ্ট ফসল

বিনা মুগের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

বিনা মুগের অপুষ্টিজনিত লক্ষণ

বিনা মুগ পড

বিনা মুগে জিঙ্কঘাটতিজনিত লক্ষণ

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত পাতা

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত পাতা

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত পাতা

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত পড

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত পাতা

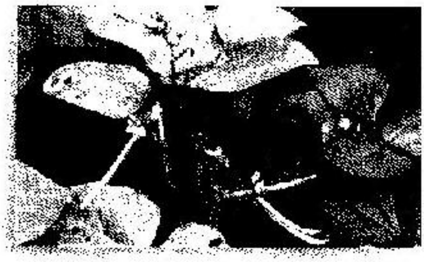

বিনা মুগের রোগাক্রান্ত পাতা

মুগ ফসলের রোগাক্রান্ত পাতা

মুগ ফসল আক্রমণকারী মথ

মুগ ফসল আক্রমণকারী বিটল

মুগ ফসল আক্রমণকারী বিটল

মুগ ফসল আক্রমণকারী প্রজাপতি

মুগ ফসল আক্রমণকারী প্রজাপতি

মুগ ফসলের কীট

মুগ ফসলের ফড়িং

মুগ ফসলের অপুষ্টি লক্ষণ

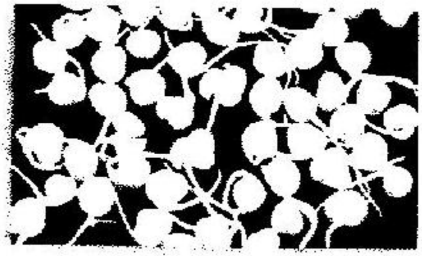

অঙ্কুরিত মুগ

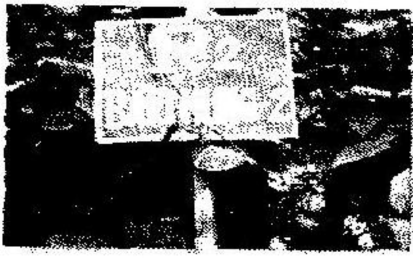

বারি মুগ ২ ফসল

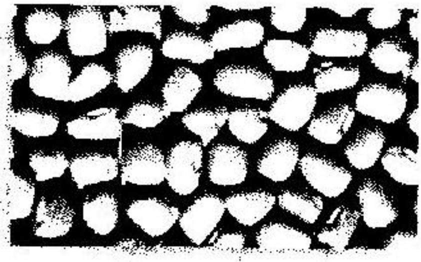

বারি মুগ ২ দানা

বারি মুগ ৪ ফসল

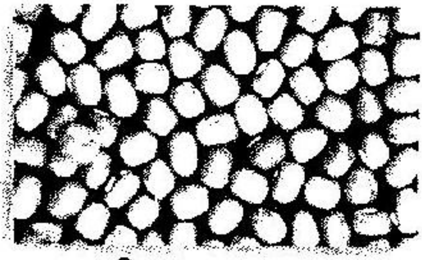

বারি মুগ ৪ দানা

বারি মুগ ৫ ফসল

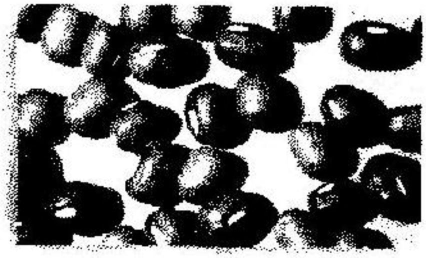
বারি মুগ ৫ দানা

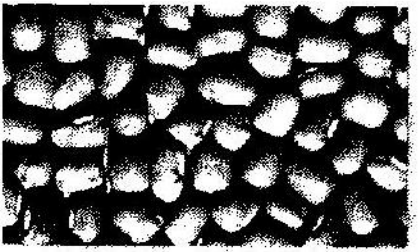
বিনা মুগ ১ দানা

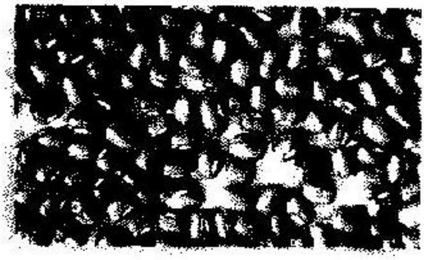
বিনা মুগ ২ দানা

বিনা মুগ ৪ ফসল

বিনা মুগ ৫ ফসল

গ্রীষ্মকালীন বারি মুগ চারা

জলাবদ্ধতায় প্রায় ৮০% ক্ষতিগ্রস্ত মুগ ফসল

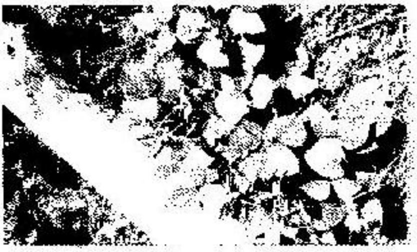

দেশী জাতের (পটুয়াখালী) মুগ ফসল

কান্তি জাতের মুগ ফসল

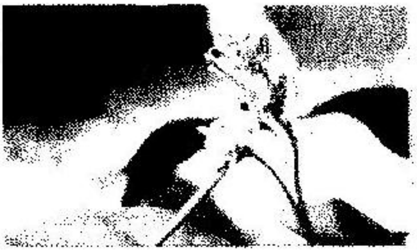

কান্তি মুগ ফসলের ফুল

স্থানীয় জাতের (উত্তরাঞ্চল ১ মুগ পড)

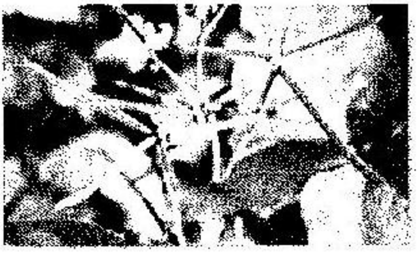

স্থানীয় জাতের (উত্তরাঞ্চল) মুগ পড

স্থানীয় জাতের (উত্তরাঞ্চল) মুগ পড

স্থানীয় জাতের (ময়মনসিংহ) মুগ পড

স্থানীয় জাতের (কুড়িগ্রাম) মুগ পড

স্থানীয় জাতের (ঠাঁকুরগাঁও) মুগ ফসল

স্থানীয় জাতের (রংপুর) মুগ ফসলের জমি

স্থানীয় জাতের (টাঙ্গাইল) মুগ পাতা

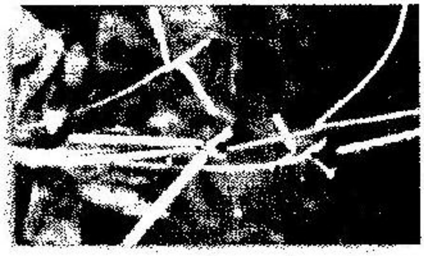

স্থানীয় জাতের (টাঙ্গাইল) মুগ পড

বারি মুগ ফসলের পাতাও পুষ্পমঞ্জুরী

বারি মুগ ২ ফসলের পুষ্পায়ন পর্যায়

বারি মুগ ২ ফলের পড

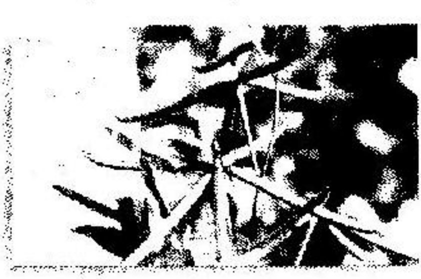

বারি মুগ ৩ ফসলের পড

বারি মুগ-৪ ফসলের পুষ্পায়ন

বারি মুগ-৫ ফসলের পুষ্পায়ন

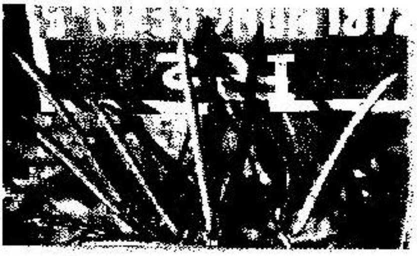

বারি মুগ-৪ ফসলের পড

বিনামুগ-২ ও বিনামুগ৫-এর তুলনামূলক চিত্র

কান্তি মুগের ফসল মাঠ

বিনামুগ ফসল মাঠ

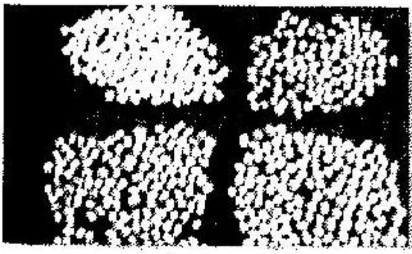

বিনামুগ ১,২,৩ও৪ দানার তুলনামূলক চিত্র

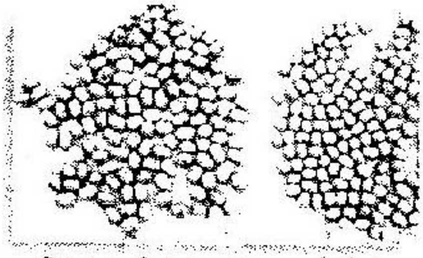

বিনামুগ-৪ ও বিনামুগ-৫ দানার তুলনামূলক চিত্র

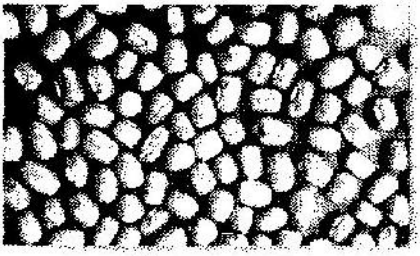

কান্তিমুগ দানা

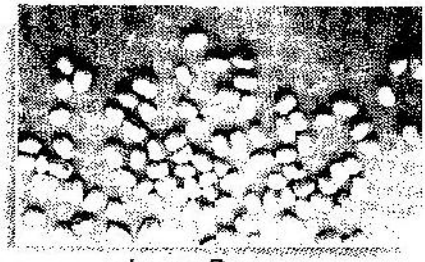

পটুয়াখালী মুগ দানা

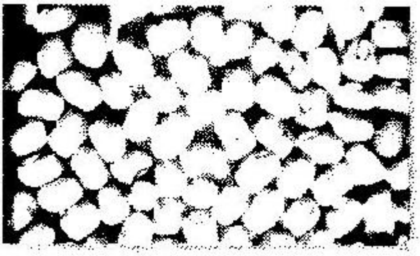

সোনামুগ দানা

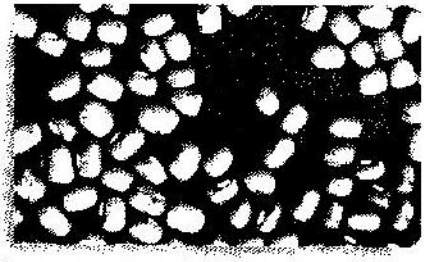

বারি মুগ ১(উপরে বামে), উপরে ডানে ৩ নিচে বামে ৪ (নিচে ডানে) দানার তুলনা চিত্র

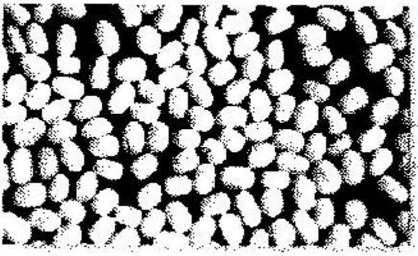

দেশী মাশকলাই (পূর্ণ দানা)

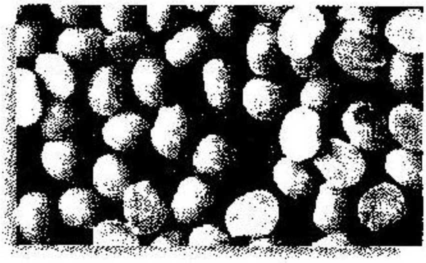

দেশী মাশকলাই (ভাঙা দানা)

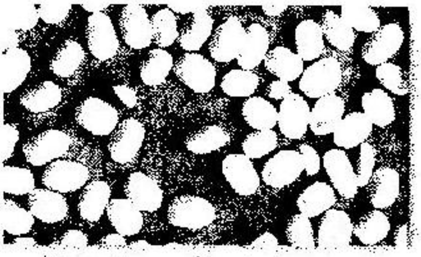

উদু মাস কলাই দানা

বার মাসী মাশকলাই দানা

ম্যাক ও মাশকলাই (পাকা ও কাচা ফল)

ম্যাক ১ মাশকলাই দানা

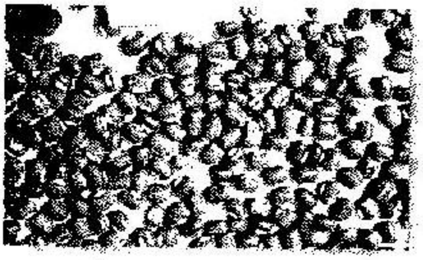

বারি মাশ ৩-এর দানা

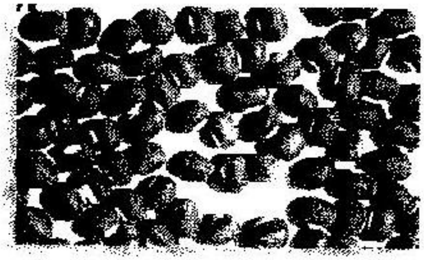

বারি মাশ ২-এর দানা

বারি মাশ ৩ -এর দানা

বিনামালা-এর সংগ্রহযোগ্য পড

বিনামাশ ৩ -এর দানা

ম্যাক ১-এ জাব পোকার আক্রমন

ম্যাক ১-এর অপুষ্টিজনিত লক্ষন

ম্যাক ১-এর জাব পোকার আক্রমণ

মাশকলাইর ছত্রাকজনিত রোগ

মাশকলাইয়ে বিটল আক্রমন

অড়হর গাছের পাতা ও ফল

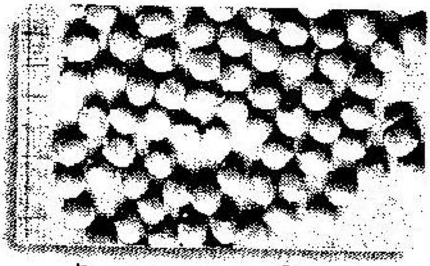

উন্নতমানের অড়হর বীজ

দেশী অড়হর পাতা ও পড

অড়হর ফুল

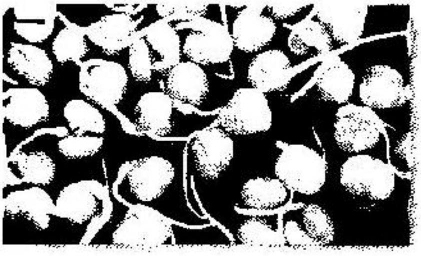

মটর বীজ (অঙ্কুরোদ্গমরত)

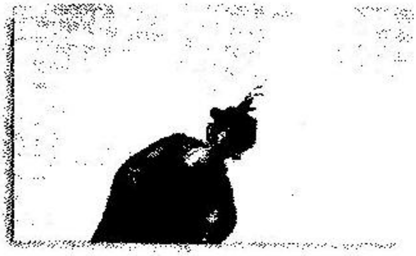

মটর ডগার ঘোড়া পোকা

বারি মটর ফলন

মটর গাছ-বিছা পোকা

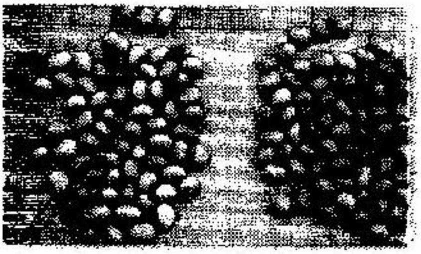

বারি ২ ও বারি ৪-এর সয়াবিন বীজ

সোহাগ জাতের সয়াবিন ফসল

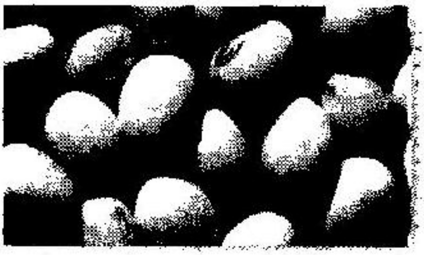

সোহাগজাতের সয়াবিন বীজ

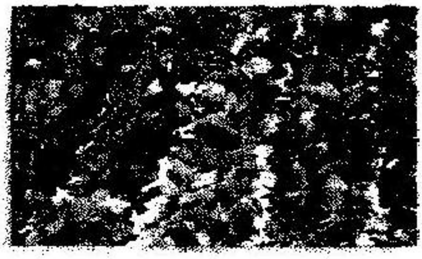

সূর্যমুখী+সয়াবিন আন্তঃফসল

মুগ ফসলের পুষ্পায়ন পর্যায়

মুগ ফসলের বৃদ্ধিপর্যায়

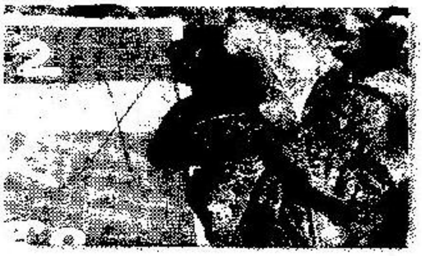

মুগ ফসল ৪-এর ফলন

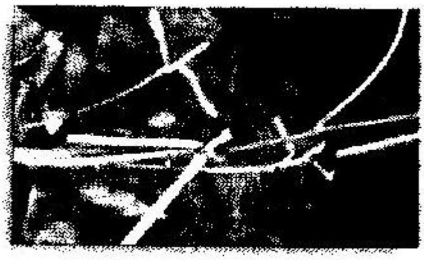

মুগ ফসল ৪-এর পড

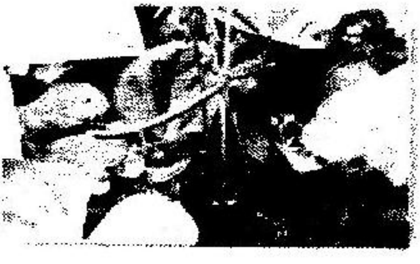

মুগ ফসল ৩-এর ফলন

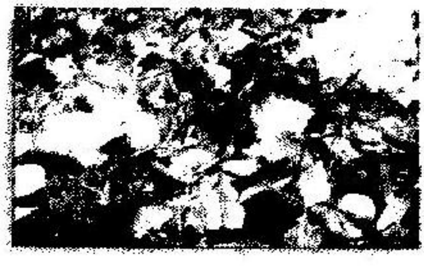

মুগ ফসল ৫-এর ফলন

মুগ ফসল ২-এর পড

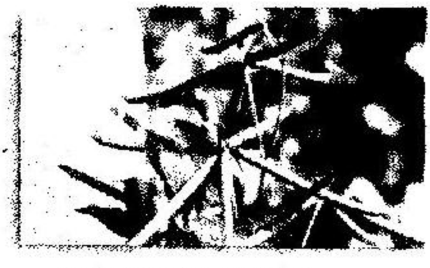

মুগ ফসল ৩-এর পড

Library

ডাল ফসলের আগাছা

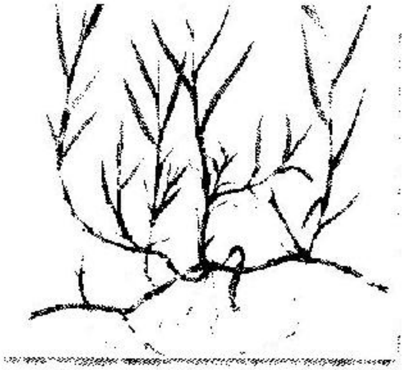

দুর্বা

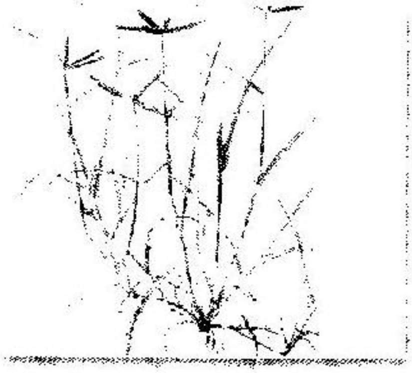

কাকপায়া

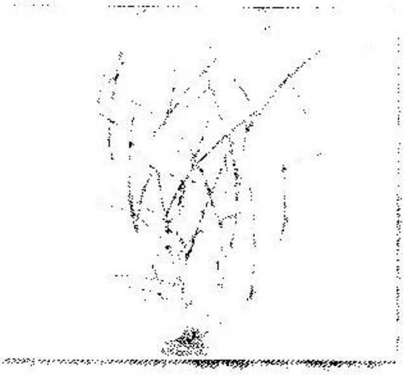

গুজ ঘাস

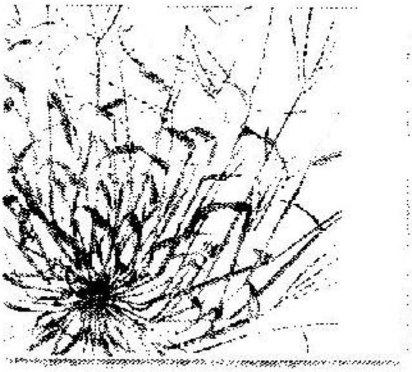

বড় চাপড়া

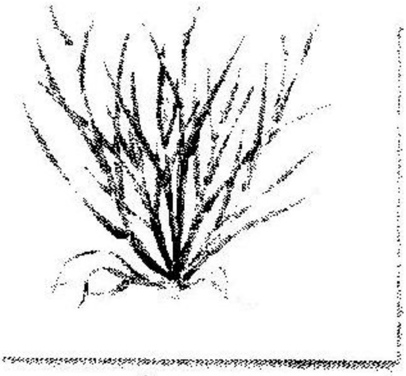

শিয়াললেজা

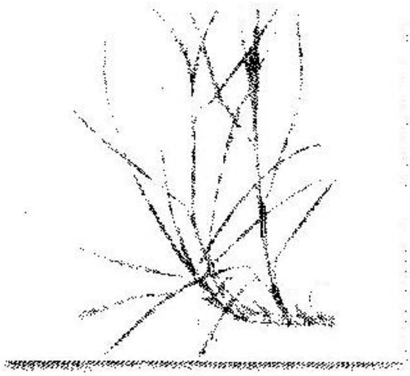

বাহিয়া ঘাস

17806